জরাসন্ধ

লৌহকপাট

(প্রথম পর্ব)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

এই লেখকের লৌহকপাট (দ্বিতীয় পর্ব)
তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
তৃতীয় মুদ্রণ—কার্তিক, ১৩৬১
চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৬২
পঞ্চম মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬২
ষষ্ঠ মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬৩
সপ্তম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬৪
অষ্টম মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪
নবম মুদ্রণ— ফাল্গুন, ১৩৬৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রক—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-১৩
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা-১২
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইন্ডার্স

তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

উৎসর্গ

লৌহকপাটের অন্তরালে যারা শেষ নিঃশ্বাস রেখে গেল,

সেই সব বিস্মৃত মানুষের উদ্দেশে

অবতরণিকা

আজকের দিনে লেখক মাত্রেই সাহিত্যিক এবং পাঠক মাত্রেই সমালোচক। অতএব দুশ্চিন্তার কারণ নেই কোনো তরফেই। একদিকে রইল আমার লেখনী, আরেক দিকে রইল আপনার রসনা; আর উভয়ের মধ্যে রইল যথেচ্ছ উদ্‌গীরণের অবাধ অধিকার।

আগেকার দিনে সাহিত্যের একটা নিজস্ব এলাকা ছিল। শ্যেনচক্ষু সাহিত্যরথীরা লগুড়-হস্তে সীমান্ত রক্ষা করতেন। তাঁরা আজ অন্তর্হিত। সাহিত্যের সীমা-রেখাও বিলুপ্তপ্রায়। আজকের যাঁরা মহারথী, তাঁদের নয়নে জনতোষণের অঞ্জন, কণ্ঠে গণদেবতার জিন্দাবাদ। তাই সাহিত্যের আসরে চলছে সর্বজনীন দুর্গোৎসব—ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি আর লাউড স্পীকারের হুঙ্কার। নিছক রসস্রষ্টা যারা, তাদের ক্ষীণকণ্ঠ আর শোনা যায় না। কর্কশ কণ্ঠে আস্ফালন করছে ঐতিহাসিকের দম্ভ, দার্শনিকের দ্বন্দ্ব, বৈজ্ঞানিকের বাগাড়ম্বর আর রাষ্ট্রবিদের জিগির। এরাই এ যুগের সাহিত্যিক। সাম্যবাদ এবং মন্বন্তর থেকে আরম্ভ করে বুনিয়াদি শিক্ষা ও কালোবাজার—সাহিত্য মণ্ডপের উদার ছায়াতলে সকলেরই আজ সমান অধিকার।

সমালোচকেরাও পেছনে পড়ে নেই। গতানুগতিক ধারা ত্যাগ করে তাঁরাও বেরিয়ে পড়েছেন নানা অভিনব পথে নব নব সাহিত্যের রস-সন্ধানে। ডক্টর যশঃপ্রার্থী জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল, যাঁর গবেষণার বিষয় শুনলাম 'বণিক-সাহিত্য'। উপকরণ যে-সব সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে হাজার কয়েক বিজ্ঞাপন, কয়েক বস্তা ক্যাশমেমো এবং ডজন তিনেক বড় বড় শিল্প-পতির বক্তৃতা। কোনো চর্ম ব্যবসায়ীর বিল-ফর্মে তিনি নাকি এমন ঘনীভূত কাব্য-রসের সন্ধান পেয়েছেন যার আস্বাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যেও সুলভ নয়।

আমার দুর্ভাগ্য, এই রস গ্রহণের ক্ষমতা থেকে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করেছেন। বাণিজ্যলক্ষ্মীর স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি আমার কারো চেয়ে কম নয়, কিন্তু সরস্বতীর কমলবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখলে ব্যথিত হই। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিক, আপত্তি নেই।

কিন্তু সুখী হই না যদি দেখি, তার রূপান্তর ঘটেছে কবির লেখনী কিংবা শিল্পীর তুলিকায়।

একথা জানি, সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার এই সংকীর্ণতা বর্তমান কালে অচল। আমার রচনা সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা যাই হোক্ কোনো অতি আধুনিক উদার সমালোচক হয়তো এরি মধ্যে এক অনাস্বাদিত কাব্য-রস আবিষ্কার করে বসবেন। সুতরাং আশ্চর্য হবো না, যদি দেখি, আমারও খ্যাতি একদিন ছড়িয়ে পড়েছে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে; ডাক পড়েছে অল্-ইন্ডিয়া রেডিওর মজদুরমণ্ডলীর অধিবেশনে, কিংবা প্রধান অতিথির আসন টলে উঠেছে মফঃস্বল শহরের কোনো গণ-সাহিত্যের বার্ষিক সভায়। সে দুর্ঘটনা যদি কোনো দিন সত্যিই ঘটে, তবু নিজের কাছে একথা অস্বীকার করি কেমন করে যে, এই লেখনীর রেখায় যে-বস্তু রূপলাভ করল সেটা আর যাই হোক্ সাহিত্য নয়। জীবনে অনেক কিছু হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক হবো বলে কোনো দিন দুরাশা পোষণ করিনি।

এই সুজলা সুফলা বাঙলা দেশে ব্যাধির অন্ত নেই। তার মধ্যে আছে দুটি সাধারণ ব্যাধি, যাকে বলা যেতে পারে তার জলবায়ুর ধর্ম—ম্যালেরিয়া ও কাব্য। এদের প্রকোপ থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে এমন লোক তো কই একটাও চোখে পড়লো না শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে! আমার পরম সৌভাগ্য, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বহুবার ধরাশায়ী হলেও কাব্যের কবলে ধরা দিয়েছিলাম শুধু একটি দিন। সেই প্রথম এবং সেই শেষ।

গ্রামের ইস্কুলে উপরের দিকে পড়ি। বাৎসরিক পরীক্ষা আসন্ন। রাত জেগে এবং কম্বল জড়িয়ে ইব্রাহিম লোদীর চরিত্র মুখস্থ করছিলাম। অতর্কিতে মানসপটে কবিতার আবির্ভাব। ইতিহাস বন্ধ করে খাতা টেনে নিয়ে লিখলাম—

চাঁদের আলোয় আজিকে কেন রে
নেচে ওঠে মোর প্রাণ

বলা প্রয়োজন, সময়টা ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত। চন্দ্রদেবের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। দখিন হাওয়া, ফুলের সৌরভ ইত্যাদি যেসব বাহন আশ্রয় করে কাব্যলক্ষ্মী অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তাদেরও ছিল একান্ত অভাব। তবু কি করে তিনি নিতান্ত অসময়ে আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি। ভর যেমন করেই করুন, বহু চেষ্টা করেও কবিতার দ্বিতীয় ছত্রে অবরোহণ করাতে পারেননি। তারপর কখন এক সময়ে

কাব্যের স্থানে নিদ্রার আগমন হয়েছিল, টের পাইনি। টের পেলাম, হঠাৎ কর্ণদেশে প্রবল আকর্ষণে। মুহূর্ত মধ্যে ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যে যখন ফিরে এলাম, সবিস্ময়ে দেখি, আমার কবিতার দ্বিতীয় পংক্তি স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে—

নাচন থামিয়ে পড় ইতিহাস
নইলে ছিঁড়িব কান।

বুঝলাম, অদৃশ্য হস্ত শুধু আমার কর্ণপীড়ন করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে নিপুণভাবে করে দিয়েছেন আমার কবিতার পাদপূরণ।

শুনেছি আমার পূর্বে আর একটিমাত্র কবি এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি মহাকবি জয়দেব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লেখনী স্পর্শে তাঁর কাব্যস্রোত বয়ে চলেছিল বিপুল ধারায়। আর পিসেমশাইএর শ্রী-হস্ত-স্পর্শে আমার কাব্যপ্রবাহ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। সেদিন মনে মনে যতই ক্ষুব্ধ হয়ে থাকি না কেন, আজ আমার পরলোকগত পূজনীয় পিসেমশাইএর উদ্দেশে বারংবার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শুধু আমার নয়, কৃতজ্ঞতার পাত্র তিনি আপনাদেরও। সেদিন কঠোর হস্তে কাব্য-চিকিৎসা করেছিলেন বলেই আপনারা অন্তত একজন আধুনিক কবির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। নইলে হয়তো দিনের পর দিন এই মুক্ত-হস্ত-নিক্ষিপ্ত রাশি রাশি গদ্য-কবিতার 'ছেঁড়া মাদুর', 'ছ্যাকড়া গাড়ি' কিংবা 'ভাঙা কোদাল' আপনাদের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে দিত।

আপনাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি আমি লক্ষ্য করছি। কাব্য বা সাহিত্য সম্বন্ধে এই যদি তোমার সত্যিকার মনোভাব, এসব হচ্ছে কি? এর উত্তর আগেই দিয়েছি। এ-সাহিত্য নয়, উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ নয়, এ শুধু—কি, আমি জানি না। যদি বলেন, তারই বা কি প্রয়োজন ছিল? আমি নিরুত্তর। প্রয়োজন সত্যিই কিছু নেই। এইটুকু শুধু বলতে পারি, জীবনে এমন একটা পথে আমাকে চলতে হয়েছে, যেটা প্রকাশ্য রাজপথ নয়। সে এক নিষিদ্ধ জগৎ। সেখানে যাদের বাস, তাদের ও আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লৌহদণ্ডের যবনিকা। তার ওপারে পাষাণ-ঘেরা রহস্যলোক। কিন্তু তারাও মানুষ। তাদেরও আছে বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী—সুখে সমুজ্জ্বল, দুঃখে পরিম্লান, হিংসায় ভয়ঙ্কর, প্রেমে জ্যোতির্ময়! সেই পাষাণ-পুরীর দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের স্তব্ধ বাতাসে জমে আছে যে অলিখিত ইতিহাস, সভ্য পৃথিবী তার কতটুকুই বা জানে? আমি যে সেখানে বিচরণ করেছি, এই

দীর্ঘ জীবন ধরে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, নিভৃত রাত্রির অন্ধকারে—আমিই বা কতটুকু দেখেছি, কতখানিই বা শুনেছি। সে চোখ নেই, সে কান নেই, আর নেই সেই দরদ, যার স্পর্শে অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান, বধির হয় শ্রুতিধর।

একেবারে যে পাইনি, তা হয়তো ঠিক নয়। সেই আঁধারলোকের কোন প্রাণী অকস্মাৎ কোনদিন 'খুলেছিল তার অন্তরদুয়ার'। প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলাম ক্ষণেকের তরে। আহরণ যা করেছি, তোলা আছে স্মৃতির মণি-কোঠায়। এখানে যেটুকু দিলাম, সে শুধু আভাস কিংবা তার ব্যর্থ প্রয়াস।

[এক]

কর্ণজননী কুন্তীদেবী তাঁর সদ্যজাত সন্তানকে সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মহাভারতের এই করুণ কাহিনী আজও আমাদের অশ্রুসিক্ত করে তোলে। কিন্তু আমাদের মাতৃস্বরূপিণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর যে শত শত সন্তান প্রসব করেই অকূল পাথারে ভাসিয়ে দেন, তাদের জন্যে এক বিন্দু অশ্রুও দেখা দেয় না কারো চোখের কোণে। যদি দিত, এদের নিয়েই রচিত হতে পারত আর একখানা অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত।

যথানিয়মে আমাকেও আমার স্নেহময়ী Alma Mater গলায় একটা ডিপ্লোমার কবচ ঝুলিয়ে একদিন অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিলেন। 'দ্বারভাঙ্গার' জঠর থেকে নিক্ষিপ্ত হলাম ভবসমুদ্রের ঘূর্ণিপাকে। ক্ষুদ্র একটা কেরানীগিরির ভেলা জুটিয়ে দেবার মত না জুটল কোন খেতাবধারী মামা, কোন মুরুব্বী-কৃতার্থ মেসো, কিংবা অন্তত একটি অপুত্রক শাঁসালো-শ্বশুর। সম্বলের মধ্যে ছিল একটা শাদা জীনের প্যাণ্ট আর নীল-তসরেটের কোট। তারি ঘর্মসিক্ত বক্ষে আশ্রয় নিয়ে ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে হাকিম-শিকারের যখন প্রয়োজন হত, সদাশয় সরকার এই সব বুভুক্ষু ভাসমান প্রাণীদের মুখের সামনে গোটাকয়েক Competitive পরীক্ষার টোপ ফেলতেন। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রলুব্ধ হত ডিগ্রীধারীর দল। তার-পর দেখা যেত, টোপ গিলছে অনেকেই, কিন্তু ডাঙ্গায় উঠছে দু-চারজন—যারা একেবারে নির্জলা ভালো ছেলে; অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় যাদের মোটা নম্বর, কিন্তু পুলিশের খাতায় কোন নম্বর পড়েনি। বন্ধুদের মধ্যে একদল ইতিমধ্যে ডাঙ্গায় উঠেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ভরসা দিলেন, কারো হাত থেকে আবার বর্ষিত হল শীতল বারি। তাঁরা বললেন, এ পরীক্ষা নয়, ফাঁদ। চাকরির জন্য চাই একদল তৈলসিক্ত, নতস্কন্ধ, বশংবদ গুড়বয়। যারা জোয়াল কাঁধে নিয়ে ছুটবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই মাথা চাড়া দেবে না। সে তুমি পারবে না। এহেন সদ্‌গুণ যে আমার আছে কিংবা কোনদিন আয়ত্ত হবে, ততটা আত্মবিশ্বাস আমারও ছিল না। কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আর ইনটারভিউ তখন

এমন বিস্বাদ হয়ে গেছে যে, নেহাৎ মুখ বদলাবার জন্যেই সরকারী পরীক্ষার টোপ একদিন গিলে ফেললাম।

শ্রীকান্ত বলে গেছেন, ইংরেজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

আমি গোলামখানার যাত্রী। অতএব শুধু 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দারি' নয়, তার চেয়েও ভয়াবহ এবং ব্যাপকতর ডাক্তারির জন্য আমার এই তুচ্ছ দেহটার তলব পড়ল সর্বশক্তিমান মেডিক্যাল বোর্ডের দরবারে। মেডিক্যাল বোর্ড!! জনৈক ভুক্তভোগী ক্ষীণদেহ বন্ধু চোখের জলের ভেতর দিয়ে এ-বস্তুটির নাম দিয়েছিলেন, হাঁড়িকাঠ। তারি স্নেহবেষ্টন কল্পনা করে আমার এই ক্ষীণতর গলদেশ ঘন ঘন শঙ্কিত হয়ে উঠল। বন্ধুরা সান্ত্বনা দিলেন। শুভার্থীরা দিলেন উপদেশ। কেউ বললেন, ডাম্বল ভাঁজ; কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, হাতী কিংবা বাইসনের চর্বি খাও; কারো বা প্রস্তাব হল—বেড়িয়ে এস কাশ্মীর কিংবা উটকামণ্ড। এদিকে সময় মাত্র চৌদ্দ দিন।

সকলের শেষে এলেন সবচেয়ে যিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি—আমার বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার হরি পাণ্ডা। আমার দুরবস্থা দেখে বিস্তর আপশোস করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, একটা সোজা রাস্তা আছে। কিন্তু সে কি আপনার পছন্দ হবে? আপনারা হলেন সব—

বাধা দিয়ে মিনতি করে বললাম, রক্ষে করুন, হরিবাবু; এ বিপদে আপনিই একমাত্র ভরসা। হরি পাণ্ডা একটুখানি ভেবে চুপি চুপি বললেন, আলু সেদ্ধ খান।

—আলু সেদ্ধ!

—স্রেফ আলু সেদ্ধ, আর তার সঙ্গে দুবেলা দুটো ভাত। এক হপ্তা পরে আপনার সমস্ত জামাগুলো যদি না বাতিল হয়ে যায়, আমার নাম হরি পাণ্ডা নয়।

অকূল সমুদ্রে কূল দেখা দিল। পড়ে রইল ডাল-তরকারি, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি। চৌদ্দ দিন ধরে এক নাগাড়ে চালিয়ে গেলাম ভাত আর আলু সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ আর ভাত।

ম্যানেজারের অশেষ দয়া। মাসের শেষে পুরো বোর্ডিং চার্জ নিয়েই তিনি আমাকে রেহাই দিয়েছিলেন, উপদেশের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত কিছু দাবি করেননি।

কিন্তু এত সেবা, এত তোয়াজ সত্ত্বেও শরীর মহাশয়ের মন পেলাম না। তার ওজন আর ছাতির মাপ দুটোই আমার বিরুদ্ধ-সাক্ষীর তালিকায় নাম লেখাল। বোর্ডের মুখ গম্ভীর হল। কিন্তু দমে যাওয়া বলে কোন কথা নেই ডাক্তারের অভিধানে। বিপুল পরাক্রমে আরম্ভ হল পরীক্ষা। তিনজন লড়াই-ফেরত আই এম এস'এর সমবেত আক্রমণে আমার শীর্ণ দেহের যে অবস্থা দাঁড়াল, দুরন্ত ছেলের হাতে সেলুলয়েডের পুতুল পড়লে তারও বোধ হয় অতটা দুর্গতি হয় না। পেট টিপে, বুক ঠুকে, দাঁত টেনে, শুইয়ে, বসিয়ে, গলার মধ্যে ডাণ্ডা চালিয়ে, দৌড়-ঝাঁপ করিয়ে এবং আরো অনেক অসহ্য এবং অশ্লীল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে (যা ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব) আমাকে যখন তাঁরা মুক্তি দিলেন, মনে হল, চাকরির উপযোগী জীবনীশক্তির পরীক্ষা দিতে এসে তার সবটাই এ'দের হাতে নিঃশেষ হয়ে গেল, চাকরি করবার জন্যে আর অবশিষ্ট কিছুই রইল না। কিন্তু কোন পুণ্যবলে জানি না, সম্ভবত হরি পান্ডার আলুপিন্ডের কল্যাণে শেষ পর্যন্ত কসাইখানার কর্তারা প্রসন্ন হলেন। পিঠের উপর দাগ পড়ল—ফিট্।

বৈতরণী কোন রকমে পার হয়ে এলাম। হাকিমির স্বর্গারোহণে আর বাধা রইল না। শুভানুধ্যায়ীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বন্ধুদের উৎসাহের মরাগাঙে জোয়ার দেখা দিল। কংগ্রাচুলেশনের তুফান তুলে তাঁরা আমাকে হাবুডুবু খাইয়ে দিলেন। কিন্তু ডাক আসে কই? আমার সে ছাপমারা গদিটা কি শূন্যই থেকে যাবে? দিনের পর দিন চলে গেল। হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিসএর বার্তা বহন করে একখানা বাদামি রংয়ের লেফাফা আর এসে পৌঁছল না।

প্রথমটা ক্ষোভ এবং উষ্মা যতই হোক, শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনাই দিলাম মনকে। এ ভালই হল। হাকিমির 'মোহগর্তে' না ফেলে ভগবান আমাকে একেবারে লালদীঘির মাঠে এনে ছেড়ে দিলেন। সামান্য দু বিঘার পরিবর্তে লিখে দিলেন বিশাল সেক্রেটারিয়েটের বিশ্ব নিখিল। আবার শুরু হল অভিযান। জীনের প্যান্ট আর তসরেটের কোটের গায়ে ঘন ঘন ডাইংক্লিনিংএর নম্বর পড়তে লাগল।

এমন সময়ে একদিন খবর পাওয়া গেল, বাংলা সরকারের জনৈক মন্ত্রী গুটিকয়েক লোভনীয় চাকরির মেওয়া নিয়ে অপেক্ষা করছেন চট্টগ্রামের কোন টিলার উপর। আমার মত 'হীরের টুকরো'র দেখা পেলে একটা বড় গোছের মেওয়া যে সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে দেবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা

লম্বা-চওড়া সুপারিশপত্রও সংগ্রহ করা গেল। যিনি দিলেন শুনলাম তিনি মন্ত্রীবরের বিশেষ বন্ধু এবং সে বন্ধুত্ব প্রধানত গ্লাসিক্‌। অতএব চাকরি সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই ছুটলাম চট্টগ্রাম।

সুদৃশ্য বাংলো। সুবিন্যস্ত পরিবেশ। বিচিত্র-বেশী প্রার্থীর ভিড়। কিন্তু মন্ত্রী-সাহেবের দেখা নেই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর আবিষ্কার করা গেল যে তিনি বাংলো-সংলগ্ন গোলাপ বাগিচার প্রাতর্ভ্রমণ ব্যপদেশে একটি সুরম্য কাচের পাত্রে অর্ধ-ফুটন্ত গোলাপের বুকের ভিতর থেকে শিশির সঞ্চয়নে ব্যস্ত আছেন। সেই দিকে চেয়ে মনে হল চৌষট্টি-হাজারি মসনদে বসে এই সব অক্লান্ত-কর্মী মন্ত্রীদের কী কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়!

আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। শেষটায় একরকম মরিয়া হয়েই সেই গোলাপকুঞ্জে অনধিকার প্রবেশ করে মন্ত্রী বাহাদুরকে কুর্নিশ জানালাম। তিনি সুর্মা-চিত্রিত মদিরাক্ষি বিস্তৃত করে আমার দিকে তাকালেন এবং স-সুপারিশ আবেদনপত্র গ্রহণ করলেন। একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমি তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করলাম। মন্ত্রীবর জবাব দিলেন না। মৃদু হেসে আবার শিশির-সংগ্রহেই মনোনিবেশ করলেন।

তৃতীয় ঘণ্টা যখন শেষ হল, মন্ত্রীবরের সেক্রেটারির শরণ নিলাম। আবেদনপত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই গম্ভীরভাবে ইংরাজি ভাষায় জানালেন, ডাকে জবাব যাবে।

চব্বিশ বছর সাত মাস কেটে গেছে। সে ডাক এখনো আসেনি। হয়তো আরো সময় লাগবে।

চাকরি দিন আর না দিন, অযাচিত এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দানে কেউ কার্পণ্য করেন না। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের বড়কর্তা বেশ খাতির করে বসালেন! দেশের বেকার সমস্যা, মেয়ের বিবাহে পণপ্রথা, প্রমোশন সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের অবিচার ইত্যাদি বড় বড় বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করে অবশেষে বললেন, এক কাজ করুন। চাকরি করে আর কি হবে? তার চেয়ে চিনা-বাদামের চাষ করুন না কেন? নিজে হাতে লাঙ্গল না ধরেই তো বাঙালীর এই দুর্দশা। আর দেখুন তো ওদের দেশ। লয়েড জর্জের বাপ জুতো সেলাই করতো। ফোর্ড ছিল মিস্ত্রী। অথচ—

শিক্ষা বিভাগের এক সহকারী অধিকর্তাও একদিন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, যখন শুনলেন যে, আমি একটা সামান্য মাস্টারির জন্যে উমেদার। বললেন, ইয়ংম্যান, মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? পল্লীগ্রামে চলে যান। ঘরে ঘরে শিক্ষা

বিস্তার করুন। পড়েছেন তো শরৎ চাটুয্যের পল্লীসমাজে? বিশ্বেশ্বরী বলছেন, আলো জেবলে দে রে রমেশ, আলো জেবলে দে।

এখন আমাদের যুবকদের শুধু আলো জবালাতে হবে।

আবগারী থেকে পশু-চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য থেকে মৎস্য চাষ—কোন দপ্তরই বাদ দিই না। জুতোর সোল বদল হল তিনবার। তসরেটের নীল কোট হয়ে গেল পাঁশুটে। দুটো অঞ্চল তখনো মাড়াইনি—জেল আর পুলিশ। কেন জানি না, এদের সম্বন্ধে কেমন একটা আতঙ্ক ছিল—মনে মনে। কিন্তু মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করেন যে মহা জাদুকর, তিনি বোধ হয় মনে মনে হেসেছিলেন, যেদিন হঠাৎ আমন্ত্রণ জানালেন খোদ কারাবিভাগের শ্বেতাঙ্গ ইন্সপেক্টার-জেনারেল এক হোমরা-চোমরা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আই. এম. এস। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিনা ভূমিকায় বললেন, তোমার কেসটা দেখলাম। ভেরী স্যাড। যাক। আমি তোমাকে নিতে প্রস্তুত আছি। এই হল চাকরি, এই তার ভবিষ্যৎ—বলে চাকরির এমন এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিলেন, যেন ওটা চাকরি নয়, তাঁর বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা; আমাকে যোগ্যতম পাত্র মনে করে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। সধন্যবাদ সম্মতি জানিয়ে চলে আসছি; ডেকে ফিরিয়ে বললেন, তোমাকে বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে। You should get a healthy station. দার্জিলিং যাও। কি বল?

প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হল। আমার মত আনাড়ি রংরুটের কোন একটা সেন্ট্রাল জেলে কয়েক বছর শিক্ষানবিশি করবার কথা। দার্জিলিংএর মত ছোট জায়গা আমার প্রাপ্য নয়।

এক ক্লান্ত-বর্ষণ শারদ-সন্ধ্যায় শুরু হল অভিযান। চললাম মেঘ-মায়ার দেশে। যাহোক একটা আশ্রয় জুটল। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, একটা অবলম্বন। অবসান হল উদ্বেগময় অনিশ্চয়ের। এসব কথা যে সেদিন মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল কেমন একটা ভয়। অপরিচিত ভবিষ্যৎ। ঝাঁপ তো দিলাম। কে জানে কি আছে তার রহস্যময় অন্ধকার গর্ভে?

[দুই]

জি. বি. এস.-এর নাটকে যেমন প্রিফেস্, সরকারী চাকরির তেমনি প্রোবেশন। মূল বস্তুর পুরোপুরি রসগ্রহণ করতে হলে উভয়ই অবশ্য লঙ্ঘনীয়। কিন্তু লঙ্ঘন-পথ কিঞ্চিৎ কন্টকময়। সকলের কথা জানি না। প্রোবেশনার জীবনের ইতিহাস বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু শুধু বলতে পারি, এই পথটা পার হতে গিয়ে কণ্টকের আস্বাদ যা পেয়েছি, সেটা মিশ্ররস—আঘাতের সঙ্গে মেশানো কৌতুক, খোঁচার সঙ্গে পরিহাসের প্রলেপ।

গিরীনদা বলেছিলেন, চাকরি-গ্রন্থের প্রথম পাঠ হল—সেলাম। ঐ বস্তুটি ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় এবং ঠিকমত যদি ঠুকতে না পার, সারা জীবনটা কপাল ঠুকেই কাটাতে হবে। বহুদর্শী বান্ধবের এই মূল্যবান উপদেশ আমি অবহেলা করিনি। শুনলাম, মনিব আমার একাধিক। তার জন্যে দুশ্চিন্তা কিসের? One cannot please everybody—এটা হচ্ছে সেই দেশের দর্শন, যেখানে দেবতা নেই। আমাদের দেশে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। তাদের সবাইকে খুশী রাখা যদি সম্ভব হয়, দুজন মনিবকে প্লীজ করা এমন কি আর শক্ত?

ছোট মনিবের সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি পূর্বাহ্নেই জানতে পেরেছিলেন, তাঁর এই নবীন অনুকর্মীটির ঝুলির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটাকয়েক তুচ্ছ ডিগ্রী ছাড়া মূল্যবান কিছু নেই। অর্থাৎ, চাকরির বাজারে যেটা আসল সম্পদ—experience, সেখানে সে একেবারেই নিঃস্ব। তিনি আবার শুধু এই ধনেই ধনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অনেকটা বয়স্ক লোকের চোখে খেলনার মত। ছেলেরা নাড়াচাড়া করে করুক। দেখে কিঞ্চিৎ সস্নেহ কৌতুকের উদ্রেক হতে পারে, এই পর্যন্ত। কিন্তু কাজের জগতে ওগুলো মূল্যহীন এবং অনাবশ্যক।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল, আমি কাজকর্ম কতদূর শিখেছি, "এ" ক্লাস কয়েদীর সঙ্গে "বি" ক্লাসের তফাৎ বুঝি কিনা, স্টকবাবু, রিলিজ ডায়েরি বা তেইশ

নম্বর রিটার্ন সম্বন্ধে জ্ঞান কতখানি, ইত্যাদি। সব ক'টি প্রশ্নের নৈতিবাচক উত্তর শুনে তিনি হতাশভাবে আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়লেন এবং তাঁর স্বদেশী ভাষায় আক্ষেপ জানালেন, "আপনারে লইয়া আমি কী করুম?"

ভদ্রলোকের জন্য সত্যিই বড় দুঃখ হল। মনে মনে সমবেদনা জানিয়ে চলে আসছিলাম। তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে মুখখানা বিকৃত করে বললেন, উঃ, ঘাড়ের ব্যথাটা বড্ড কাবু করলে দেখছি। হ্যাঁ, দেখুন, একটা ক্যাজুয়েল ছুটির দরখাস্ত লিখে দিন তো। একদিন—হ্যাঁ, একদিন হলেই চলবে। এই ঘাড়ের ব্যথাটার জন্যে।

একটু থেমে মুচ্‌কি হেসে বললেন, আপনারা সব বিদ্বান লোক। দেখি কি রকম লেখেন।

লিখলাম দরখাস্ত। বুঝলাম জীবনের আসল পরীক্ষা এই শুরু হল। পরীক্ষা অনেক দিয়েছি। সারা জীবন রাত জেগে আর ঝুড়ি ঝুড়ি কেতাব গলাধঃকরণ করে সেনেট হল কিংবা "দ্বারভাঙ্গার" পাঁচতলায় গিয়ে উদ্গীরণ করেছি। সে-সব আজ ধুয়ে মুছে নির্মূল হয়ে গেল। তার খবর আর কেউ কোনোদিন জানতে চাইবে না।

জেলর সাহেব আমার লেখা কাগজখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেই চোখ কপালে তুললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লেন তাঁর নির্জলা নিজস্ব ভাষায়—এডা কী ল্যাখলেন? এ কি আপনার ইস্কুলের দরখাস্ত? অ্যাঁ? রেফারেন্স কই? অফিসিয়েল করেস্‌পন্ডেন্‌স্‌! প্রথমেই চাই রেফারেন্স। এডাও কি আপনি শেখেন নাই? ন্যান্‌, ল্যাখেন—

আমি কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হ'লাম। মনিব ডিক্‌টেশন দিলেন।—

Honoured Sir,

With reference to the pain on my neck dated, দাঁড়ান-(ক্যালেন্ডার দেখে বললেন) dated the 20th instant, I have the honour to state—ব্যাস, এইবার ল্যাখেন, একদিনের ছুটি চাই। শ্যাষে লাগাবেন I have the honour to be Sir, your most obedient servant. বোঝলেন?

সরকারের অশেষ কৃপা। শুধু চাকরিই দেননি, তার সঙ্গে দিয়েছিলেন একখানি বাসা। শুধু রাজকন্যা নয়, তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব। ছোট্ট একখানি বাংলো। পেছন দিকে পাথরের পাঁচিল ঘেরা। পাইন বনের ভিতর

দিয়ে এ'কে-বে'কে উঠে গেছে পীচঢালা পথ; মিশেছে গিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডের সঙ্গে। সামনেও নেমে গেছে সর্পিল রাস্তা। হারিয়ে গেছে গভীর উপত্যকার অদৃশ্য গর্ভে। বাড়ির ঠিক গায়ে একফালি জমি; যার মালিকানা-স্বত্ব আমার, কিন্তু দখলী-স্বত্ব ভোগ করছিল পাড়ার যত ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়ের দল। প্রতিদিন এমন একটি বিশেষ কর্ম ওরা ওখানে অসঙ্কোচে করে যেত, যেটা ওদের কাছে অবশ্যকরণীয় হলেও তার ফলটা আমার চক্ষু এবং নাসিকার পক্ষে আরামদায়ক ছিল না।

শিক্ষানবিশির ফাঁকে ফাঁকে আমার প্রচুর অবসর। তাকে ব্যবহার করবার মত কাজ বা অকাজ কোনোটাই চোখে পড়ে না। তাই অগত্যা ঐ জমিটা নিয়েই পড়া গেল। উদ্দেশ্য—ফুলের চাষ। কাস্তে-কোদাল, খুরপী-শাবলের সশস্ত্র আক্রমণে জমির চেহারা তো বদলে গেলই, আমার চেহারাতেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিল।

সেদিন বিকালবেলা। বিপুল উদ্যমে কাজে লেগে গেছি। হঠাৎ পেছনে বিকট আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। মনে হ'ল যেন একটা ফাটা কাঁসার থালায় কে লোহার মুশল দিয়ে আঘাত করল। ফিরে চাইতেই চোখে পড়ল অনতিদূরে পর্বত-দুহিতা—প্রৌঢ়া আর তার পাশে তন্বঙ্গী তরুণী। ভাবছি, এই বিচিত্র শব্দ কি এদের কারো কণ্ঠ থেকেই—কান জুড়িয়ে গেল জলতরঙ্গ বাজনার মধুর মূর্ছনায়। তরুণীটি সম্ভবত আমার হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করে কলস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।......হাসি এত সুন্দর! মানুষ এমন করে হাসে, তা তো কখনো শুনিনি! কিংবা হয়তো এ মানুষ নয়। কোন মধুকণ্ঠী কিন্নরবালা সহস্রশীর্ষ হিমালয়ের নিভৃত অন্তরাল থেকে মেঘের ভেলায় ভেসে এসে দাঁড়াল আমার বাগানের পাশটিতে!

শিউরে উঠলাম। ভগ্ন কাংস্যখণ্ডে ঘা পড়ল। প্রৌঢ়ার শ্রীমুখ থেকে বাণী নির্গত হল। কিন্তু একবর্ণও বোধগম্য হল না। তরুণীটি যেন অপ্রতিভ হয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললেন, ইনি বড়ী আম্মা, আমি কাঞ্চী।

ও-ও, ইনিই তাহলে স্বনামধন্য বড়ী আম্মা! আমাদের সহকর্মী ডাক্তার থাপার জ্যেষ্ঠা মহিষী। এসে অবধি ডাক্তারের ছেলেমেয়েদের কাছে অনর্গল শুনেছি এ'র কাহিনী। কদিন ইনি ছিলেন না। কার্সিয়ংএর কাছে কোন্ পাহাড়ী গ্রামে গিয়েছিলেন, তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে আসতে। এই কাঞ্চীই তাহলে সেই ভাইঝি।

বড়ী আম্মাকে যথারীতি অভিবাদন জানালাম। তাঁর কণ্ঠ-গিরি আবার কী একটা উদ্গীরণ করল। মেয়েটি বুঝিয়ে দিল, বড়ী আম্মা বলছেন, এত কষ্ট করে এই বাগান কার জন্যে করছ বাবুজী? ফুল ফুটলে খোঁপায় পরবার লোকটি তো দেখছিনে। তিনি কবে আসবেন? কণ্ঠ যতই ভয়াবহ হোক, সুরটি অন্তরঙ্গ। বললাম, তা তো জানিনে।

—জানো না কি রকম?

—কারুর খোঁপার দেখা তো পাইনি আজও। কেমন করে জানবো?

—ও-ও, বলে নেপথ্যে কাঞ্চীর সঙ্গে মাথা নেড়ে কি বাক্য-বিনিময় হল। তারপর আবার বললেন, আমরা তাহলে সন্ধান করি?

বললাম, আপনি গুরুজন। করতে পারেন বৈকি! কিন্তু যিনি আসবেন, তাঁকে গোড়াতেই বলে দেবেন, এখানে খোঁপায় গুঁজবার মত ফুল পেতে পারেন, কিন্তু মুখে গুঁজবার মত অন্নের বড় অভাব। ওটার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।

আমার প্রস্তাব শুনে কিংবা আমার অভিনব হিন্দীর বহর দেখে এবার কাঞ্চীর হাসির বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়ল, সুরময় স্বচ্ছন্দ ধারায়। তার সঙ্গে হঠাৎ যোগ দিলেন বড়ী আম্মা। প্রচণ্ড ল্যান্ডস্লিপের বিপুল চাপে হারিয়ে গেল পাহাড়ী ঝরনার কলধ্বনি।

ডাক্তার থাপা আমার প্রতিবেশী। দেখা হয় রোজ। গুড মর্নিং বিনিময় হয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় না। নির্বিরোধ ভালমানুষ। প্রায়-অদৃশ্য চোখ-দুটিতে কেমন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি। একদিন একটু জ্বরভাব হতেই ডেকে পাঠালাম। এলেন। বাঁ হাত গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা।

—ও কি? হাতে কি হল ডাক্তার?

ডাক্তার ঠোঁট উল্টে ডান হাতে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে বললেন, দ্যাট ওল্ড ট্রাবল্। তাঁর ক্ষুদ্র চোখদুটোর ভিতর থেকে প্রচ্ছন্ন কৌতুক উঁকি দিতে লাগল। বুঝলাম, ব্যাপারটা ডাক্তারের দাম্পত্য-জীবন-ঘটিত। এত কাছে এই পাশের বাড়িতে বসে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা রক্ষা করা যে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, একথা ডাক্তারের অগোচর ছিল না।

ডাক্তার থাপা দ্বিপত্নীক। বিবাহদ্বয়ের ব্যবধান পনের বছর। শোনা যায়, এই দীর্ঘকাল ঘর করবার পরেও সে ঘর যখন একটি শিশু-মুখ দর্শনে বঞ্চিত রয়ে গেল, বড়ী আম্মা স্বামীকে আদেশ করলেন, বিবাহ কর। নিরীহ

ডাক্তার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। হয়তো বা কপালকুণ্ডলার মত একবার অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিল, বি-বা-হ! কিন্তু সে শুধু একটিবার। দ্বিরুক্তির দুঃসাহস হয়নি নিশ্চয়ই। এমনি করে এলেন কাঞ্ছী আম্মা—বড়ী আম্মার কোন্ দূর সম্পর্কের বোন; উনিই আনলেন জুটিয়ে। বছর না ঘুরতেই ডাক্তারের সংসারে শুরু হল পুত্র-কন্যার প্রসেশন। কিন্তু কাঞ্ছী আম্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শুধু জন্মদান। বাকী সবটাই বড়ী আম্মা তুলে নিলেন তাঁর নিজের হাতে। তাঁর বিশাল সংসারে কড়া ডিসিপ্লিন এবং সকলের ওপরেই তাঁর সমদৃষ্টি। ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর পুত্র-কন্যার পার্থক্য শুধু বয়সের। শাসন-পদ্ধতির যে তারতম্য, সেও কেবলমাত্র বয়সের অনুপাতে। ছোটদের বেলায় চড়চাপড়, বড়দের বেলায় হকি-স্টীক কিংবা চ্যালা কাঠ।

সংক্ষেপে এই হল ডাক্তার থাপার স্লিং-বন্ধ বাম হস্তের ইতিহাস।

ডাক্তার আমাকে কোনরকম পরীক্ষা না করেই বললেন, টেক এ কাপ অফ টী। আমি ডাক্তার বোসকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি আপত্তি করলাম, সামান্য ব্যাপারে আবার ডাক্তার বোসকে ডাকাডাকি কেন? তুমিই দাও না যাহোক একটা ওষুধ পাঠিয়ে।

ডাক্তার হেসে বললেন, আমি তো চিকিৎসা করি না, চাকরি করি।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে, আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, জেল-ডাক্তারি করছি এক নাগাড়ে এই পঁচিশ বছর। বুঝতেই পার—

সেদিন বুঝিনি। বুঝেছিলাম ক'দিন পরে। সে-কথাটা এখানেই বলে রাখি।

শীতের দার্জিলিং। বেলা চারটে বেজে গেছে। অফিসের দোতলায় বসে একটা কি রিটার্ন করবার চেষ্টা করছি। ঘরের কোণে চিমনি জ্বলছে। অর্থাৎ সরকারী বরাদ্দমত কাঠ পোড়াতে হয়, তাই পুড়ছে। কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে কেউ উৎসুক নয়। প্রত্যেকের টেবিলের পাশেই একটা করে লোহার তোলা উনুন। তারমধ্যে জ্বলছে কাঠকয়লা। দু-আঙুলকাটা দস্তানা পরে একটু লিখছি আর হাতটা সেঁকে নিচ্ছি। একটা বাঁশির টানা সুর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে উঠল তার প্রতিধ্বনি—তীক্ষ্ণ কর্কশ হুইসিলের ঘন ঘন আর্তরব। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই জেলগেটের পেটা ঘণ্টাটাকে কে প্রাণপণে পিটতে শুরু করে দিল। ব্যাপার কি অনুমান করবার

আগেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল এক সিপাই। বুট্ ঠুকে সেলাম করে বলল,—পাগ্লী হো গিয়া।

পাগলী হো গিয়া! কে পাগল হ'ল?

—নেহি, নেহি, কৈ নেহি; পাগলী-ঘণ্টী, এলারাম্!

এবার বুঝলাম, এটা হচ্ছে জেলের এলার্ম (alarm)। ছুটলাম ভিতরে। লাঠি আর বন্দুক নিয়ে দু' দল সিপাইও দেখলাম ছুটে আসছে ডবল মার্চ করে। রক্তচক্ষু, পাকানো-গোঁফ হাবিলদার খড়্গবাহাদুর সুনোয়ার ভাঙা মোটা গলায় "কমান্ড্" দিচ্ছে পাহাড় ফাটিয়ে। কয়েদীগুলো প্রাণভয়ে এবং প্রাণ-পণে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে লম্বা লম্বা ব্যারাকগুলোর মধ্যে। যারা ছুটতে পারছে না কিংবা পিছিয়ে আছে, তাদের পিঠে পড়ছে বেটনের ঘা। জমাদার নোট বুক আর পেন্সিল নিয়ে ছুটোছুটি করছে 'গুনতি' মেলাবার জন্যে। দেখতে দেখতে জেলের ভিতরকার রাস্তাগুলো সব ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু হাসপাতালের সামনে পড়ে আছে রিয়াজুদ্দিন মেট, যার মুখে হিন্দী বাৎ শুনে মনে করেছিলাম, ওর দেশ বোধহয় ছাপরা কিংবা মজঃফরপুর। এখন শুনলাম, অকথ্য এবং অশ্রাব্য বরিশালীয়া ভাষায় ও কার মুণ্ডপাত করছে, আর মাঝে মাঝে মাটিতে থুতু ফেলছে; তার সঙ্গে রক্ত। কয়েক গজ দূরে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে এক ভুটিয়া। ছ' ফুট লম্বা, পরিধিও বোধ হয় চার পাঁচ ফুটের কম নয়। দু'জন ওয়ার্ডার তাকে দু'দিক থেকে ধরে আছে, আর কথা বলতে গেলেই বেটন। এমনি সময় জেলর সাহেব তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছলেন এবং দু' একটা কথা শুনবার পরেই তাঁর হাতের লাঠিখানা ভেঙে ফেললেন ভুটিয়ার পিঠের ওপর। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে হুকুম দিলেন ডিগ্রিমে লে যাও। ভুটিয়াকে cellএ নিয়ে যাওয়া হল।

ঘটনাটা যা শুনলাম, সত্যিই "পাগলী" হবার মত।

ডাক্তার থাপা পনের বছর জেলে চাকরি করবার পর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করলেন, মানুষের যতরকম ব্যাধি আছে, তাদের দু'টো দলে ভাগ করা চলে—বুখার আর পেটগড়বড়। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, বসন্ত, নিউ-মোনিয়া—এসব হল বুখার। আর কলেরা, ডিসেন্ট্রি, ডাইরিয়া, কোলাইটিস্—এগুলো হচ্ছে পেটগড়বড়। রোগ শ্রেণীভুক্ত হবার পর চিকিৎসাও সরল হয়ে গেল। অনাবশ্যক জটিলতা না বাড়িয়ে এই দু' দল রোগের জন্যে তিনি

দুটিমাত্র মিক্‌শ্চার ঠিক করে দিলেন। কুইনাইন আর কার্মিনেটিভ্‌; একটা সাদা দাওয়াই আর একটা লাল দাওয়াই।

ডাক্তার থাপাকে কোনো কম্পাউন্ডার দেওয়া হয়নি। নিজস্ব হিন্দীভাষী বরিশালীয়া মেট রিয়াজুদ্দিনই ছিল তাঁর হাসপাতালের পিওন, চাপরাশী, নার্স এবং কম্পাউন্ডার। তার উপরে ডাক্তারের নির্দেশ ছিল, রুগীদের রোগের ফিরিস্তি শোনবার দরকার নেই, স্রেফ্‌ দেখতে হবে সে কোন্‌ দলে পড়ে—বুখার না পেটগড়বড়। যদি বুখার হয়, সাদা দাওয়াই আর পেটগড়বড় হলে, লাল।

হাসপাতালে ডাক্তারের আবির্ভাব সকালে মাত্র একটি ঘণ্টা এবং তখন তাঁর একমাত্র কাজ সংবাদপত্র পাঠ। বাকী সব রিয়াজুদ্দিন। দিনে দু'বার করে তার ওষুধ বিতরণ। সকাল ন'টা আর বিকেল চারটা। রুগীরা জড়ো হলেই যুদ্ধ-শিবিরে সেনাপতির মত তার হুঙ্কার শোনা যায়—বুখারওয়ালা ইধার বৈঠো, পেটগড়বড় উধার যাও।

শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যদলের মত লোকগুলোও সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট লাইনে আলাদা হয়ে যায়। রিয়াজুদ্দিন মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়—মুখ—তোলো এবং তারপরেই শেষ কমান্ড,—হাঁ—করো। রুগীরা আকাশের দিকে হাঁ করে বসে থাকে আর দুটো প্রকাণ্ড বোতল থেকে খানিকটা করে তরল পদার্থ ঘটাৎ ঘটাৎ করে তাদের মুখগহ্বরে ঢেলে দেওয়া হয়। তারা নিঃশব্দে, বোধহয় খুশী হয়েই চলে যায়।

বছরের পর বছর ধরে রিয়াজুদ্দিন মেট এমনি করেই তার প্রভুর নির্দেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করে আসছে, হয়তো আরো কত বছর পালন করত। কিন্তু, কি ছিল বিধাতার মনে! হঠাৎ একদিন বোতল বদল হল। বুখারের দল সেদিন বেজায় খুশী। কুইনাইন-গোলার বদলে পেয়ে গেল মিষ্টি কার্মিনেটিভ্‌। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ ছিল পেটগড়বড় দলের। তারা জানাল প্রতিবাদ। তাদের মধ্যে ছিল এক ভুটিয়া। সে তার নিজস্ব ভাষায় মেটকে দিল গালাগালি। মেট কথা না বুঝলেও সুরটা বুঝল, এবং সে গালি সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দিল তার পেটেন্ট বরিশালীয় হিন্দীতে। তারপর যে সরোষ সম্ভাষণ ও প্রতিসম্ভাষণ শুরু হল, সে দৃশ্যের আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে পৃথিবীর ইতিহাসে—টাওয়ার অব্‌ ব্যাবেলের মাথার উপর। ভুটিয়া স্বল্পবাক্‌ জাতি। মুখের চেয়ে হাতের ব্যবহার তাদের কাছে বেশী প্রশস্ত।

অতএব বাষট্টি পাউন্ড ওজনের এক চপেটাঘাত এবং মেটপুঙ্গবের ঘূর্ণমান অবস্থায় পতন।

লোকজন ছুটে এসে দেখল, এই পতনকার্যে মেট সাহেবের চার চারটি দন্ত তার অনুগমন করেছে। তার বিকট বিলাপে আকৃষ্ট হয়ে যে ওয়ার্ডারটি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল সে দিশাহারা হয়ে এবং আর কোনো রাস্তা না দেখে বাজিয়ে দিল হুইসিল। সঙ্গে সঙ্গে "পাগলী।"

[তিন]

আমাদের মোক্ষদা মাসীকে নিশিতে পেয়েছিল; আমাকে পেল হাসিতে। মাসীকে দেখেছি, নিশির ডাকে ঘুরছেন ফিরছেন, কিন্তু চেতনা নিদ্রাচ্ছন্ন। আমিও তেমনি লিখছি, পড়ছি, কাজ করছি, কিন্তু সমস্ত মনটা মোহাচ্ছন্ন। সে শুধু উন্মুখ হয়ে আছে একটি অলক্ষ্য সুরের পানে, যে সুরের তুলনা নেই, কোনো যন্ত্রী যাকে রূপ দিতে পারেনি, পারবে না; যে-সুর শুধু মধুর নয়, মাদকতাময়। মাঝে মাঝে ও বাড়ির কোন্ মুক্ত দ্বারপথে ভেসে আসে তার একটুখানি রেশ। কিংবা হয়তো ওটা আমার মধুর বিভ্রম।

আত্মবিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। এ আমার কী হল? তবে কি কাঞ্ছীকে আমি মনে মনে—? পাগল! কাঞ্ছী কে? একটা পাহাড়ী গাঁয়ের মেয়ে। শিক্ষা নেই, সভ্যতার আলোকে বেড়ে ওঠেনি, সংস্কৃতির ছাপ লাগেনি ওর দেহে-মনে। কাঞ্ছী রূপসী নয়। যৌবনের যে মোহন স্পর্শ সব নারীকেই একটি সুষমা দান করে, সেটুকু ছাড়া আকর্ষণ করবার মত নিজস্ব কিছু নেই ওর দেহে। মুখখানি অনিন্দ্য নয়। দেখবার মত সুন্দর শুধু দুটি রক্তাভ কপোল। কিন্তু সেও তো পাহাড়ী তরুণীর সাধারণ সম্পদ। সুগৌর গণ্ডের প্রস্ফুট লালিমা দার্জিলিং-এর পথে ঘাটে অহরহ দেখতে পাচ্ছি। তবে? না; বিশ্লেষণ করে তো কিছু পেলাম না। কিন্তু হায়! এমন হাসি কে কবে হেসেছিল?

বাগানে কাজ করছিলাম। কখন তন্ময় হয়ে ডুবে গেছি কোন্ দূরশ্রুত হাসির ফোয়ারায়—

—অনুমান করছি, আপনিই মিস্টার চৌধুরী।

চমকে উঠলাম, পেছনে একেবারে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গী মহিলা, মিসেস রায়, আমার বড় মনিব মিস্টার হ্যারল্ড রায়ের সহধর্মিণী।

বিনীতভাবে জানালাম, তাঁর অনুমান সত্য।

—এঃ তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। আমার স্বামীর মুখে প্রায়ই শুনি তোমার কথা। মাঝে মাঝে এসো না আমাদের বাড়ি।

দেশীয় খৃীষ্টানের বিদেশিনী স্ত্রী—এই মহিলাটির সম্বন্ধে মনে মনে একটা বিরূপ ভাবই ছিল। দেখলাম, ভুল করেছি। তাঁর সস্নেহ অনুরোধে সানন্দে সম্মতি দিলাম। মহিলাটি সত্যিই খুশী হলেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমার বুঝি খুব ফুলের শখ? ঐ রোগটা আমারও ছিল একদিন। আজ-কাল প্রায় কাটিয়ে উঠেছি। কি ফুল লাগাচ্ছ?

বললাম, গোটা কয়েক ফ্লকস্ আর ডায়ান্থাসের চারা জোগাড় করেছি।

—আমার কাছে হলিহক্স্ আছে। পাঠিয়ে দেবো। ঐ পাঁচিলের ধারে ধারে দিও। চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে।

পরদিন বিকালের দিকে গেলাম মিসেস রায়ের বাড়ি। মিস্টার ছিলেন না, শুনলাম কিছুক্ষণ আগে মফঃস্বলে গেছেন। নির্জন বাড়িতে মিসেস একা। সমাদর করে বসালেন, যেন কতকালের আপনার জন আমি। সুগন্ধি দার্জিলিং চা আর নিজের হাতে তৈরি কেক খেতে দিলেন। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, আর দুখানা খাও, আমার জিম বড্ড ভালবাসত......

একটু থেমে মৃদু সহজ কণ্ঠেই বললেন, তাকে হারিয়েছি আজ দশ বছর। তুমি আর সে বোধহয় একবয়সীই হবে। বেঁচে থাকলে এদ্দিনে তোমার মত হ'ত। তারও বড্ড ঝোঁক ছিল পড়াশুনোয়। ভগবান দিলেন না......

কণ্ঠস্বরটা কেমন উদাস হয়ে এল শেষের দিকে।

এ দুঃসংবাদ আগেই শুনেছিলাম। ঐ জিমই ও'দের একমাত্র সন্তান।

মিসেস রায় আগ্রহ করে তাঁর লাইব্রেরী দেখালেন। মূল্যবান সংগ্রহ। বললেন, একদিন খুব ঝোঁক ছিল। আর ভালো লাগে না। এসব বই যদি তোমার পছন্দ হয়, যখন খুশী এসে পড়বে। য'খানা খুশী নিয়ে যেও। কোনো সঙ্কোচ করবে না।

ছাড়তে চান না। ঘণ্টা কয়েক পরে যখন বিদায় চাইলাম, বললেন, আবার এসো। তুমি এলে; সন্ধ্যাটা বেশ কাটল।

আমার বড় মনিব মিস্টার হ্যারল্ড রায় বিলাতফেরত ব্যারিস্টার। আসলে

তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট। জেলের এই খবরদারি তাঁর বোঝার উপর শাকের আঁটি—ক্ষীণ এলাউন্সের সূত্র দিয়ে বাঁধা। এই এলাউন্সের পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন। তাঁর মোট বেতনের অনুপাতে জেল বিভাগ তাঁকে যতটুকু দেয়, মোট সময়ের ততটা অংশই তিনি আমাদের জন্যে ব্যয় করেন। কাগজপত্রে যেখানে যেখানে তাঁর সই দরকার, তারি পাশে একটা × কাটা চিহ্ন দিয়ে রাখতে হয়। এই তাঁর নির্দেশ। তিনি ঝড়ের মত আসেন এবং মোটা কলম দিয়ে কতগুলো সই-এর ঝড় তুলে দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে যান। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো সরিয়ে নেয়। একটু দেরি হলেই প্রশ্ন করেন, হাতে বাত ধরেছে কিনা, আর একটু তাড়াতাড়ি হলেই জিজ্ঞেস করেন, is there anything to hide? আমার সৌভাগ্য, এই কাগজ টানা কাজটা আমার ভাগে পড়েনি। তাহলে আমার প্রবেশনার জীবনের একদিনেই অবসান হত।

মিস্টার রায় আফিসে যতক্ষণ থাকেন, একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। কারুর সম্বন্ধে অনাবশ্যক কৌতূহল নেই। আফিস সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া কারো সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না। আমি রোজই তাঁর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। কালে ভদ্রে দু'একটা দরকারী কথা ছাড়া আমার দিকে কোনো মনোযোগ দেননি কোনদিন।

সেদিন হঠাৎ সই করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, তোমার প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে?

বললাম, না।

পরদিন আফিসে ঢুকেই দু'খানা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখনি ফিল আপ্ করো দাও।

কাগজটা দেখলাম প্রভিডেন্ড ফন্ডে টাকা জমাবার দরখাস্তের ফরম্। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র রোজগারের একটি পয়সাও জমাবার জন্যে অবশিষ্ট থাকে না। ভাগীদার অনেক এবং আমার উপর তাঁদের মনোভাব যাই হোক, আমার অর্থের প্রতি তাঁরা কখনো বিরূপ নন্। ইতস্তত করছি দেখে, মিস্টার তাড়া দিলেন, কুইক্ কুইক্। ওতে আমারও একটা সই দরকার হবে।

সবিনয়ে বললাম, আপনি আমার জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রভিডেন্ড ফন্ডে টাকা রাখবার মত সঙ্গতি আমার নেই।

—কেন?

একটু ইতস্তত করে বললাম, আমার এই সামান্য আয়ের উপর দু'একটা আত্মীয় পরিবারকে নির্ভর করতে হয়।

—তাদের বঞ্চিত করতে তো তোমায় বলিনি।

—কিন্তু তাদের আর এই ফন্ডের দাবি মিটিয়ে বাকী যা থাকবে তাতে আমার খাওয়া চলে না স্যার।

—যদি না চলে, খাবে না—অম্লান বদনে উত্তর দিলেন মিস্টার রায়, fill it in, quick !

ভেবে দেখলাম, প্রবেশনার মানুষ আমি। আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে না। ফরমের ঘরগুলো পূরণ করে তাঁর হাতে দিলাম।

প্রভিডেন্ট ফন্ডের নিয়ম অনুসারে মাসিক বেতনের প্রতি টাকায় এক আনা থেকে দশ পয়সা পর্যন্ত জমানো চলে। সে টাকা মাইনের বিল থেকে কেটে দিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমি এক আনা হারেই কাটবার ব্যবস্থা করেছিলাম। উনি সেই অংকটা বদলে দশ পয়সা হারে যা হয়, তাই বসিয়ে দিলেন।

আমি অনুনয় করে বললাম, একেবারে মরে যাবো, স্যার।

নেভার মাইন্ড—বলে সই করেই উঠে পড়লেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, My dear friend, আজ তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ নিশ্চয়ই। কিন্তু I can assure you, এমন একদিন আসবে যেদিন তুমি আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে; সেটা অবিশ্যি আমি শুনতে পাবো না। কেন না, আমি তার অনেক আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছি।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। মিস্টার রায় যথারীতি সই করছেন। হঠাৎ একটা কাগজের দিকে তাঁর নজর পড়ল। ট্রেজারী থেকে টাকা তুলবার কন্টিন্‌-জেন্ট বিল।

জেলের অধিবাসীদের ধর্মপ্রাণ করে তুলবার জন্যে সরকারী প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সে উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আছেন বিভিন্ন ধর্মের উপদেষ্টা—পাদরি, পণ্ডিত এবং মৌলবী-সাহেবের দল। সপ্তাহান্তে একবার এসে নরকবাসী পাপাত্মাদের এক সঙ্গে জড়ো করে তাঁরা উদ্ধারের মন্ত্র প্রচার করেন। অর্থাৎ কয়েদী বেচারারা ঐ একটি দিন কাজকর্ম ছেড়ে কিছুক্ষণ একত্রে বসে একটু খোশগল্প করবার সুযোগ পায়। এই উপদেষ্টা অবৈতনিক, কিন্তু একটা যাতায়াত ভাতা ভোগ করেন—সপ্তাহে আড়াই টাকা কিংবা ঐ রকম কিছু। সেইটাই বিল

করে ট্রেজারীতে পাঠানো হচ্ছে ক্যাশ করবার উদ্দেশ্যে। অঙ্কের পরিমাণ মবলক সাড়ে বারো টাকা।

ব্যাপারটা মনিবকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিলাম। মিস্টার রায় কলম তুলে বললেন, কিন্তু আমি যে দেখেছি ফি রবিবার ঐ পণ্ডিত আর পাদরি, লাফাতে লাফাতে আসে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে। ওদের আবার গাড়িভাড়া কিসের?

আমি বললাম, ওরা কি করে আসে সেটা আমাদের দেখবার কথা নয়। সরকার যখন ওদের রাহা খরচ মঞ্জুর করেছেন, ওটা ওদের প্রাপ্য।

মিস্টার রায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কে বললে ওটা ওদের প্রাপ্য? সরকারী অর্থের যাতে অযথা খরচ না হয়, সেটা দেখাই আমার কর্তব্য।

তারপর একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, তোমার দেখছি ভয়ানক দরদ ওদের ওপর। বখরা আছে বুঝি কিছু?

ঝাঁ করে উঠল মাথার ভিতরটা। কিছুদিন থেকে চাকরির মায়া ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। একটা দমকা হাওয়ায় আজ সেটা একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললাম। রূঢ় জবাব মুখে এসে গিয়েছিল। কোনো রকমে নিজেকে সংযত করে ফিরে এলাম নিজের টেবিলে। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখে চাকরি ইস্তফা দিয়ে দিলাম। কাগজখানা ও'র সামনে রেখে বললাম, কাল সকালে ছেড়ে দিলেই কৃতজ্ঞ হবো। দেড়টার মেল ধরতে চাই।

মনিব কাগজখানা পড়ে পকেটে পুরলেন এবং তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। বাকী কাগজ আর সই হল না।

কয়েকখানা চিঠির উত্তর দেবার ছিল। সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে বসে তারি দু'একটা সেরে রাখছিলাম। দরজায় করাঘাত। খুলে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে প্যারি না। অত বড় মনিব সশরীরে আমার দরজায়! অভ্যর্থনা করতে ভুলে গেলাম। উনি সেজন্য অপেক্ষা করলেন না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন। আমি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, বসুন স্যার। তিনি ফিরেও দেখলেন না। ঘরের চারদিক ঘুরে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। একখানা ছবি দেখিয়ে বাঙলা ভাষায় প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? এই প্রথম বাঙলা শুনলাম মিস্টার রায়ের মুখে।

বললাম, আমার বাবা।

—বেঁচে আছেন?

—না।

—রক্ষা পেয়েছেন, বলে কটমট করে তাকালেন আমার দিকে। আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, তোমার বয়স কত?

বয়স বললাম।

—আমার একটা ছেলে ছিল। ঠিক তোমার বয়সী। বেঁচে নেই।...... ভগবানকে ধন্যবাদ দিই সেজন্যে।......কেন বুঝতে পারছ?

বললাম—না।

—বেঁচে থাকলে সে হয়তো আজ তোমারি মত বেয়াদব তৈরি হত। বাপের বয়সী অফিস-মাস্টারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারত letter of resignation! —বলে আমার সেই ইস্তফাপত্র কুটি কুটি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন।

[চার]

নিছক ধনাধিকার ঐশ্বর্য নয়। ঐশ্বর্যের পরিচয় তার বহিঃপ্রকাশ। এক সিন্দুক কোহিনুর আর এক ডজন ময়ূর-সিংহাসন নিয়ে যদি আপনি হিমালয়ের কোনো নিভৃত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, পৃথিবীর ধনাঢ্যদের তালিকায় আপনার নাম অনুক্ত থেকে যাবে। কিন্তু রাতারাতি কালোবাজারের কৃপালাভ করে লেক-টেরাসে বাড়ি তুলুন চারতলা, আর সেই সঙ্গে কিনুন দুখানা বুইক আর একটা রেসের ঘোড়া, আপনার রূপ, বয়স এবং ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স যতই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিক, অনূঢ়া কন্যার জননীকুল এবং ইনকম্ ট্যাক্সের ফেউদের হাত থেকে আপনি একটি দিনও স্বস্তি পাবেন না। এমনি করে আপনার বাড়ি, গাড়ি, আপনার চালচলন, আসবাবপত্র, পোশাকপরিচ্ছদ এবং সকলের উপরে আপনার সালঙ্কারা অর্ধাঙ্গিনী,—অভাবে সুসজ্জিতা বান্ধবীদল—আপনার জয়ঢাক স্কন্ধে সমাজের বুকের উপর সরবে বিচরণ করছেন বলেই আপনি বড়লোক; রাম, শ্যাম, যদুর থেকে আপনি স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর জীব।

ঐশ্বর্যের বাহন-সংখ্যা অগণিত। কিন্তু তার মধ্যে যে জন্তুটা আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সোরগোল তুলেছে, তার নাম মোটরগাড়ি। বেপরোয়া গতির নেশায় সে মাতাল হয়ে ছুটছে, তীব্র কর্কশ কণ্ঠে চরণ-সর্বস্ব পথচারীকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—তফাত যাও। সামনাসামনি যদি এসেছ, মৃত্যু অনিবার্য; আশেপাশেও যদি পড়ে যাও, কর্দম-লাঞ্ছনা থেকে নিস্তার নেই। এই মোটরগাড়িই হচ্ছে আপনার ও আমার মধ্যে উদ্ধত চাইনিজ ওয়াল।

দার্জিলিংএ ঐশ্বর্যের অভাব নেই, অভাব শুধু তার এই শিঙওয়ালা বাহনটির। সেই একটিমাত্র কারণেই ধনী আর নির্ধনের মধ্যে ব্যবধান এখানে দুর্লঙ্ঘ্য নয়। অবজারভেটরি হিলের চারিদিকে বারকেয়েক চক্কর দিয়ে ম্যালের যে বেঞ্চিটাতে এসে রোজ আমি বিশ্রাম করি, তারই অপর প্রান্ত অসঙ্কোচে অধিকার করেন এমন সব জাঁদরেল ব্যক্তি যাদের সঙ্গে এক-আসনে দূরে থাক, এক পাড়ায় অবস্থান অন্যত্র ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে আমা হেন ব্যক্তির পক্ষে। সেদিনও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। ওখানে আসন গ্রহণ করলেন বিশাল এক জবরজঙ্গ—বহুমূল্য রাইডিং ব্রীচেজ, তার উপর ততোধিক মূল্যবান কোট, চেস্টার, মাফলার দস্তানার স্তূপ। সেখান থেকে যে আবেশময় সৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছিল, তার কৌলিন্য সাগরপারের। এ হেন ব্যক্তির গোটা দেহটা দূরে থাক, টিকিটির সাক্ষাৎও স্বপ্নাতীত, কলকাতা, বোম্বাই কিংবা নয়াদিল্লীর কোনো পাবলিক পার্কের বেঞ্চিতে। এতবড় অঘটন যে ঘটিত হল, তার কারণ এই রূপসী নগরীর ছায়াঘেরা পিচঢালা পরিচ্ছন্ন রাজপথ কলুষিত করবার জন্যে তাঁর আটখানা মোটরের একখানাও আমদানী করা সম্ভব হয়নি।

আগন্তুক চোখের একটা কোণ দিয়ে বারকয়েক আমার দিকে তাকালেন, তারপর রত্নখচিত রৌপ্যাধারে মহার্ঘ্য সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বিদেশী ভাষায় প্রশ্ন করলেন, মাপ করবেন, আপনি এখানে রোজই আসেন, বুঝি?

—প্রায়ই আসি।

—কোথায় থাকা হয়, জানতে পারি কি?

—জেলে।

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় একটুখানি সরে গিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে। আমি আশ্বাস দিলাম,

ভয় নেই। গেট ভেঙে কিংবা পাঁচিল ডিঙিয়ে আসিনি। হাতে ছোরাটোরাও নেই, এই দেখুন—

খটাস করে শব্দ হল। একজন পুলিশের সিপাই যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। সম্ভবত আমার সরকারী পরিচয়টা জানে। বুক ঠুকে সেলাম দিয়ে গেল পুলিশী কায়দায়। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করলেন এবং একগাল হেসে বললেন, আপনি আচ্ছা লোক তো? আমি কি সেই কথা—কি মুশকিল—বেশ যা হোক—।

তাঁর অবস্থাটা উপভোগ করা গেল। এবার তিনি বেশ খানিকটা কাছে সরে এসে বললেন, দেখুন, একটা কথা বলবো?

—বলুন।

আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, অনেক দেশ ঘুরেছি। অনেক অদ্ভুত জিনিস চোখে দেখেছি। এমন কত গোপন রহস্যময় নিষিদ্ধ জায়গায় যাবার সুযোগ হয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসা ভাগ্যের কথা; কিন্তু আশ্চর্য, একটা জিনিস কখনো দেখিনি। সে হচ্ছে জেল। ঐ কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিলের আড়ালে কী আছে, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। দেখাবেন একবার?

বললাম, সে আর শক্ত কি? আপনি ইচ্ছে করলেই হবে। আমার সাহায্য অনাবশ্যক।

—কি রকম?

—অতি সোজা ব্যাপার। এই যে বেঞ্চিটায় আপনি বসে আছেন, এরি উপর উঠে দাঁড়িয়ে দু-চারটা হুঙ্কার দিন, ইংরেজ নিপাত যাও। ডাউন উইথ ইম্পিরিয়ালিজম্। পুলিশ কাছেই ঘুরছে। বাকীটুকুর ভার ওরাই নেবে।

তিনি জিভ কেটে বললেন, ও সর্বনাশ, তাই কখনো পারি? ডাউন উইথ গ্যান্ড্হিজম্ বরং বলতে পারি একশবার, আর বলেও থাকি দরকার মত।

পরিচয় পাওয়া গেল, উনি হচ্ছেন কোন্ দেশীয় রাজ্যের মহামান্য কুমার বাহাদুর। কয়েক লাখ টাকা বৃত্তি পান স্টেট তহবিল থেকে। গোটাকয়েক তোপও বোধ হয় হুঙ্কার ছাড়ে, যখন আসেন কলকাতা কিংবা নয়াদিল্লীতে।

পরদিনই তিনি আমার দীন কুটীরে পদার্পণ করলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম এবং আমার একমাত্র কম্বাইন্ড হ্যান্ড, একাধারে ঠাকুর-চাকর-বয়-বেয়ারা-মশালচি—"কেটো"র নাম ধরে হাঁকডাক শুরু করে দিলাম। কুমার

বাহাদুর প্রস্তাব করলেন, ঘুরে এসে বসা যাবে এবং আপনার কোয়ার্টারে শ্রীহস্তে চা-পানও করা যাবে। আগে চলুন, আসল মিশনটা সেরে আসি।

ছোট জেল। ঢুকেই প্রথমে নিয়ে গেলাম সেলগুলোর দিকে। সাত হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া ঘর। একটিমাত্র গরাদে দেওয়া লোহার দরজা। পেছনের দেয়ালে মাথার অনেকখানি উপরে ছোট্ট একটুখানি জানালার মত— যার পরিকল্পনা হয়েছিল সম্ভবত আলো-বাতাসকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে। ঘরের সামনে দুধারে পাঁচিল ঘেরা একফালি বারান্দা। তারপর আবার একটা কাঠের দরজা। সেলে যে রইল, তার মধ্যে আর এই প্রাণিজগতের মধ্যে ঐ একটিমাত্র সেতু। ওখানে যখন কপাট পড়ে, এ পৃথিবী তার কাছে জনমানবহীন।

হরেক রকম বন্দীর আস্তানা এই সেল্ বা "ডিগ্রী"—পাগল, কুষ্ঠব্যাধি, কৃত-অপরাধ স্বীকার করেছে যারা, কারা আইনের কোন মারাত্মক ধারা অমান্য করে শাস্তি পেয়েছে যারা নির্জন কারাবাস। প্রথম সেলটিতে থাকে একটি ছোকরা খুনী আসামী। যতীন তার নাম। স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে পুলিশের কাছে। কুমার বাহাদুর তীক্ষ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছিলেন তার দিকে। সামান্য একটা ভূমিকা দেবার উদ্দেশ্যে শুরু করলাম, দিস্ পুওর ফেলো—

যতীন বাধা দিয়ে কুমার বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, কে আপনি? ও-ও জেল দেখতে এসেছেন বুঝি? দেখুন, দেখুন। বেশ ভালো করে দেখবেন, স্যর। চিড়িয়াখানা দেখেছেন তো কোলকাতায়? জঙ্গল থেকে জন্তু-জানোয়ার ধরে এনে খাঁচায় পুরে কত আমোদ পাই আমরা। তার চেয়ে অনেক বেশী আমোদ পাবেন এখানে। নিজের জাতকে দেখবেন জন্তুর মত খাঁচায় বন্ধ। শুধু চোখের দেখা কেন? আপনার লাঠিটা দিয়ে খোঁচা মেরেও দেখতে পারেন, কী আওয়াজ বেরোয় আমাদের গলা থেকে—ঠিক যেমন চিড়িয়াখানার সিম্পাজি কিংবা হনুমানটাকে খুঁচিয়ে দেখে ছেলেগুলো!

এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর হঠাৎ রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠল যখন সে তাকাল আমার দিকে। বলল, ডেপুটী বাবু, আমাদের খাঁচায় ভরেছেন, তাতে দুঃখ নেই। পায়ে ডান্ডা-বেড়ি আর হাতে হাতকড়া দিয়ে ঝুলিয়ে রাখুন কড়িকাঠের সঙ্গে, সেটাও সইতে পারবো। কিন্তু দোহাই আপনার, পুওর ফেলো বলে লোকের কাছে সস্তা দরদ দেখিয়ে জুতোটা আর নতুন করে মারবেন না।

প্রভুভক্ত জমাদার ঝাঁঝিয়ে উঠে কী একটা বলতে যাচ্ছিল তার কয়েদী সায়েস্তা করার ভঙ্গীতে। হাত তুলে থামিয়ে দিলাম। অনুচ্চ কিন্তু

তীব্রতর স্বরে বলল যতীন—মানুষকে শুধু জানোয়ার বানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তার দুর্দশাকে তুলে ধরেছেন বন্ধুদের কাছে, তাদের কৌতুক আর আমোদের খোরাক জোগাবার জন্যে। কি নিষ্ঠুর আপনি!

শেষের দিকে গলাটা কেমন কোমল শোনাল। কোটরগত তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

কুমার বাহাদুরের দিকে তাকালাম। তিনি যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠলেন। হঠাৎ এগিয়ে গেলেন যতীনের সেলের সামনে। গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, আমাদের মাপ করো, ভাই। আমরা বড্ড ভুল করেছি।—বলে হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে সোজা ছুটলেন গেটের দিকে। আমার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না।

[পাঁচ]

সকৌতুকে অনুভব করছিলাম, চাকরির অহিফেন এরই মধ্যে মগজে তার বিষক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ছ'মাস আগেও এ অবস্থা ছিল কল্পনার অতীত। ভেবে হাসি পায়, বড়বাবু সর্বস্ব কেরানীকুলকে কত না অবজ্ঞার চোখে দেখেছি। আর আজ আমার কি অবস্থা? বাক্যে ও চিন্তায় যাঁরা প্রায় সবটুকু অধিকার করে বসেছেন, তাঁরা বড়বাবু না হলেও বড়সাহেব বা ছোটসাহেব। বন্ধুবান্ধবদের মজলিশে ক'দিন আগেও যেখানে বিচরণ করতেন শ', রবীন্দ্রনাথ, হ্যারল্ড লাস্কি কিংবা ইসাডোরা ডানকান, আজকাল সেখানে স্বচ্ছন্দে আসন লাভ করেছে জেল কোড্, ফান্ডামেন্টাল রুলস্, আই জি অথবা একাউন্টেন্ট জেনারেল। মনে মনে লজ্জিত হলাম।

কিন্তু এ লজ্জাবোধ কাটিয়ে উঠতেও আমার বেশী দিন লাগেনি, যখন দেখলাম, এই মানসিক রূপান্তর শুধু আমার মত ক্ষুদ্র চাকরিজীবীর পরিণাম নয়, বৃহৎ চাকুরেদেরও ঐ একই পরমাগতি। তফাত যেটুকু, সেটা মাত্রাগত, প্রকারগত নয়।—কাইন্ড নয়, ডিগ্রী। আমি যেখানে আই-জি কিংবা তাঁর পি এ-কে নিয়ে আসর জমাচ্ছি, এ'রা সেখানে সার করেছেন, চীফ্, পলিটিক্যাল কিংবা ফাইন্যান্স সেক্রেটারি। সেক্রেটারি-মহলও তেমনি মশগুল হয়ে আছেন কোনো এইচ এম কিংবা স্বয়ং এইচ ঈ-কে নিয়ে। যাক্ এসব গেল পরবর্তীকালের কথা। সেদিন কিন্তু দার্জিলিংএর শৈলবাসে আমার সেই ছোট বাংলোখানির বারান্দায় বসে বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলাম বারংবার। সভয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, চাকরিটা যেন একটা মহাকায় পাইথন; অসহায় হরিণশিশুর মত একবার যখন তার মুখগহ্বরে এসে পড়েছি, আর রক্ষে নেই। ধীরে ধীরে সে সবটাই গ্রাস করে ফেলবে।

শুধু কি তাই? এতদিনের চিহ্নিত পথ থেকেই যে স্খলিত হয়ে পড়েছি তা নয়, একটিমাত্র চঞ্চল ঝরনা আমার এই পাহাড়ী জীবনের ঊষর দিনগুলো মধুসিঞ্চিত করে রেখেছিল, তাকেও হারিয়ে ফেলেছি। বিস্মিত হলাম এই

ভেবে যে, আজ কদিন ধরে কাঞ্চী যে আসেনি, সেকথা তো কই একবারও মনে হয়নি? অথচ কটা দিন আগেও সমস্ত দেহ-মন উৎকর্ণ হয়ে থাকত, তার ঐ মোহিনী হাসির স্পর্শটুকুর লোভে।

কয়েকখানা বই সঙ্গে এনেছিলাম। তারি একটা টেনে নিয়ে বসলাম গিয়ে ভিতরের বারান্দায়। ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন। আকাশে রৌদ্র ঝলমল করছে, প্রাণপণে চেষ্টা করছে শীতের তীব্রতাকে সহনীয় করবার। কিন্তু মনে হচ্ছে সবটাই তার ব্যর্থ প্রয়াস; যেমন ব্যর্থ হচ্ছে আমার এই বইএর পাতায় মনোনিবেশের চেষ্টা।

বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। হাঁক দিলাম, কে? কোনো জবাব নেই। কড়াটা শুধু আরো জোরে সাড়া দিল দ্বিতীয়বার। পাশের ঘরে কেটার নাসিকাধ্বনি যে পর্দায় গিয়ে পেঁাচেছে, রীতিমত বলপ্রয়োগ ছাড়া তার নিদ্রাভঙ্গের কোন রকম ভরসা নেই। অতএব নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠতে হল।

একি, তুমি!

কাঞ্চীকে যেন নতুন রূপে দেখলাম। কালো ভেলভেটের ঘাগরার উপর গাঢ় চকোলেট রংএর সার্জের উর্ধ্বাবরণ, যাকে ওরা বলে চোলা। লম্বা বেণী ঝুলছে পিঠের উপর। রক্তিম গণ্ডে, ওষ্ঠে, চঞ্চল চোখ দুটিতে কৌতুকোজ্জ্বল চাপা হাসি। একটা কিছু উপলক্ষ্য পেলেই উপচে ঝরে পড়বে। হাতে এক ঝুড়ি কমলালেবু। ভিতরে এসে ঝুড়িটা রেখে বললে, এই নাও। বড়ী আম্মা পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের বাগানের নেবু।

আমি সেই নধরকান্তি ফলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম। কাঞ্চী মাথা দুলিয়ে বলল, উহুঁ। যা খুঁজছ তা পাবে না। আমি নিজে হাতে গাছ থেকে পেড়ে এনেছি। কটা কাঁটা ফুটেছে, জানো? তিনটা। বড়ী আম্মা বকছিল ডাল ভাঙছিস্ কেন? বললাম, কি করবো? তোমার বাবুজীর যে আবার বোঁটা আর পাতা না থাকলে নেবু পছন্দ হয় না।

কথাটা সত্যি। এ আমার এক অদ্ভুত ছেলেমানুষি খেয়াল। কমলার সঙ্গে যে বোঁটা আর পাতা লেগে থাকে, দার্জিলিং-এ এসেই তো প্রথম দেখলাম।

বললাম, কে বলল তোমাকে বোঁটা ছাড়া নেবু পছন্দ হয় না?

—আমি জানি।

—কি করে জানলে?

লম্বা বেণীটায় একটা দোলা দিয়ে বলল, বলবো না।

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, বেশ; চাই না তোমার নেবুর ঝুড়ি। ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

—হুঁ। ফিরিয়ে নেবো বৈকি? বড়ী আম্মার চ্যালা কাঠ কি জিনিস জানো না তো? এই দ্যাখ—বলে বাঁ হাতের উপর থেকে জামাটা সরিয়ে দেখাল একটা লম্বা কালশিরে দাগ।

বললাম, বেশ হয়েছে। সারাদিন দুষ্টুমি করবে; তার শাস্তি নেই?

—তাহলে তো তুমিও বাদ যাও না।

—কেন, আমি আবার কি করলাম?

—নেবু ফিরিয়ে নিয়ে যাও বললে কেন?

এর আর উত্তর নেই। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে ফেটে গড়িয়ে পড়ল তার হাসি। পাষাণের উপর আছড়ে ভেঙে পড়ল একরাশ বেলোয়ারী কাঁচের বাসন। আমি যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। আমার এই অদ্ভুত ভাবান্তর ও বোধ হয় বুঝতে পারলো না। হঠাৎ হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে কাছে সরে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, তুমি রাগ করলে, বাবুজী?

তৎক্ষণাৎ উত্তর না পেয়ে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠে বলল, সত্যি, এ রোগ আমার কিছুতে গেল না। কত যে বকুনি খাই—

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছি। বললাম, সে জ্ঞান যদি থাকে তবে হাস কেন পাগলের মত?

—বা-রে, আমি কি ইচ্ছে করে হাসি? হাসি পেলে আমি কি করবো?

—আচ্ছা; এবার যখন হাসি পাবে, সোজা ছুটে যেও বড়ী আম্মার কাছে। এক ঘা চ্যালা কাঠ পিঠে পড়লেই হাসি পালিয়ে যাবে বাপ্ বাপ্ করে।

—ঈস্; তাই বুঝি? তাতে আরো বেশী করে হাসি পায়।

—সে জানি। উনিই তো আদর দিয়ে মাথাটা খেয়েছেন। দাঁড়াও; আজই বলে আসছি গিয়ে—

—যাও না? বুড়ী কি বলবে, আমার জানা আছে।

—কি বলবেন?

—বলবে, আদর দিয়ে ওর মাথা তো আমি খাইনি; খেয়েছে আর একজন।

—সে আবার কে?

—আমি কি জানি—বলে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে পিছন ফিরে। দীর্ঘ বেণীটায় আবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে চঞ্চল চরণে ঘরের দিকে চলে

গেল। ঝুড়িটা আমার ভাঁড়ার ঘরে রেখে ফিরে আসতে আসতে বলল, শুধু মাথা চিবিয়ে খেলে তো পেট ভরবে না, ফল কটাও খেও। সবগুলোই যেন কেটাকে দান করে বসো না। যা' মন তোমার; হয়তো একটাও শেষ পর্যন্ত মুখে উঠবে না।

খুব খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, কে বললে মুখে উঠবে না, কাল এসে দেখো তুমি, ঝুড়ি একেবারে গড়ের মাঠ।...বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, তোমার সামনেই শুরু করছি।

উঠবার উপক্রম করতেই কলকণ্ঠে থামিয়ে দিল কাঞ্চী—হয়েছে হয়েছে। আর উঠতে হবে না। খুব বুঝেছি।

একবার এদিক ওদিক কি খুঁজলে। তারপর ছুটে গেল রান্নাঘরে এবং সেখান থেকে ভাঁড়ারে। একটা ডিশ্ নিয়ে এসে তিন চারটা লেবু ছাড়িয়ে ডিশ্খানা আমার হাতে দিয়ে বলল, খাও।

কয়েকটা কোয়া তুলে নিয়ে বললাম, বাঃ, আমি বুঝি একা খাবো?

—আবার কে খাবে?

—কেন, তুমি?

কাঞ্চী জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল। একটি সলজ্জ মৃদু হাসি ভেসে উঠল আনত মুখের উপর। কয়েকটা কোয়া ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললাম, দেখি কার আগে ফুরোয়।

কাঞ্চী কিন্তু ফলগুলো মুখে তুলল না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

কী হল? বলে ওর দিকে যখন চোখ তুললাম, দেখলাম দুটি স্নিগ্ধ সলজ্জ চক্ষু আমার অলক্ষ্যে একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই, সহসা এক ঝলক রক্ত এসে পড়ল তার মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ি থেকে বড়ী আম্মার কাংস্য কণ্ঠ ভেসে আসছে। তর্জন-গর্জনে কলহের সুর। কিন্তু প্রতিপক্ষের কোনো সাড়া নেই। থাকবার কথাও নয়। বড়ী আম্মার গবর্নমেন্টে অপোজিশন পার্টির বালাই নেই। একেবারে পুরোপুরি ডিক্‌টেটরশিপ। দাম্পত্য কলহকে পণ্ডিতেরা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে দম্পতির উত্তমার্ধে শোভা পাচ্ছেন

বড়ী আম্মার মত ব্যক্তি, আর অধমার্ধের অস্তিত্ব একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক সেখানে কলহের রূপ বিপরীত, অর্থাৎ লঘ্বারম্ভে বহ্বক্রিয়া। এমন একাধিক দৃশ্যের দর্শক আমি নিজেই, যার সূচনায় ছিল একখানা দাড়ি কামাবার ব্লেড কিংবা শার্টের বোতাম, কিন্তু উপসংহারে দেখা দিয়েছে ব্যাণ্ডেজ এবং টিংচার আইডিন। সামান্য পিন্ প্রিক্সের বিনিময়ে খুন্তী কিংবা ডালের কাঁটা ডাক্তার থাপার দাম্পত্য-জীবনে বিরল প্রাপ্য নয়।

এই বৃদ্ধ নিরীহ ডাক্তারটির উপর আমার কেমন একটা সহজাত সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ প্রথম মনে হল 'আহা বেচারা' বলে যতটা করুণা তাকে দেখিয়েছি, ঠিক ততখানি বোধহয় ওর প্রাপ্য নয়। তুচ্ছ হোক, বড় হোক, কোন একটি নারী-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আমি বিচরণ করি, আমাকে আশ্রয় করে তার সুখ দুঃখ বিরোধ ও শান্তি, আমাকে ঘিরে তার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই —এই সত্য যে-পুরুষ উপলব্ধি করেছে তার জীবনে, তার চেয়ে বড় সম্পদের অধিকারী কে? মনে হয় ডাক্তার সেই ভাগ্যবান পুরুষ-কুলের অন্যতম। তাই একজনের কাংস্য কণ্ঠের বিষ তাকে স্পর্শ করে না। কেননা, সে জানে, অন্তরালে আছে সুধার ভাণ্ডার। তাই সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের মধ্যেও সে নিরুদ্বিগ্ন ও নির্বিকার। ব্যাণ্ডেজের বেদনা বহন করেও ভেসে থাকে একটি কৌতুক হাসি তার অদৃশ্যপ্রায় চোখদুটির অন্তরালে।

ডাক্তারের এই নতুন রূপ আজই আমার কাছে বিশেষভাবে প্রতিভাত হল কেন? তবে কি ঐ অমৃতময় অনুভূতি আজ আমার অন্তরেও তার সোনার কাঠি বুলিয়ে গেল? আমিও কি—

"আসামী আয়া, হুজুর!"

চমকে উঠলাম। অদূরে দাঁড়িয়ে নিখুঁত সামরিক বেশধারী গুর্খা ওয়ার্ডার। সশব্দ সেলাম ঠুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল, আসামী আয়া, হুজুর। অভ্যর্থনার প্রয়োজন এবং সেটা আমাকে গিয়ে করতে হবে এখনই।

কারা এই আসামী? আইন এবং আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অপরের ধনপ্রাণ নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে যে ভাগ্যবানের দল, তারা নয়। সমাজের বুকের উপর বসে মিষ্টি হাসির প্রলেপ দিয়ে শানায় যারা বিষাক্ত ছুরিকা, তারাও নয়। তাদের দেখা ক্বচিৎ পাবেন জেলের দরজায়। এখানে দলে দলে আসে তারাই, আইনের খপ্পর থেকে টেনে তুলবার যাদের কেউ নেই। ভুটিয়া বস্তীর মন্-বাহাদুর তার দৈনিক পারিবারিক খাদ্য পচাই মদ তৈরি করেছে নিজের ঘরে বসে। জানে না, তার অপরাধ কোথায়। সিঁধেল চোর বংশী তিনখানা থালা

চুরি করেছে সর্দার বাহাদুর লেডেন ল'র বাংলো থেকে, বিক্রী করে কিনেছে সের পাঁচেক চাল আর এক টিন সিগারেট। জেলঘুঘু ভক্‌তা পকেট-কর্তন ব্যবসায়ে সুবিধা হচ্ছে না দেখে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে পুলিশের কাছে, জেলে গিয়ে একটু গায়ে জোর করে নেবার উদ্দেশ্যে।

এরাই আমার আসামী। কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পরে সার বেঁধে আসে যায়। এদেরই নাম ধাম বিবরণ পিঠের তিল আর নাকের কাটা দাগ লিখে রাখি আমি চৌদ্দ-কলমা-ওয়ালা চিত্রগুপ্তের খাতায়। তারপর খালাসের দিন যখন আসে, বাপের নাম আর হাঁটুর চিহ্ন মিলিয়ে ছেড়ে দিই জেল-গেটের বাইরে। এই হতভাগাদের উপলক্ষ্য করে রাষ্ট্রের কি বিপুল আয়োজন। এদেরই জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে সুবিশাল পুলিশ-বাহিনী, উদয়াস্ত কলম চালাচ্ছেন টাই-বাঁধা হাকিম আর তার বিস্তীর্ণ এজলাস, গলা ফাটাচ্ছেন কালো কোট-পরা উকিল, আর ময়লা চাপকানধারী মোক্তারের দল এবং ডাণ্ডা হস্তে ধাবিত হচ্ছেন অতিব্যস্ত জেলর সাহেব মৌলবী মোবারক আলি আর আমরা তার অনুচরবৃন্দ।

তবু এরাই আমার লক্ষ্মী। এরা আসে বলেই আমার ঘরে আসে অন্ন। এরা ছিল বলেই আমি আছি। নইলে আজ কোথায় থাকতাম আমি, আর কোথায় থাকত আমার রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব।

[ছয়]

অফিস বলতে সচরাচর বুঝি এমন একটা অন্ধকার বন্দিশালা, যার গহ্বরে কলম চলে দশটা থেকে পাঁচটা। সে কলম যারা চালায়, বহু আকাঙ্ক্ষিত দিবানিদ্রার সুযোগ তাদের বিরল, অর্থাৎ সপ্তাহান্তে একটি দিন, রবিবারের মধুর মধ্যাহ্নে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার অধিকার নেই। আমার রাশিচক্রের কোন্ তুঙ্গে কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ অবস্থান করছেন, সে সম্বন্ধেও আমি নিতান্ত অজ্ঞ। তবে সন্দেহ হয়, আমার কর্মস্থানে যিনি অধিষ্ঠিত তাঁর নাম চন্দ্রদেব। তাঁরই দৃষ্টি-প্রসাদে এমন এক স্বর্গে এসে কলম ধরেছি, যেখানে দিবানিদ্রার দৈনন্দিন অবসর। শুধু এই কারণেই চাকরি-জগতে আমরা সার্বজনীন ঈর্ষার পাত্র।

কিন্তু হায়, গোলাপ নিষ্কণ্টক নয়! তাই অন্য দশজন চাকুরেবাবু যখন সূর্যঠাকুরকে অগ্রাহ্য করে ধীরে সুস্থে শয্যাত্যাগ করেন এবং ধূমায়মান চায়ের পেয়ালায় মিলিয়ে দেন নিদ্রাজড়িত প্রথম চুম্বন, কিংবা বাজারের থলিহস্তে দেখে শুনে কলাটা-মুলোটা মাছের মুড়োটা সংগ্রহ করে গৃহিণীর মুখে ফুটিয়ে তোলেন খুশির ঝলক, আমরা তখন ধড়াচূড়া এঁটে কলম চালাই, লম্বা লম্বা হাই তুলি, আর সশব্দে চালনা করি কয়েদীদলন শাসনতন্ত্র। তারপর বারোটা, একটায় আসে মধ্যাহ্ন-বিরাম। অতঃপর আহারান্তে নিদ্রাসুখ। নিদ্রান্তে একটা বৈকালিক প্রত্যাগমন আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে নেই আফিসদুরন্ত তৎপরতা। সেখানে জেলখানার সঙ্গে বৈঠকখানার গলাগলি। রিটার্ন রেজিস্টারের কুইনাইন পিলের উপর তাম্বুল-সিগারেট-খোসগল্পের সুগার-কোটিং। বৈকালিক আফিস শুধু আফিস নয়, জেলবাবুদের সান্ধ্য-ক্লাব।

মার্চ মাস যায় যায়। মহাশীত অফিসিয়ালি অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সশরীরে বিদায় গ্রহণ করেননি। সরকারী কাগজ-পত্র থেকে অপসরণ করে ভর করছেন নিরীহ গৃহস্থের স্কন্ধে। সঙ্গে রয়েছেন প্রচণ্ড পবন। এঁদের সমবেত আক্রমণ রোধ করতে না পেরে সূর্যদেব আশ্রয় নিয়েছেন মেঘের আড়ালে। ঘরে ঘরে ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে।

মধ্যাহ্ন ভোজন কোনরকমে সমাধা করে ডবল লেপের উপর ভুটিয়া কম্বল চাপিয়ে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে সবে আশ্রয় নেবার আয়োজন করছি, দুয়ারে ডান্দুতের আবির্ভাব।

"টেলিফুক্ আয়া, হুজুর!"

পড়ে রইল কোমল শয্যার উষ্ণ আলিঙ্গন। টেলিফুকের এক ফুৎকারে উড়ে গেল আসন্ন নিদ্রার মধুর আমেজ।

"হ্যালো ?"

মোটা, ভারী এবং শ্বেত কণ্ঠে উত্তর এল—ডেপুটি কমিশনার কথা বলছি।

—গুড্ মর্নিং, স্যর। আই মিন্—

—লুক হিয়ার। তোমাদের 'সেল'এ জায়গা আছে তো? যদি না থাকে, একটা সেল খালি করে ফেল, আর স্পেশাল গার্ড রেডি রাখো।

—এখনি করছি, স্যর।

—আধ ঘণ্টার মধ্যেই একজন আসামী যাবে। লোকটা পাগল, Dangerous lunatic. বেশী গোলমাল করলে fetters লাগাতে পার। আলাদা রাখবে। See that he does not communicate with anybody.

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। খানিকটা কৌতূহলও হল। স্বয়ং বড়কর্তা যার জন্যে এতখানি ব্যস্ত, না জানি সে কি ভয়ঙ্কর জীব!

আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল লোকটা। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। দুপাশে বন্দুকধারী পুলিশ। এই দারুণ শীতে একটা ছেঁড়া পাজামা ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র নেই তার দেহে। অনাবৃত পিঠে, বাহুতে, ঘাড়ে এবং প্রায় সমস্ত শরীরে ফুটে উঠেছে মোটা মোটা আঘাতের দাগ। কোনো কোনোটা কেটে গিয়ে রক্ত জমে রয়েছে। কপালের নিচের দিকটা ফুলে উঠে একটা চোখ একেবারে ঢেকে গেছে। উপরের ঠোঁট উঁচু হয়ে নাকের সঙ্গে একাকার।

দুজন পুলিশ কোমরের দড়িটা খুলে টানতে টানতে লোকটাকে আমার টেবিলের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। বাকি চোখটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। এ কী রকম ডেঞ্জারাস লুনেটিক!

বললাম, হাতকড়ি খোল দেও।

পুলিশ দুজন ইতস্তত করতে লাগল। ওদের ইনচার্জ এগিয়ে এসে বলল, ভারী পাগল আছে, হুজুর।

—জানি। হাতকড়াটা খুলে নাও।

হাতকড়া খোলা হতেই 'পাগলটা' ধপাস করে বসে পড়ল মেঝের উপর। একবার এদিক ওদিক চেয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, জল। জল আসতেই বাটিটা কেড়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে শেষ করেই গড়িয়ে পড়ল সেইখানে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে কুঁচকে যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। অফিসে যে কয়েদীটা কাজ করে, ছুটে গিয়ে দুটো কম্বল এনে আপাদমস্তক চাপা দিয়ে দিল। গায়ে হাত দিয়ে বলল, ইস, গা পুড়ে যাচ্ছে, স্যর।

হাসপাতালে না পাঠিয়ে সেলেই পাঠাতে হল আসামীটাকে। ডেপুটি কমিশনারের হুকুম। কোনো অবস্থাতেই অন্যথা হতে পারে না।

অনেক কাজ জমে ছিল। বাড়ি ফিরতে কিছুটা রাত হল। ওভারকোট ছাড়তে যাচ্ছি। কেটা বলল, একজন বাবু এসে বসে আছেন বাইরের ঘরে। মনটা প্রসন্ন হল না। এই দুর্দান্ত শীতে কোনো রকমে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চুকিয়ে ফেলে ডবল লেপ আর ভুটিয়া কম্বলের দিকেই সমস্ত দেহমন উন্মুখ হয়ে ছিল। অতিথির আগমন উৎপীড়ন বলেই মনে হল।

বসবার ঘরে ঢুকতেই একটি কাপড়-চোপড়ের বান্ডিল কোনরকমে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। মুখের যেটুকু দৃশ্যমান তার থেকে তার জাতি, ধর্ম বা দেশ সম্বন্ধে কোনো আভাস পাওয়া গেল না। বয়স ছাব্বিশ না ছাপান্ন, সেটাও ধারণার অতীত রয়ে গেল।

বাঙলা ভাষায় বললেন, একেবারে জমে গেছি, মশাই। বোধ হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট পার হয়ে গেছে। একটু চা খাওয়াতে পারেন?

কেটাকে চায়ের হুকুম করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। আগন্তুক বললেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছি, জানতে চাইছেন তো? সে এক দুঃসাহসিক অভিযান। জানাজানি হলে চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়বে। তবু আসতে হল। গৃহিণী একেবারে নাছোড়বান্দা! সে যাকগে। ধনরাজ কেমন আছে, বলুন তো?

—কে ধনরাজ?

—ধনরাজ তামাং। সিংটম টি এস্টেট থেকে যাকে পাগল বলে চালান দিয়েছে। আপনি দেখেননি নাকি এখনো?

—আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

—এই দেখুন! আসল কথাটাই বলা হয়নি। ঠিকই ধরেছেন। খবরটা চাইবার আগে জানানো দরকার আমি লোকটা কে? পুলিশের সি-আই-ডিও তো হতে পারি। আসলে কিন্তু পুলিশ নই; ডাক্তার। ঐ চা-বাগানে চাকরি করছি আজ বাইশ বছর সাত মাস। নাম নিবারণ মজুমদার। বিশ্বাস না হয়, এই নিন—বলে তিনি তাঁর পর্বতপ্রমাণ বস্ত্রস্তূপের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে বুক পরীক্ষার যন্ত্রটা বের করে গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

অত্যন্ত বিরল হলেও সংসারে এমন একদল লোক চোখে পড়ে, অপরিচয় বা স্বল্প পরিচয় যাদের অন্তরঙ্গতার পথরোধ করে না। পরকে আপন করতে যাদের প্রয়োজন শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়। এই ডাক্তার বাবুটি যে সেই শ্রেণীর, সহজেই বোঝা গেল। তাই সম্পর্কটাও এক মুহূর্তে সহজ হয়ে গেল। গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে বললাম, সামান্য একটা রবারের নল দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করবেন, অতখানি কাঁচা ঠাওরাবেন না। জানেন তো, জেলের লোক আমরা।

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, জানি বৈকি! জানি বলেই তো এত রাত্রে চড়াও হয়েছি। খোঁজ খবর না নিয়েই কি আর জেলের গণ্ডীর মধ্যে পা বাড়িয়েছি মনে করেন? আর কিছু না থাক, প্রাণের ভয়টা তো আছে।

হঠাৎ গলা নামিয়ে আর একটু কাছে সরে এসে বললেন, তারপর, খবর কি বল তো ভাই? আছে, না হয়ে গ্যাছে?

বললাম, যা দেখলাম, আজ না হলেও কাল নাগাদ হয়ে যাবে বোধ হয়।

ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তাঁর মর্কট-মার্কা টুপি আর ভালুক-মার্কা গলাবন্ধের আড়ালে মুখের চেহারাটা চোখে পড়ল না। কিন্তু একটা গভীর নিঃশ্বাস কানে এল। কেটা চা দিয়ে গিয়েছিল। পেয়ালাটা টেনে নিয়ে তাতেই মন দিলেন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। চায়ের পাত্রও এক-সময়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর স্বর শুনে চমকে উঠলাম। এ যেন আর কেউ। যেন বহুদূরের কোন্ এক দুর্নিরীক্ষ্য বস্তুর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। ধনরাজ তখনো সর্দার হয়নি। সামান্য কুলী। এই নর্টন সাহেব ছিল ছোট ম্যানেজার।

মজলিশি ছোকরা। ভাল বেহালা বাজাতে পারত। একটা মস্তবড় পিয়ানো ছিল ওর ড্রয়িং রুমে—ঢুকে ঠিক ডান দিকে। গানবাজনা উপলক্ষ্য করে সাহেব-সুবোর হৈ-চৈ প্রায়ই লেগে থাকতো ওর বাংলোয়। সেদিনকার আয়োজনটা ছিল একটু বড় রকমের। আশে পাশের বাগান থেকে একদল সাহেব মেম তো ছিলই, তা ছাড়া দার্জিলিং থেকে ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। পান-ভোজনের দেদার বন্দোবস্ত। গোটা কয়েক বাছা বাছা পাহাড়ী মেয়েও মোতায়েন ছিল সাহেবলোগদের ফুর্তি জমাবার জন্যে। রাত তখন দশটা। নরক গুলজার। এমন সময় দেখা গেল—সর্বনাশ! মদ ফুরিয়ে গেছে। বিশ্বাসী, পরিশ্রমী এবং বেজায় চটপটে বলে সুনাম ছিল ধনরাজের। বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। টেনে তুলে নিয়ে এল এক খানসামা। যেতে পনের আসতে পনের—তিরিশ মাইল পথ ঘোড়া ছুটিয়ে সদর থেকে মদ আনতে হবে। সময় দেওয়া হল দু ঘণ্টা। ধনরাজ ছুটল। অন্ধকার রাত, পথ জঙ্গলে ঘেরা। ক্রমাগত চড়াই আর উতরাই। ফিরে যখন এল রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ। সমস্ত শরীরে ঘামের জোয়ার খেলে যাচ্ছে। ঘোড়ার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা। ম্যানেজার বেরিয়ে এল টলতে টলতে। চোখে লালপানির ছোপ। জড়িত কণ্ঠে গর্জে উঠল, দেরি কাঁহে হুয়া, উল্লুক?...

ধনরাজের কথা বলবার মত অবস্থা নয়। তবু অতি কষ্টে জানাল, রাস্তায় বাঘ বেরিয়েছিল। খানিকটা ঘুরে আসতে হয়েছে।

সাহেব হুঙ্কার দিলেন, চাপরাশী।

চাপরাশী ছুটে এল—হজৌর।

—মেরা চাবুক!

চাবুক এল এবং টুকরো টুকরো হয়ে গেল ধনরাজের পিঠে। কয়েকজন কুলী ধরাধরি করে ওর অজ্ঞান দেহটাকে আমার হাসপাতালে যখন নিয়ে এল, তখনো ওর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার থামলেন। বোধ হয় দৃশ্যটা তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। একটু পরে আবার শুরু করলেন—মনে করেছিলাম, মরে যাবে। মরাই বোধ হয় উচিত ছিল। কিন্তু কুলী মজুরের প্রাণ কি অত সহজে বেরোয়? কদিন যেতেই দিব্যি সেরে উঠল।

আমি বললাম, বেঁচে না উঠলে সাহেবের লাথি আর চাবুক পড়বে কাদের পিঠে?

ডাক্তার হেসে বললেন, ঠিক বলেছ। তাছাড়া, বেঁচে উঠবার অন্য প্রয়োজনও ছিল। সেই কথাই বলছি।

মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন নর্টনের বাংলো থেকে খবর এল সাহেবের অসুখ। গিয়ে দেখি অবস্থা জটিল। গোটা দুয়েক স্টুলের পরেই পাল্‌স নেই, চোখ বসে গেছে ইঞ্চি দেড়েক, গলার স্বর ভাঙ্গা। বেড্‌প্যানটা সরিয়ে নেবার জন্যে মেথরটাকে ডাকলাম। সাড়া নেই। তারপর একে একে বয়, বেয়ারা, চাপরাশী, মশালচি, বাবুর্চি—সবগুলোর নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম। কোনটাকেই পাওয়া গেল না। বাইরে এসে দেখি, বাড়ি একেবারে ফাঁকা। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা লোক—ধনরাজ তামাং।

কিরে? তুই এখানে কি করছিস?

ধনরাজের মুখ শুকনো—সাহেবের নাকি বড্ড অসুখ, ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, বড্ড খারাপ অসুখ—কলেরা। তুই চলে যা।

ও চলে গেল। তবে নিজের বাড়ি নয়, সাহেবের শোবার ঘরে। নিজ হাতে সাফ করল কলেরার ময়লা। আর সেবা যা করল, সাহেবের বিবি কিংবা মাও বোধ হয় পারত না তার সিকিভাগ।

নর্টন বেঁচে উঠল। ধনরাজ বখশিশ পেল দুখানা দশ টাকার নোট। সাহেব অত্যাচারী হতে পারে, অকৃতজ্ঞ নয়। বছর খানেকের মধ্যে ওর প্রমোশনও হয়ে গেল—কুলী থেকে কুলীর সর্দার। সেই দিনই দেখা করতে এল। হাতে একটা ছোট ভেড়ার বাচ্চা।

—ওটা কি রে?

ধনরাজ একগাল হেসে বলল, খুকুদিদি খেলা করবে।

—কি আপদ! ওটাকে পুষবে কে?

ধনরাজ শুনল না। 'খুকুদিদিও' দেখলাম ঐ লোভনীয় খেলার বস্তুটি ছাড়তে রাজী নয়। মেয়েটাকে কোলে-পিঠে করে ঐ একরকম মানুষ করেছিল। বললাম, সর্দার হলি; এবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর।

ধনরাজ লজ্জিত হাসি হেসে বলল, মেয়ে কোথায়?

—কেন, এত মেয়ে রয়েছে বস্তিতে?—বলে দুচারটা সুশ্রী মেয়ের উল্লেখ করলাম। ওর চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, ওদের নাম মুখে এনো না বাবু। ছুঁলে নাইতে হয় ওগুলোকে। কোথায় ওরা রাত কাটায়, সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি—বলে, ম্যানেজারের বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল। কথাটা যে সত্যি সে আমিও জানি, সকলেই জানে। কিন্তু বস্তি-জীবনের

অন্যান্য অসংখ্য উপসর্গের মত এটাও ওরা সবাই মেনে নিয়েছে। এই তুচ্ছ কারণে বস্তির কোনো মেয়েরই বিয়ে আটকে থাকে না। এমনি ধারা ঘৃণার ছাপও দেখা যায় না আর কোনো কুলী যুবকের চোখে মুখে।

ডাক্তারবাবুর সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। কেটাকে ডেকে কেসটা আনতে বলে দিলাম। কেটা এলে উনি তাঁর খাঁটি স্বদেশী ভাষায় বললেন, এই ব্যাটা কী চা করেছিস? ও-সব দুধের সরবত তোর বাবুকে দিস। আমি হলাম তোদের দেশের লোক। আমার জন্যে বেশ করে এক কাপ—বুঝলি তো?

কেটা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আপনার কাছে মাথা ঘোরার ওষুধ আছে তো?

ডাক্তার একটু ব্যস্ত হলেন, কেন? মাথা ঘুরছে নাকি তোমার?

গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললাম, না, এখন ঘুরছে না। তবে আপনার চা'এর রূপ দেখে ঘুরবে তো। তাই, আগে থাকতেই ব্যবস্থা করে রাখছি।

উনি হেসে উঠলেন—আগে থাকো না, ভায়া, বছরখানেক এই ভূতুড়ে শীতের দেশে। তারপর দেখবো, কার চা দেখে কার মাথা ঘোরে।

আমি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, থাক। সে-সব পরের কথা পরে হবে। আপনি শুরু করুন। ডাক্তারবাবু সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, খুকুটার বিয়ে স্থির হল। সপরিবারে দেশে যাবার আয়োজন করছি। ধনরাজ ধরল, সেও যাবে। গিন্নী তো হাতে স্বর্গ পেলেন। জান তো, আমাদের মত চাকরিজীবীদের দেশই হল আসল বিদেশ। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব যাঁরা আছেন, তাদের সস্নেহ মূর্তি স্মরণ করলে প্রাণে আর জল থাকে না। ধনরাজের মত কাজের লোক আর সত্যিকার আপনার লোক পেয়ে আমারও বল বেড়ে গেল। সাহেবকে বলে ওর ছুটি করিয়ে নিলাম।

বিয়ের কাজকর্ম মিটে যাবার পরেও দুদিন আমাকে আটকে থাকতে হল। মা ওকে ছাড়তে চান না। আসবার সময় যখন প্রণাম করল, মা ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোর মাকে আমার হিংসে হচ্ছে ধনরাজ। তোর মত ছেলে পেটে ধরেছিল, সে মাগীর তপস্যার জোর আছে। আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। আমার মা মানে—অত্যন্ত সেকেলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ বিধবা। আর ধনরাজ তামাং একটা অস্পৃশ্য, অনাচারী পাহাড়ী কুলী।

সপরিবারে ফিরছি। পোড়াদ' স্টেশনে গাড়ি বদল করে দার্জিলিং মেল ধরবার জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বিরক্তির একশেষ। প্লাটফরমে পায়চারি করে করে সময় আর কাটে না। ওদিকে দোকানগুলোর সামনে কী একটা জটলা হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। নেহাত কিছু করবার নেই বলে দেখতে গেলাম। একটু ভিতরের দিকে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, একটি মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে এক নেপালীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর লোকটা অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগালি করছে। তার আস্ফালন কানে এল—পা ছেড়ে দে বলছি, হারামজাদী, আমি কখ্খনো তোকে ঘরে নিতে পারবো না।

মেয়েটি কাতরভাবে বলল, আমি তা হলে কোথায় যাবো?

নেপালীটা মুখ ভেংচে তার বলবার ভঙ্গীটা নকল করে বলল, কোথায় যাবো? কেন, যাদের ঘরে একরাত একদিন কাটিয়ে এলি, তোর সেই—বলে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল। বেশ একটা হাসির রোল পড়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ব্যাপারটা মোটামুটি ধারণা করতে অসুবিধা হয়নি। একজন ভদ্রগোছের লোককে জিগ্যেস করে গোটা ঘটনাটাই জানা গেল।

ঐ নেপালী পোড়াদ' স্টেশনে একটা ছোটখাট চায়ের স্টলের মালিক আর মেয়েটি তার বৌ। মেয়েটার বয়স অল্প এবং দেখতে সুশ্রী। এ অবস্থায় ঐ অঞ্চলে যা সচরাচর ঘটে থাকে, তাই ঘটল। অর্থাৎ পাশের কোন্ গ্রাম থেকে মুসলমান গুণ্ডার দল রাতারাতি হানা দিল দোকানে। মালিক পুরুষ মানুষ। কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাল। মেয়েটাকে নিয়ে গেল মুখ বেঁধে। তারপর একটা রাত আর একটা দিন কোথায় কি অবস্থায় ওর কেটেছিল, সে বীভৎস ইতিহাস খুলে বলবার দরকার নেই। রাত্রির অন্ধকারে কেমন করে ও ছাড়া পেল, কেউ জানে না। বোধ হয় নেহাত দৈহিক কারণে ও-পক্ষের কড়া পাহারা কিছুটা শিথিল হয়ে থাকবে। সেই সুযোগে কোনরকমে অর্থাৎ একমাত্র মনের জোরেই ঐ দেহটাকে টেনে নিয়ে ও ছুটে এসেছে নিজের ঘরে। জানে না, সে ঘর ওর ভেঙ্গে গেছে চিরদিনের তরে।

ডাক্তারবাবুর মৃদু কণ্ঠ আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল। দু মিনিট ছেদ পড়ল তাঁর গল্পে। তারপর আবার শুরু করলেন—

আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা মেয়েদের নাম দিয়েছেন—ঘরণী, গৃহিণী। যারা একটু কবিগোছের, তারা আবার দু ডিগ্রী এগিয়ে বলেন, গৃহ-

লক্ষ্মী, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এমনি কত কি? এ শুধু মনভোলানো মিছে কথা। গৃহ সে-ই গড়ে তোলে জীবন দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে; কিন্তু গৃহ তার নয়। গৃহের দেবতা পুরুষ। তাই সে আর প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে কাল গুণ্ডার হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিল, আজ ভাগ্যের হাতে ফেলে দিয়ে ধর্মরক্ষা করল।

ভিড়ের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।......

—মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, বাধা দিয়ে বললাম আমি, আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি। তবু বলবো, আমি কিন্তু আপনার মত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে পারতাম না।

—কি করতে?

—পা থেকে জুতো খুলে ঐ জানোয়ারটার মুখে মারতাম। পারি না পারি, চেষ্টা অন্তত করতাম একবার।

—কী লাভ হত? জুতোটাই তোমার জখম হত। আরেক জোড়া আবার কিনতে হত পয়সা খরচ করে।

আমি একথার জবাব খুঁজে পেলাম না। উনি একটুখানি অপেক্ষা করে বললেন, অনেক দিনের কথা। তখনো এ চুলগুলো বারো আনা পাকতে বাকি। কিন্তু একথাটা বুঝতে বাকি ছিল না যে, সেই নেপালী ছোকরার চেয়েও অনেক বড় বড় জানোয়ার তোমাদের সভ্য-সমাজে অবাধে বিচরণ করে বেড়ায়। তাদের পিঠ আমাদের জুতোর নাগালের বাইরে। ঐ একটা তুচ্ছ চা-ওয়ালাকে মেরে আর কতখানি ক্ষোভ মিটত? তবে, হ্যাঁ। ড্রামাটিক একটা কিছু হতে পারতো হয়তো। তার জন্যে চিন্তা নেই। এখন যে দৃশ্যে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, সেটা আরো বেশী ড্রামাটিক।

স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে একটা সুসংবাদ পাওয়া গেল, গাড়ি ঘণ্টা দুই লেট! মেয়েদের ওয়েটিং রুমে উঁকি মেরে দেখলাম, সকন্যা গৃহিণী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছেন। সময় কাটাবার এই সহজ আর সনাতন রাস্তাটা খোলা থাকতে আমি যে কেন এতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে মরছি তার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। কম্বল বগলে করে একটা নিরালা গোছের জায়গার সন্ধান করছি এমন সময় মূর্তিমান বিঘ্নের মত ধনরাজ এসে হাজির।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?—প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। ও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, যদি রাগ না কর তো একটা কথা বলি।

—কি বলবি, বল না? রাগ করবো কেন?

—শুয়োরটা তো পালিয়েছে। ওর বাপের ভাগ্যি, আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম। দুটো মিনিট আগে আসতে পারলে এক প্যাটি দাঁত ওর উপড়ে নিয়ে আসতাম।

চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধনরাজের। আমি বললাম, থাক্। সে বাহাদুরি না দেখিয়ে ভালই করেছ। ওর দাঁত আমাদের কোনো কাজে লাগত না। এখনকার মতলবটা কি শুনি?

—সে তো তুমি বুঝতেই পারছ।

—তা কিছুটা পারছি। কিন্তু ওকে নিয়ে রাখবি কোথায়?

—ঘরেই রাখবো। আর কোথায় রাখবো? আমি অপলক চোখে চাইলাম ওর দিকে। ও একটু হেসে বলল, ঘরের বৌকে লোকে আর কোথায় রাখে?

—সব ঘটনা শুনেছিস?

—শুনেছি।

এর পরে আমার মুখে আর কথা সরল না। জানি, অন্যের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা ওদের সমাজে বাধে না। কিন্তু তাই বলে ঐ মেয়ে? ওর সমস্ত ইতিহাস জেনেশুনে? মনে হল, বাধা দেওয়াই আমার কর্তব্য। পথে-ঘাটে এই সব হঠকারিতার জন্যে ওকে একটা কড়া ধমক দেওয়া দরকার। কিন্তু তোমায় সত্যি বলছি ডেপুটিবাবু; ওর চোখের দিকে চেয়ে সুর আমার আপনিই নরম হয়ে এল। না, ঝোঁকের মাথায় বাহাদুরি দেখাবার কোনো লক্ষণ তো সেখানে নেই। এ তো ছেলেখেলা নয়। আমি যা কখনো পারবো না, আমি তো তুচ্ছ, অনেক বড় বড় আদর্শবাদী মহাপ্রাণ যুবক যেখানে পৌঁছিয়ে আসবে, এই কুলীটার কাছে সেটা এতই সহজ!

অনাবশ্যক জেনেও বললাম, ভালো করে ভেবে দেখেছিস?

—দেখেছি!

—ও রাজী হবে?

—তা জানিনে। জিজ্ঞেস করেছিলাম। কথা বললে না, খালি কাঁদতে লাগল।

—ও, তাই বুঝি আমার ডাক পড়েছে? কিন্তু আমার বখশিশ?

ধনরাজ খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল এক পাশে। মুখে তার সলজ্জ হাসি।

ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ঐ হতভাগাটার সঙ্গ নিলাম। দোকানের সামনে থেকে উঠে গিয়ে একটা গাছের নীচে মেয়েটা বসেছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ধনরাজ বলল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ও মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকাল। মুখখানি
চোখ দুটো এমন অসহায়, একবার দেখেই কেমন মায়া হল মেয়েটার ওপর। ওদের পাহাড়ী ভাষায় বললাম, তোমার সব কথা শুনেছি। তোমার বাপ আছে কিনা জানি না। আমাকে তুমি তোমার বাপের মতই বিশ্বাস করতে পার। ধনরাজকে দেখিয়ে বললাম, ওকে আমি এতটুকু থেকে জানি; ছেলের মতই জানি। ও যে-কথা তোমায় বলেছে, সেটা তুমি নিজেই ভেবে দেখ। আমি জোর করবো না। কিন্তু এটা জোর দিয়েই বলবো, ওকে বিয়ে করে কোনো মেয়েই কোনদিন দুঃখ পাবে না।

মেয়েটা একবার কি ভাবল। তারপর আমার পায়ের উপর পড়ে বলল, তুমিই আমার বাপ, বাবুজী।

আর কিছু বলতে পারল না। যেটুকু বাকি ছিল, জানিয়ে দিল ওর চোখের জল।

একটা ছোটখাটো নাটক করে ফেললাম। কি বল? অবিশ্যি নাটকের আসল হিরো ঐ ব্যাটা ধনরাজ! আমি 'সাইড অ্যাকটর' মাত্র—বলে ডাক্তারবাবু হা-হা করে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। আমি তার হাসিতে যোগ না দিয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বললাম, আপনার 'রোল'টা যে কী নাটকের শেষ পর্যন্ত না গেলে বুঝতে পারছিনে। অতএব 'নেক্সট্ সীন প্লিজ'—

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, আচ্ছা, তাহলে শোনো—

বৌটাকে সুস্থ করে তুলতে লেগে গেল মাসখানেক। বলা বাহুল্য, এ সময়টা ও আমার বাড়িতেই রইল। আমি হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছিলাম। গিন্নী রাজি হলেন না। সমস্ত ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। তবু একবার বোঝাতে চেষ্টা করলাম, হাসপাতালে তো বেশ ভালো ব্যবস্থাই আছে। এ ঝঞ্ঝাট বাড়িতে রাখতে চাইছ কেন?

গৃহিণী সংক্ষেপে বললেন, সে কথা তোমরা বুঝবে না। 'তোমরা'—কথাটার ওপর বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন। জানি না কি তাঁর বক্তব্য। আমার কাছে ওটা হেঁয়ালিই রয়ে গেল। হয়তো—

আমি বাধা দিলাম, এর মধ্যে তো কোনো হেঁয়ালি নেই ডাক্তারবাবু।

মেয়েদের ঐ যে কত বড় লাঞ্ছনা, সে শুধু মেয়েরাই বুঝতে পারে। আমরা বুঝি বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু ওরা বোঝে ওদের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে।

তোমার কথা আমি মেনে নিতাম ভাই, বললেন ডাক্তারবাবু, যদি বুঝতাম মেয়েদের এই চরম লাঞ্ছনা আসে শুধু পুরুষেরই কাছ থেকে। কিন্তু তা তো নয়। একথা কি শোননি—কত মেয়েমানুষ এই নরকদৃশ্য শুধু যে পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে, তা নয়, নিজে মেয়ে হয়েও আর একটা মেয়ের উপর লেলিয়ে দেয় নিজের স্বামী কিংবা তার সঙ্গী অন্য কোনো জানোয়ার।

বললাম, শুনেছি। সব্যসাচীর কথাটা মনে পড়ছে, গরুর মাংস কসাইখানা থেকে গরুই বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু তবু বলবো, ওরাই সব নয়। যে কল্যাণী ঐ লাঞ্ছিতা পাহাড়ী মেয়েটার সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওর দুঃখের বোঝাটা একটুখানি হালকা করতে চেয়েছিলেন, তিনিও ওদের জাত। যাক্, তারপর বলুন—

ডাক্তারবাবু শুরু করলেন—ধনরাজ তার বস্তির বাসা ছেড়ে দিয়ে বৌ নিয়ে উঠে গেল পাহাড়তলীর ঐ দিকটায়, চা-বাগানের আওতার বাইরে। বছর খানেক পরে ওদের একটি মেয়ে হল। মেয়ে তো নয়, যেন একরাশ টগর ফুল। ধনরাজ তার নাম রাখল লখিয়া। একটা রাতের প্রলয় বৌটার দেহে যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিল, সারা জীবনে সেটা জোড়া লাগবার নয়। প্রসবের ধকল কাটিয়ে ওঠা কঠিন হল।

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস তোমায় না বলে পারছিনে, ডেপুটিবাবু। আমি ডাক্তার। অনেক সুদক্ষ নার্স নিজের চোখে দেখেছি। আন্তরিক সেবা যে কি বস্তু, তাও দেখবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু পুরুষ মানুষ যে এমনি মায়ের মত নিজের সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত সমানে রুগী নিয়ে পড়ে থাকতে পারে, ঐ ধনরাজটাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। বৌটা যে আরো বছর দুই বেঁচে গেল, সে শুধু ঐ সেবার জোরে, তার জীবনীশক্তির জোরে নয়।

দু বছরের একটা শিশু নিয়ে ধনরাজ বিব্রত হয়ে পড়ল। আমরা বললাম, বিয়ে কর। মেয়েটাকে তো বাঁচাতে হবে।

ধনরাজ হেসে বলত, ঐ হুকুমটা কোরো না বাবু। তার জিনিস কি আর কারো হাতে তুলে দিতে পারি?

একটা দূর সম্পর্কের বুড়ী পিসী কোত্থেকে জুটিয়ে নিয়ে এল। সে

শুধু দুটো রেঁধে দিত আর মেয়েটাকে আগলে রাখত যতক্ষণ ও কাজ থেকে না ফেরে। মেয়েকে মানুষ করবার সমস্ত ভার নিল ওর নিজের হাতে। যা কিছু রোজগার, সব যায় ঐ মেয়ের পেছনে। সে মিশনারী ইস্কুলে পড়ে। তার রাশি রাশি জামা-কাপড়, খেলনা, পুতুল, প্রসাধনের ঘটা।

কুলী বস্তিতে সবাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ধনরাজ হেসে উড়িয়ে দেয়। হেড-ক্লার্কবাবু বললেন একদিন, ধনরাজের কাণ্ডটা দেখেছেন মশাই? মেয়েটাকে তো ধিঙ্গী করে তুলল। এবার বিয়ে দেবে কেমন করে? ঐ মেমসাহেব তো আর সত্যিই কোনো কুলী-কামিনের ঘর করতে পারবে না?

ব্যাপারটা সত্যিই ভাববার মত। মেয়েটাও দেখতে দেখতে বেড়ে উঠল। নাম লখিয়া। দেখতে সে লক্ষ্মী-প্রতিমাকেও হার মানায়।

ধনরাজকে ডেকে বললাম, লখিয়ার বিয়ের কতদূর কি করলি?

ও করুণভাবে বলল, তুমি তো সবই জানো বাবু। হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি এমন একটা ছেলেও তো দেখছি না এ অঞ্চলে।

—তাহলে কি করতে চাস্? মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। জায়গা ভাল নয়।

ধনরাজ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সে কি আর জানিনে? কত সাবধানে যে রাখতে হয় মেয়েটাকে?

তারপর একটু কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল, শ' পাঁচেক টাকা জমিয়েছি। সব তো ওরই। শহরে গেলে একটা লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে কি জুটবে না আমার লখিয়ার জন্যে?

দেখলাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। একটা মোটামুটি আলোচনা করে আপাতত স্থির হল, ও মাসখানেকের ছুটির ব্যবস্থা করে লখিয়াকে নিয়ে দার্জিলিং যাবে। ওর এক মাসতুতো ভাই পুলিশে কাজ করে। সেখানে উঠে একটা ভালোগোছের নেপালী ছেলের চেষ্টা করা হবে।

এরই দিনকয়েক পরে বিকালের দিকে ম্যানেজার নর্টন সাহেব আমাকে আর হেডক্লার্কবাবুকে সঙ্গে করে বেরিয়েছিলেন পাহাড়তলীর ঐ দিকটা ঘুরে দেখবার জন্যে। ঐ অঞ্চলের খানিকটা জমি সংগ্রহ করে বাগানগুলো বাড়িয়ে তোলার একটা প্ল্যান ছিল। ফিরবার পথে একটা ছোট বাড়ির সামনে দেখলাম একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়ে ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছে।

তার রূপ, তার স্বাস্থ্য, তার সাজপোশাক এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা

মার্জিত সপ্রতিভ ভাব—ও অঞ্চলে এমন বেমানান যে, কারো চোখে না পড়ে পারে না। সাহেব খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কে ডাক্তার?

আমি জবাব দেবার আগেই হেডক্লার্কবাবু বললেন, ধনরাজ তামাংএর মেয়ে।

সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন, You mean our Dhanraj?

বললাম—হ্যাঁ, স্যর, আমাদের ধনরাজই বটে।

দিন দুই পরে সাহেব হুকুম দিলেন, ধনরাজকে বস্তিতে উঠে আসতে হবে। তার কুলী সর্দারকে তিনি বাইরে থাকতে দিতে পারেন না। ধনরাজ রাজী হল না। সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর ধনরাজ ছুটির দরখাস্ত করল। সেটা সরাসরি না-মঞ্জুর হয়ে গেল।

এরই ঠিক পরের রবিবার। আবার এক পার্টির ব্যবস্থা হ'ল সাহেবের বাংলোয়। নাচ, গান, খানাপিনার বিরাট আয়োজন। বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রিত হলেন নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সাহেব। ধনরাজকে পাঠান হল মদের সন্ধানে। এমন অসময়ে হুকুম এল যে, ফিরতে বেজে গেল রাত বারোটা। বোতলগুলো কোনো রকমে সাহেবের কুঠীতে পৌঁছে দিয়ে সে ছুটল নিজের বাড়ি। গিয়ে দেখল, পিসী কপাল চাপড়াচ্ছে; লখিয়া নেই। বার বার প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে এইটুকু শুধু সংগ্রহ করা গেল যে, কতগুলো চাপরাশ পরা ষণ্ডামতন লোক মেয়েটাকে মুখে কাপড় দিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ধনরাজ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সাহেবের বাঙলোয়। বেয়ারা চাপরাশির বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সোজা হানা দিল নর্টনের বেডরুমে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধনরাজ তখন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। প্রাণপণে কীল, চড় আর লাথি মারছে দরজায় আর চিৎকার করছে, দরজা খোলো, খোলো দরজা। নর্টন বেরিয়ে এলেন।

লখিয়া কোথায়?—গর্জে উঠল ধনরাজ। লালপানির কল্যাণে তখন সাহেবের তুরীয় অবস্থা। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, লখিয়াকো হাম্ সাদি কর লিয়া। I am your son-in-law; হাঃ হাঃ হাঃ—

চোপরাও উল্লুক—বলে ধনরাজ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মনিবের ঘাড়ে এবং উদ্যত নাকের উপর বসিয়ে দিল তার পাহাড়ী হাতের ঘুষি।

মিস্টার নর্টন ভূতলে আশ্রয় নিলেন। শ্বেতাঙ্গের পবিত্র রক্তে কালো-আদমির দেশ ধন্য হল। পুলিশের বড় কর্তা স্বয়ং উপস্থিত তাঁর দলবল

নিয়ে। অর্জিত দ্রব্যের তিনিও একজন অংশীদার। কাজেই পরের দৃশ্যটা অনুমান করতে কষ্ট হবে না। অনুমান কেন? খানিকটা নমুনা তো নিজের চোখেই দেখেছ আজ।

ডাক্তারবাবু সিগারেট ধরালেন। ঘড়ি দেখে বললেন, ঈস্ অনেক রাত করে ফেলেছি। যাও। এবার তুমি খাওগে; আমি উঠি।

আমি হঠাৎ অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করলাম, মেয়েটার কি হল ডাক্তারবাবু?

—তুমিও যেমন। সে খবর রাখে কে? শুনেছিলাম তার নাকি ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।

—আচ্ছা, ওকে কি উদ্ধার করা যায় না?

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আমার দু'কাঁধের উপর দু'টো হাত রেখে হেসে বললেন, তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ।

উনি যাবার জন্যে পা বাড়াতেই আমার যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল। বাধা দিয়ে বললাম, একি? এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন। না-না। যা হোক্ দুটো মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। ভোরে উঠিয়ে দেবো।

ডাক্তার আমার একটা হাত ধরে বললেন, সে হবার যো নেই, ভাই। ঘোড়া অপেক্ষা করছে। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। ভোরবেলা বাগানে হাজির হওয়া চাইই।

চমকে উঠলাম, বলেন কি? এই দারুণ শীতে, এই গভীর রাত্রে—

ডাক্তারের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, কি করবো, ভাই? চাকরি।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে আবার একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা ডাক্তার-বাবু, ধনরাজকে আসামী করে ওরা মামলা করলে না কেন? ম্যানেজারকে জখম করেছে; মস্ত বড় চার্জ।

ডাক্তার হেসে বললেন, প্রশ্নটা কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলের যোগ্য হল না, ডেপুটিবাবু। মোকদ্দমা চলতে পারে। কিন্তু ধনরাজকে আদালতে দাঁড় করালে লখিয়া তো আর চাপা থাকে না। তার চেয়ে সহজ, নিরাপদ এবং মোক্ষম পন্থা হ'ল ওকে বেমালুম পাগল বানিয়ে দেওয়া।

আমি তর্ক তুললাম, সেটাই কি সহজ পন্থা হল? একটা ভাল মানুষকে পাগল বানাতে হবে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তো চাই?

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। আর কোনো জবাব দিলেন না।

দেখতে দেখতে সেই চলন্ত কাপড়-চোপড়ের বান্ডিল পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কে

এই লোকটা? অখ্যাত, অজ্ঞাত, ক্ষ্যাপাটে ধরনের এক চা-বাগানের ডাক্তার। কিন্তু কেমন করে জানি না, আমার মত শিক্ষাভিমানীর মনের কোণে কোথায় একটা দাগ রেখে গেল।

তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

ধনুরাজ-কাহিনীর বাকি অংশটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গায়ের দাগ মিলিয়ে যেতে তার লাগল প্রায় মাস দুই। সেই সময়ের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্জেন বার কয়েক জেল পরিদর্শন করলেন। তারপর একদিন কোর্ট থেকে অর্ডার এল—সিভিল সার্জেনের অভিমত গ্রহণ করে ধনরাজ তামাংকে উন্মাদ সাব্যস্ত করা হল। অবিলম্বে তাকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ রাঁচী মেন্টাল হাস-পাতালে স্থানান্তরিত করা হউক। দলিলের মধ্যে একটা দেখলাম, পুলিশের রিপোর্ট। পাহাড়ী দারোগা লিখেছেন, তদন্তে জানা গেল ধনরাজ নিয়মিত গঞ্জিকা-সেবী। তার পিতৃকুলে একাধিক ব্যক্তির মস্তিষ্ক-বিকৃতির ইতিহাস বিদ্যমান।

অতঃপর হাকিমের আদেশমত আমিই একদিন তাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিলাম। দুর্দান্ত পাগল বলে জেল কোডের নির্দেশ অনুসারে গাড়ির একটা গোটা কামরা রিজার্ভ করে দিলাম দার্জিলিং থেকে রাঁচীরোড্। পুলিশের লোকেরা যখন ওকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল, ও একটি কথাও বলল না। শুধু মনে হল, ওর অবসন্ন চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে একটা নিষ্ফল প্রশ্ন—আমার লখিয়া কোথায় রইল?

হয়তো এ সবই আমার কল্পনা কিংবা চোখের বিভ্রম।

[সাত]

গোজাতির সেবা যদি পুণ্য-সঞ্চয়ের পরম-পন্থা বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, জেল প্রাঙ্গণ অবশ্যই একটি পুণ্য-ক্ষেত্র। ছোট বড় সব জেলেই একটি করে ডেয়ারি বা গোশালা আছে এবং সেখানকার যারা অধিবাসী তাদের সেবার উপকরণ সাধু গুরু মোহান্তের ঈর্ষার উদ্রেক করবে। তাদের বাসের জন্যে সুদৃশ্য ইমারত, পানভোজনের জন্যে অনায়াসলব্ধ মহার্ঘ্য খাদ্য এবং দলন-মর্দনের জন্যে বিনা মাইনের অনুগত ভৃত্য। মাঠে মাঠে চরে বেড়াবার দৈন্য কিংবা মাটির ঘাস খুটে খাবার উঞ্ছবৃত্তি—তাদের কোনোদিন স্পর্শ করে না। তারা বংশ-গৌরবে কুলীন এবং মেদ-বাহুল্যে অভিজাত। গিরীনদা মিথ্যা বলেননি, অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী যারা, তারাই পরজন্মে জেলের গরু হয়ে জন্মায়।

ইংরেজের তৎকালীন রাষ্ট্রবিধানে যেমন ডায়ার্কি, ডেয়ারি-বিধানেও তেমনি দ্বৈত-শাসনের ব্যবস্থা। গোধনের কুলরক্ষা এবং খাদ্য নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন পশুপালন বিভাগ, আর কারা বিভাগের হাতে রয়েছে দুগ্ধ-ভাণ্ড। একদিকে পশু-ডাক্তার, আর একদিকে জেল-ডাক্তার। প্রথম ব্যক্তিটি নিষ্কাম-ধর্মে দীক্ষিত। তার অধিকার শুধু কর্মণ্যেব। দ্বিতীয়টি কর্মাতীত মহাপুরুষ। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু ফলেষু। যাদের নিয়ে এই দার্শনিক ভেদাভেদ, তারা ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস হয়ে তৈলচিক্কণ দেহে পরম সুখে বেঁচে বর্তে থেকেই তাদের কর্তব্য শেষ করেন। চতুর্থ পক্ষ, অর্থাৎ আমরা, সকৌতুকে লক্ষ্য করি—গোধনের নধর দেহ যেমন শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, তার দুধের অঙ্ক তেমনি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মত ক্রমশ বিলীয়মান।

অধিকাংশ জেল-ডেয়ারির এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বলা বাহুল্য, আমাদের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ রীতির বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একদিন কাগজপত্র সই করতে করতে দুগ্ধাঙ্কের এই তথ্যটি বড় সাহেবের নজরে পড়ে গেল। ডেয়ারির হিসাব-রক্ষার দায়িত্ব ডাক্তারের। অতএব ডাক্তার

থাপার ডাক পড়ল। সাহেব প্রশ্ন করলেন, ডক্টর, তোমার দুধ কমে যাচ্ছে কেন দিন দিন?

ডাক্তার শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করল, I don't know.

—You don't know! তাহলে জানবে কে?

ডাক্তার নিরুত্তর। মিস্টার রায় গলা চড়িয়ে বললেন, বল। দুধের খবর তুমি না জানলে জানবে কে?

ডাক্তার একবার আমার মুখের দিকে, একবার জেলর সাহেবের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল এবং কোনো তরফ থেকে কোনো ভরসা না পেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, The cows might know, Sir.

মিস্টার রায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোধ হয় সন্দেহ হল, ডাক্তার বিদ্রূপ করছে। পরক্ষণেই তার নিতান্ত অসহায় দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে কি মনে হল জানি না। তিনি সহসা উচ্চহাস্য করে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে বললেন, All right, you may go.

আমি প্রবেশনার। অতএব দুগ্ধ হ্রাসের রহস্য উদ্ঘাটন করবার ভার পড়ল আমার উপর। আমি যথারীতি তদন্ত শুরু করলাম। দুচার দিনেই বুঝতে পারা গেল, একজন দেশোয়ালী জমাদারের একটি বৃহৎ লোটা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। গেট-কীপারকে চেপে ধরলাম, তুম কেয়া করতা হ্যায় জী? লোটা তো সচল পদার্থ নয় যে নিজে নিজে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবে। এ রকম চলতে থাকলে তোমার নকরি অচল হয়ে যাবে, বলে দিচ্ছি। সে আশ্বাস দিল, সব ঠিক হো যায়গা। পরদিনই লোটা অন্তর্ধান করল। দুধের অঙ্ক বেড়ে গেল এক লাফে কয়েক ধাপ। মনিব খুশী হলেন।

কদিন না যেতেই আবার যে-সেই। গেট-কীপারকে ডেকে বললাম, তোমার আর রক্ষা নেই। প্যাক্ আপ প্লিজ। লোটা কম্বল বেঁধে ছেঁদে তৈরি হও।

সে জানাল দুধ যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু 'লোটাসে নেহি।'

—নাই বা হল লোটাসে? হাঁড়ি কিংবা ঘড়াসে যাচ্ছে বলে তোমার দায়িত্ব কমে যাবে? তুমি তল্লাসি করছ না ঠিকমত।

এ কথার উত্তর না দিয়ে সে বলল, কাল ভোরবেলা একবার মেহেরবানি করে যদি আসেন, সব নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

তাই হল। গেলাম ভোরবেলায়। ডেয়ারিতে তখন দোহনপর্ব শুরু হয়েছে। গেট-কীপারের পরামর্শমত আমরা লুকিয়ে রইলাম পাশেই এক

পাঁচিলের আড়ালে। সেই বিশালকায় জমাদার সাহেব চেয়ার জুড়ে বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে শোভা পাচ্ছে তাঁর অনুগত কয়েদীর দল। কী একটা হাসির কথা হচ্ছিল। সবটা শোনা গেল না। শেষটুকু শুনলাম,—'তিন দিনের ছোকরা। লাগতে আসে আমার সঙ্গে! ঠেকাক দেখি, কেমন বাহাদুর?' বুঝলাম 'ছোকরা'টি এই অধম। জমাদার সাহেবের আস্ফালন যে নেহাত শূন্যগর্ভ নয়, পরক্ষণেই বোঝা গেল। একজন কয়েদী একটা বালতি করে খানিকটা দুধ তাঁর হাতে এনে দিল এবং তিনি কালবিলম্ব না করে সেটা ঢক ঢক করে ঢেলে দিলেন গলার মধ্যে। সের তিনেক আন্দাজ খাঁটি কাঁচা দুধ! পাত্রটি নিঃশেষ করে স্ফীত উদরে হাত বুলাতে বুলাতে একটা রাজোচিত উদ্‌গার তুললেন এবং তার পরেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলেন।

পরের দৃশ্য নিতান্ত করুণ। যে "ছোকরাকে" তিনি দুমিনিট আগে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তারি পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল তাঁর দুগ্ধ-পুষ্ট নধর দেহ।

গেট-কীপারের অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করা গেল। লোটা নয়, হাঁড়ি নয়, দুগ্ধ-বহনের এমন পাত্রও আছে, যেখানে তার তল্লাসি সত্যিই অচল।

সরকারী চাকরির সুখ সুবিধা বহুবিধ। তার ফিরিস্তি দিতে গিয়ে নিজ ক্যাম্পের বিরাগভাজন এবং অপর ক্যাম্পের ঈর্ষাভাজন হতে চাইনে। তার মধ্য থেকে একটি জিনিস শুধু উল্লেখ করবো, যেটা আমার কাছে সব চেয়ে লোভনীয়, তার নাম ছুটি। ছুটি—তারই বা রকম কত! তার ব্যাখ্যা বিন্যাস বিবরণ এবং টিকা-টিপ্পনীর অসংখ্য জটিল ধারা জুড়ে আছে Fundamental Rules-এর একটি মস্ত বড় দুর্বোধ্য অধ্যায়। প্রথমে ধরুন ক্যাজুয়েল লিভ্। বছর পড়তেই পনের দিন। একসঙ্গে নিন, কিংবা একটু একটু করে ভোগ করুন; কিন্তু যা কিছু করবেন, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে। তারপরেই সব পচে গেল। প্রিভিলেজ্ লিভ্ বা যাকে বলে হক্ ছুটি, পচন-শীল পদার্থ নয়। বছর ঘুরে এলেই এক মাস দুদিন জমা হল আপনার অ্যাকাউন্টে, বাড়তে থাকল ভাগ্যবান ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের মত। তারপর সুযোগমত নিয়ে নিন পুরো চার মাস। সবটাই পাবেন পুরো তলবে।

পরিশ্রম নেই, কিন্তু পারিশ্রমিক অক্ষুন্ন রইল। স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে আসতে পারেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর কিংবা ডেরা ইসমাইল খাঁ। সাগর ডিঙ্গিয়ে "হোম্"এ যেতে চান? তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ঐ চার মাসটা এক লাফে আট মাস হয়ে যাবে। স্বর্গ-সুখ আর কাকে বলে?

তিন নম্বর—মেডিকেল লিভ্, অসুখের দরুন ছুটি। ঘাবড়াবেন না। অসুখের দরকার করে না, দরকার শুধু একখানা ডাক্তারী সার্টিফিকেট। সেটুকু সংগ্রহ করতে যে অক্ষম, সরকারী চাকরির সে যোগ্য নয়।

তালিকা আর বাড়াতে চাই না। সব চেয়ে যেটা সেরা ছুটি তার উল্লেখ নেই কোনো আইনের গ্রন্থে। তার নাম French leave. যখন খুশী, যতবার খুশী, একটু ঘুরে আসি স্যার, বলে বেরিয়ে পড়ুন। এ ছুটির কোনো হিসাব নেই, আছে একটিমাত্র শর্ত—বস্‌কে প্রসন্ন রাখতে হবে।

সে দুর্লভ সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে পারিনি। আমার একমাত্র পথ—দরখাস্ত এবং তার ফলাফলের জন্যে অধীর প্রতীক্ষা। বহুকষ্টে বহু বিড়ম্বনার পর শেষ মুহূর্তে পনের দিন ক্যাজুয়েল ছুটি লাভ করা গেল। আর একটি দিন দেরি হলেই তার পচন-ক্রিয়া শুরু হয়ে যেত।

কাশ্মীর নয় চিদাম্বরম্ নয়, সেই পুরাতন কলকাতার বহু পুরাতন বন্ধু-সমাজেই কাটিয়ে এলাম দুটো সপ্তাহ। ফিরে দেখি আমার দরজায় যে তালাটি ঝুলছে তার একমাত্র যোগ্য স্থান হতে পারতো কোনো রাজবাটীর সিংহদ্বার। এই অতি-সতর্কতার কারণ ছিল। শুনলাম, ঠিক আগের রাতেই আমার একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীমান ব্যমবাহাদুর ওরফে কেটা হঠাৎ অন্তর্ধান করেছেন এবং তাঁর সহযাত্রী হয়েছে আমার একমাত্র সম্পত্তি—একটি শূন্যগর্ভ স্টীল ট্রাঙ্ক আর কয়েকটা ঘটি বাটি। যে-সিপাইটির উপর আমার কুঠী-তদারকের ভার ছিল, সে তার স্বদেশী ভাষায় বিস্তর আপসোস জানাল। আপসোস আমারও হল। কিন্তু সেটা আমার অপহৃত সম্পত্তির জন্যে নয়, অপহরণের পরিশ্রম যে ভোগ করল, তার জন্যে।

সিপাইটি জানতে চাইল, দোকান থেকে চা আনতে হবে কি না। বললাম, না, থাক।

দোস্‌রা নকর একটা সন্ধান করবার প্রস্তাব জানাল। তাও আপাতত না-মঞ্জুর করে দিলাম।

Smiles সাহেবের Self Help নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আমার পড়া ছিল;

এবং বাংলায় স্বাবলম্বন সম্বন্ধে অনেক রচনাও একদিন মুখস্থ করেছি। এতকাল পরে সে-সব বহুমূল্য উপদেশ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার সুযোগ উপস্থিত। দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না। নগদ পাঁচ টাকা ব্যয় করে একখানা সচিত্র রন্ধন-শিক্ষা এখানে আসবার আগেই সংগ্রহ করেছিলাম।

অবিলম্বে চা'এর প্রয়োজন, এবং তার প্রথম পর্ব স্টোভ ধরানো। আধ বোতল স্পিরিট সহযোগে, আধ ঘণ্টা পাম্প চালিয়ে সেটা কোনো রকমে সমাধা হল। অতঃপর কি করণীয় সে-সম্বন্ধে সদ্য জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে চা প্রস্তুত প্রণালীর অধ্যায়টা সবে খুলে বসেছি, এমন সময় দরজায় কাঞ্চীর আবির্ভাব।

একটি অতুলনীয় কৌতুক হাসির অভিনন্দন মনে মনে আশা করছিলাম। হঠাৎ শিউরে উঠলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে। এ কী হয়েছে কাঞ্চীর? দুদিন আগেও যে মুখ ছিল কলহাস্যমুখর, আনন্দোচ্ছল, সহসা কার নির্মম অভিশাপে সে যেন নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে গেছে। সর্বাঙ্গে গভীর বিষাদের মৌন ছায়া। এ কটা দিনেই যেন তার বয়স বেড়ে গেছে কয়েক বছর। এগিয়ে গিয়ে বললাম, কি হয়েছে, কাঞ্চী?

সে আমার ব্যাকুল প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। হাতে ছিল খাবারের থালা। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে সেটা আমার সামনে টুলের উপর রেখে মৃদু-স্বরে বলল, বড়ী আম্মা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর স্টোভটা নিবিয়ে দিয়ে, যেতে যেতে বলল, চা নিয়ে আসছি।

যত দূর দৃষ্টি যায়, আমার বিস্মিত চোখ তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু সে একবারও ফিরে চাইল না।

চা নিয়ে এল ডাক্তারের বছর দশেকের মেয়ে রুমী। টী পট্‌টা টুলের উপর রেখে বলল, চা কিন্তু আজ আমি করেছি, বাবুজী। দেখ দুধ চিনি আর—

—কাঞ্চী এল না, রুমী?

—তাকে যে বড়ী আম্মা নাইতে পাঠিয়ে দিলেন।

—নাইতে? এত সকাল সকাল?

—ও—ও। তুমি জানো না বুঝি? বড় বড় চোখ করে বলল রুমী, কাঞ্চীর যে আজ বিয়ে।

—কাঞ্চীর বিয়ে!—যন্ত্রচালিত পুতুলের মত আবৃত্তি করলাম আমি।

রুমী হাত মুখ নেড়ে বলে চলল, কাঞ্চীকে আজ কি কি করতে হবে,

বিয়েতে কারা কারা এসেছে, আর কারা আসেনি, কখানা গয়না হল তার, কে কোন্ জিনিসটা দিলে, এমনি আরো কত কি। তার কতক আমার কানে গেল, কতক গেল না। জানালার বাইরে সদ্য-মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতের দিকে তাকালাম। দেখলাম তার মরণাহত পাণ্ডুর রূপ। অনাগত জীবনের দীর্ঘ-পথের দিকে তাকালাম। দেখলাম সবটাই রুক্ষ ও ঊষর, কোথাও নেই একবিন্দু শ্যামলিমা।

সম্বিৎ ফিরে এল রুমীর ধমকে—তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না বাবুজী, আমি আর কতক্ষণ বসে থাকবো?

বললাম, তুই এখন যা, রুমী। এসব থালা টালা পরে এসে নিয়ে যাস্।

—বাঃ, তুমি না খেলে আমি যাই কি করে?

—কেন?

—কাঞ্চী বকবে যে?

—না, না। বকবে না। তুই যা।

—হ্যাঁ, তুমি তো খুব জানো? এখ্খুনি বললে—বকবে।

—কি বললে?

—বললে, রুমী, খাবার আমি রেখে এসেছি। তুই এক পেয়ালা চা করে বাবুজিকে দিয়ে আয়। তিন চামচে চিনি দিস্ কিন্তু, বাবুজি চিনি বেশী খায়। আর, দিয়েই যেন চলে আসিসনে। সামনে বসে খাওয়াবি। কিছু যেন ফেলে না রাখে। তাহলে কিন্তু ভীষণ বকবো তোকে।

এই কাঞ্চীই আজ চলে যাচ্ছে চিরদিনের তরে। একটি মাত্র রাত্রির ব্যবধান। তারপরে আর তাকে দেখতে পাবো না।

এই তো সেদিনের কথা। একটা মাসও হয়নি। এইখানে বসে একথা ওকথার পরও হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবুজি, বউ আসবে কবে?

হেসে বলেছিলাম, বৌ বলে যে একজনকে আসতেই হবে, এ রকম চুক্তি তো কারো সঙ্গে করিনি।

—ওমা! তুমি চিরকাল এমনি একলাটি থাকবে! তোমাকে দেখবে কে?

—কেন? যার গরজ, সেই দেখবে।

কাঞ্চীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর হঠাৎ ঘনিয়ে এল বেদনার ছায়া। কণ্ঠে বেজে উঠল অপূর্ব করুণ সুর। ঐ জানালার বাইরে চেয়ে ধীরে ধীরে বলেছিল, সে কপাল তো সে করে আসেনি। আজ হোক, কাল হোক, যেতে তাকে একদিন হবেই।

সেই দিনটা যে এত কাছে ঘনিয়ে এসেছিল, সেও জানতো না, আমিও বুঝতে পারিনি।

রুমীর দ্বিতীয় ধমক খেয়ে খাবারের থালায় হাত দিতে হল। এই কটি তুচ্ছ খাদ্যবস্তু! একে উপলক্ষ করেও কী না পেয়েছি এই পাহাড়ী মেয়েটির হাত থেকে! শুধু আজ নয়, আমার এই কেটো-যন্ত্রটি তো বিকল হয়েই আছে। কতদিন দেখেছি, সে খবরটা যখন আমার কানে এল, তার আগেই ওবাড়ি থেকে এসে গেছে খাবারের থালা। খাবারটা বরাবরই আসে বড়ী আম্মার নামে। কিন্তু আমি তার মধ্যে আর একখানা শুভ্র কল্যাণহস্তের স্পর্শ পাই। আজই তার শেষ। সে স্পর্শ এ জীবনে আর কোনদিন পাবো না।

ঘণ্টাখানেক পরেই বড়ী আম্মা এলেন নিমন্ত্রণ করতে। বললেন, মেয়েটার মা নেই, বাপ নেই, এক আমি ছাড়া আপনার বলতে কেউ নেই। সম্বন্ধটা হঠাৎ জুটে গেল। ছেলেটি মোটামুটি ভাল। অথচ দিতে থুতে হবে না কিছুই। তাই আর সাত পাঁচ না ভেবে দিলাম বিদায় করে। তোমাকে ও বড্ড ভালবাসে। তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আশীর্বাদ করলে কাঞ্ছী আমার সুখী হ'বে। একটু কষ্ট করে আসতে হবে বাবুজি। আসবে তো? আমি সাগ্রহে বললাম, যাব বৈকি; বড়ী আম্মা? নিশ্চয়ই যাবো।

কথা দিলাম। কিন্তু বড়ী আম্মা চলে যেতে না যেতেই কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল মনের ভিতরটা। কর্তব্যবোধ আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। সব ব্যর্থ হল। কেবলি মনে হতে লাগল বাঁচার আমার উপায় নেই। পালাতে হবে। যেখানে হোক, পালাতে হবে। ছুটি ফুরাতে তখনো একদিন বাকী। হঠাৎ মনে পড়ল, এক বাল্য বন্ধু থাকেন কার্সিয়াং, পি ডবলিউ ডি'র কর্ণধার। তার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

ডাক্তার থাপার নামে একটা চিঠি লিখে গেলাম, বড়ী আম্মাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বলবেন, অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে হঠাৎ আমাকে কার্সিয়াং যেতে হচ্ছে। কাঞ্ছীর বিয়ে দেখা হল না। ভারী দুঃখ রইল। ওকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি—ইত্যাদি।

পরদিন ফিরবার পালা। ওখানে ভালো লাগল না। সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে দেখলাম গাড়ির তখনো অনেক দেরি। খানিকক্ষণ প্লাটফরমে পায়চারি করা গেল। সময় কাটতে চায় না। মানুষের ভিড় অসহ্য। ওয়েটিং রুমটায় উঁকি মেরে দেখলাম, একেবারে ফাঁকা। এক

কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। যখন তখন চায়ে আমার রুচি নেই। সেদিন কি হল জানি না। পর পর দু কাপ কখন গলায় চলে গেল, জানতেই পারলুম না। তৃতীয় কাপের জন্যে বয়টাকে ডাকব কিনা ভাবছি, হঠাৎ নজর পড়ল বাইরের দিকে। চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে, আনন্দে, না বেদনায়, বুঝতে পারিনি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাঞ্চী। আনত ম্লান মুখ। পরনে নববধূর বেশ। পেছনে দাঁড়িয়ে তার বর। সোজা হয়ে বসে ওদের অভ্যর্থনা করলাম। সহাস্যে, সহজভাবেই বললাম এসো। ছেলেটি একটু মিলিটারী কায়দায় এক সেলাম করল, তারপর সবিনয়ে অনুমতি নিয়ে বাইরে চলে গেল। কাঞ্চী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার কাছটিতে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। আমি তার ডান হাতখানি আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, তোমার বিয়েতে থাকতে পারলুম না। সেজন্য দুঃখ কোরো না, কাঞ্চী। তুমি তো সবই জানো। পার তো, আমাকে ক্ষমা কোরো।

কাঞ্চী তড়িতাহতের মত দুহাতে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলল, সেকি কথা, বাবুজী? তুমি ক্ষমা চাইছ আমার কাছে। আমারই যে তোমার কাছে অপরাধের অন্ত নেই!

তার অপরাধ কোথায় জানি না। তবু প্রতিবাদ করলাম না। আরো কিছুক্ষণ পরে সে সহজ মৃদুকণ্ঠে বলল, আজই ফিরছ?

বললাম, হ্যাঁ।

একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, ছুটি তো তোমার পাওনা আছে। আরো কিছুদিন বরং বাড়ি থেকে ঘুরে এসো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

—কেন? হতাশভাবে জবাব দিল কাঞ্চী, সে কথাও কি বলে দিতে হবে? কে আছে তোমার ওখানে? কে দেখবে? তেষ্টা পেলে এক গ্লাস জল চেয়ে খেতে যে জানে না, তার দুর্দশার কি শেষ আছে? কতদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে, সে তো আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। না, ছুটি তোমাকে নিতেই হবে। তা না হলে ভীষণ রাগ করবো আমি।

হেসে বললাম, বেশ, না হয় নিলাম। কিন্তু ছুটির তো শেষ আছে। তারপর?

—তারপর যখন ফিরবে, বিয়ে থা' সেরে একেবারে বৌ নিয়ে এসো।

তার উদ্বেগ-আকুল চোখ দুটির দিকে চেয়ে বললাম, তাহলেই তুমি সুখী হবে, কাঞ্চী?

—হবো না? তুমি ভাল আছ, সুখে আছ; তোমার কোনো কষ্ট নেই—দূর থেকে এইটুকু যদি শুনতে পাই, সেই তো আমার পরম সুখ।

আরো বোধ হয় কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু গলাটা ধরে এলো। রক্তাভ গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু।

যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। ওড়নার প্রান্তে অশ্রুরেখা মুছে ফেলে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। মাটিতে হাঁটু রেখে উপুড় হয়ে আমার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বাধা দিলাম না। নত হয়ে ডান হাতখানা তার পিঠের উপর রেখে মনে মনে বোধ হয় আশীর্বাদই করলাম। সমস্ত দেহটা তার থরথর করে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই বাঁধভাঙা বন্যার মত উপচে পড়ল কান্না। সে অশ্রুধারার উত্তপ্ত গোপন স্পর্শ অক্ষয় হয়ে রইল শুধু আমারি কাছে। এ পৃথিবীতে আমার এই তুচ্ছ পা দুটোই রইল তার একমাত্র নীরব সাক্ষী।

কাঞ্চীকে এতদিন শুধু হাসতেই দেখেছি। উচ্ছ্বসিত রজতধারার মত হাসি; সংসারে যার তুলনা নেই। আজ বিদায়ের দিনে দেখলাম তার কান্না। হৃদয়-নিংড়ানো দুর্বার কান্না। তারও কোনো তুলনা নেই।

[আট]

১৭৫৭ থেকে ১৯৩০। পুরো দুটো শতাব্দীও নয়। ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহে একটি ছোট্ট বিলীয়মান বুদ্বুদ। কিন্তু কী প্রচণ্ড ঝড় আর আলোড়ন! কী সুদূরপ্রসারী গভীর আবর্ত সে রচনা করে গেল এই সুপ্রাচীন জাতির বহুমুখী জীবনধারায়!

এই হতভাগ্য দেশের বুকের উপর বিদেশী বিজেতার পদাঘাত তো এই নতুন নয়। ঠিক এরই আগে সাতশ বছর ধরে আস্ফালন করে গেছে পাঠান, মোগল, তুর্কী—কত সুলতান মামুদ, চেঙ্গিশ খাঁ, আলাউদ্দীন খিলিজি, ঔরংজেবের দল। রক্তস্রোতে ভেসে গেছে নদী, গিরি, জনপদ। কলুষিত হয়েছে দেবমন্দির; লাঞ্ছিত হয়েছে নারী। কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মা ধরা দেয়নি। সেই সাতশ বছরের ইতিহাস যেন একটা কালরাত্রির দুঃস্বপ্ন; যেন জলস্রোতের উপর চলন্ত মেঘের ছায়া!

কিন্তু ইংরেজ শুধু দিগ্বিজয়ী নয়। রাজ্য জয় আর ধন লুণ্ঠন করেই সে ক্ষান্ত হল না। সে কেড়ে নিতে চাইল মনুষ্যত্ব। তার বিষবৃক্ষের বিষাক্ত শিকড় ধীরে ধীরে প্রবেশ করল এই উর্বর দেশের অস্থি-মজ্জায়। বিষক্রিয়ায় মুহ্যমান্ হয়ে গেল একটা সুবিশাল জাতির সমস্ত চেতনা। মোহগ্রস্ত মূঢ়ের মত সে তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা, তার কর্মৈষণা, তার প্রতিভা নিয়োজিত করল বিদেশী সাম্রাজ্যের পরিচর্যায়।

এমনি করে কাটল বছরের পর বছর। তারপর একদিন শতাব্দীর মোহ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠল একদল মুষ্টিমেয় লোক। সভয়ে দেখল তারা, বিরাটকায় শ্বেতাঙ্গ অক্টোপাস লোহার বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছে সমস্ত জাতির কণ্ঠ। প্রাণ যায়-যায়। মুক্তি-কামনায় প্রথমে শুরু হল আবেদন-নিবেদন। তারপর তর্জন-গর্জন। কিন্তু বন্ধন শিথিল হল না। যন্ত্রণার তাড়নায় এখানে-সেখানে দুচারটা অর্বাচীনের দল ছটফট করে উঠল। দেখা দিল ১৮৫৭; তারপর ১৯০৫। কিন্তু সাম্রাজ্যের স্টীমরোলার গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল যেখানে যত ছিল উদ্ধত শির।

কিছুদিন গেল। ১৯২১ সালের বসন্ত কাল। সহসা একদিন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এল এক অর্ধনগ্ন ফকির'—ক্ষীণ দেহ, পরনে কটিবাস, মুখে রহস্যময় হাসি। ব্রিটিশ-সিংহকে আহ্বান করে বলল, হে পশুরাজ, আমরা নিরস্ত্র। কিন্তু তোমার দংষ্ট্রাঘাতকে ভয় করি না। তোমার ঐ বিজয়রথের চাকায় এতদিন আমরাই তেল জুগিয়ে এসেছি। আজ থেকে আর জোগাবো না। আমার দেশের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরাই তো তাকে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছি। সে দড়িও ছেড়ে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই; তোমার সঙ্গে আমার অসহযোগ।

বৈরাগীর ক্ষীণ কণ্ঠে এত শক্তি ছিল, কে জানত? আসমুদ্রহিমাচল কেঁপে উঠল। দেড়শ বছরের শাসন-প্রতিভা দিয়ে গড়ে তোলা যে কীর্তিস্তম্ভ, তার মূলে দেখা দিল ফাটলের রেখা। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের তরে। ঝড় থেমে গেল, পড়ে রইল শুধু তার অবসাদ। রাজশক্তির জয়রথ চলল আবার ঘর্ঘর শব্দে চারদিক মুখরিত করে। যারা দড়ি ছেড়েছিল, আবার এসে ধরল। দু-চার জন শুধু ছিটকে পড়ে রইল এখানে, ওখানে, তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

দশটি বছর না যেতেই আবার কোথা থেকে ফিরে এলো সেই শীর্ণকায় ফকির। দেহ ক্ষীণতর, কিন্তু ললাটে বজ্রের দৃঢ়তা। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল, হে যন্ত্ররাজ, বিভূতি, আমাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ ধারা রুদ্ধ করে গড়ে তুলেছ যে পর্বতপ্রমাণ যন্ত্র, তার বাধানিষেধের জঞ্জাল আমরা মানবো না। সেই কণ্ঠ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হল—আমরা মানবো না। বেরিয়ে এল হাজার হাজার নিপীড়িতের দল, জীবনের নানা ক্ষেত্র, সমাজের নানা স্তর থেকে। সবারই কণ্ঠে এক সুর—আমরা মানবো না।

ব্রিটিশ-সিংহের দম্ভদীপ্ত ললাটে জেগে উঠল চিন্তা-রেখা। এ কী করে সম্ভব হল? যারা ছিল চিরকালের most obedient servant তাদের মুখে Disobedience-এর ধ্বনি! কিন্তু ভাবনার সময় নেই। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল সাম্রাজ্য-শক্তি। আমরা ইংরেজ। আমাদের রাজ্যে সূর্যাস্ত নেই। চালাও রিপ্রেশন। যন্ত্ররাজ বিভূতি চালিয়ে দিল তার পেষণ-যন্ত্র। যারা পিষে মরল, তারা তো গেলই। যারা বেঁচে রইল, বাঁধা পড়ল দেশব্যাপী লোহার খাঁচায়।

তারই একটা ক্ষুদ্র খাঁচা আগলে বসে আছি আমরা ক'টি যন্ত্ররাজ্যের অনুচর, এই দুর্ভেদ্য পাহাড়-ঘেরা হিমালয়ের জঙ্গলে। কিন্তু পাথরের বর্ম

ভেদ করে বহির্জগতের তুমুল কোলাহল এখনো এখানে এসে পৌঁছায়নি। ইংরেজের স্নেহপুষ্ট, কৃপাভাজন এই পাহাড়ী জাত। চা, সিগারেট আর মদ— এই তিনদফা মহানেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। দু-একটা যদিবা মাথা তুলেছিল চাকরি বা খেতাবের মর্ফিয়া খেয়ে আবার অচেতন হয়ে গেছে।

সুতরাং বেশ আছি আমরা। আমাদের এই খাঁচায় তাদেরই বাসা, যারা খায় দায়, শেখানো কায়দায় হাত-পা নাড়ে এবং নিরুপদ্রবে নিদ্রা যায়। অনাবশ্যক ডানার ঝাপটায় মনিবের শান্তিভঙ্গ করে না। ভগবানকে ডাকছি, হে ঠাকুর, আমাদের এই মহাশান্তি অটুট থাক। চোর, ডাকাত আর গাঁটকাটা নিয়ে মহাসুখে কেটে যাক দিনগুলো। কিন্তু আমার এই প্রার্থনায় মোবারক আলির যোগ নেই। হাতটা তার নিসপিস করছে। দু-চারটে বেয়াড়া স্বদেশী শায়েস্তা করবার সুযোগ যদি না জুটল, তবে বৃথাই তার এ জেলর-জন্ম।

শেষ পর্যন্ত মোবারক আলির মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হল। কলকাতার কোন জেল থেকে হঠাৎ একদিন পাঠিয়ে দিল গুটিকয়েক নামজাদা "স্বদেশী" আর "স্বদেশিনী"। সেখানকার বাতাস নাকি এমন গরম করে তুলেছিলেন এঁরা, যে এই হিমশীতল নির্বাসনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কর্তৃপক্ষের গত্যন্তর ছিল না।

স্বদেশিনী যাঁরা এলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রীমতী তপতী দাস। আমদানী কেতাবে তাঁর নামধাম যেখানে লেখা হয়, জেলর সাহেব 'দাস' কেটে 'দাসী' বসিয়ে দিলেন। জেলে যারা নবাগত, হাসপাতালের রুগীদের মত তারাও একখানা করে টিকেট পায়, যার উপরের দিকটায় থাকে নাম, আর অন্যান্য বিবরণ এবং সেগুলো সংগ্রহ করা হয় আমদানী কেতাব থেকে। শ্রীমতী দাসের হাতে যথাসময়ে এই 'দাসী' মার্কা টিকেট গিয়ে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে জেনানা ফাটকে আগ্নেয়গিরির আবির্ভাব। পরদিন স-পরিষদ সুপারের দর্শন মাত্রেই শুরু হল উদ্গীরণ। যে বস্তু উৎক্ষিপ্ত হল, তার মধ্যে যত না আগুন, তার অনেক বেশী কর্দম। আমরা নিঃশব্দে মাথা পেতে নিলাম। এক ফাঁকে মিস্টার রায় মোবারক আলির দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি?

জেলর সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, ব্যাপার কিছুই নয়, স্যার। একখানা ওয়ারেন্টে কিছু গ্রামারের ভুল ছিল। করেক্ট করে দিয়েছি।

—গ্রামারের ভুল কি রকম?

জেলার সাহেব আমার দিকে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন বি-এ, এম-এ পাশ না করলেও ছেলেবেলায় বাঙলা ব্যাকরণটা তো ভাল করেই পড়েছিলাম। যতদূর জানি, 'দাস' শব্দটা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গে হয় 'দাসী'। "স্বদেশী" করতে গেলে লিঙ্গ-প্রকরণ বাতিল হয়ে যায়, একথা তো জানা ছিল না।

সুপার সাহেব অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। বন্দিনীদের মধ্যে দু-একজন যাঁরা একটু বয়স্কা, নিঃশব্দে ঘরে চলে গেলেন। মিস্ দাস দিলেন হাঙ্গার-স্ট্রাইকের নোটিস।

শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষেরই পরাজয় হল। অত বড় একজন অভিজ্ঞ জেলরের ব্যাকরণ-নিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা হল না। শ্রীমতী আবার 'দাসী' থেকে 'দাস'-এ রূপান্তর লাভ করলেন।

রেলযাত্রীর মত জেলযাত্রীদেরও তিনটি শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। কিন্তু রেলের কামরা যেমন যাত্রী নিজেই বেছে নেয়, জেলের কামরা স্থির করে দেন দণ্ডদাতা বিচারক। "স্বদেশী" মহিলাদের ছিল প্রথম শ্রেণীর টিকেট। কারণ—কতকটা সামাজিক, কতকটা রাজনৈতিক এবং বেশীর ভাগ বোধ হয় রোমান্টিক। কেন না, টিকেটদাতা হাকিম পুরুষজাতীয়। এদের শ্রেণীটাই শুধু প্রথম নয়, দণ্ডটাও ছিল আশ্রম। অতএব ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্তুর অকৃপণ সমাবেশ। কিন্তু উপকরণটাই তো ভোগের একমাত্র উপাদান নয়। তাকে উপভোগ্য করে তুলতে হলে চাই মানুষের হাত। সে মানুষের অভাব নেই জেলখানায়। মুষ্টিমেয় প্রথম শ্রেণীর জন্যে গতর খাটাবে অপরিমেয় তৃতীয় শ্রেণী—এই ধারাই তো চলে আসছে সমাজে, রাষ্ট্রে, সেই অ্যারিস্টটলের "সিটি স্টেট" থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক "পিউপিল্‌স ডেমোক্রাসি" পর্যন্ত। জেলতন্ত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তাই প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর পরিচর্যা করে ধন্য হয় তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। 'সারভেন্ট' বললে পাছে এরা বা এদের শুভানুধ্যায়ীরা কুপিত হন, তাই কেতাবে এদের নাম অ্যাটেন্‌ড্যান্‌ট। জেল পরিভাষায় বলে "ফালতু"।

একটি অল্পবয়সী পাহাড়ী মেয়ে "স্বদেশিনীদের" ফালতুর কাজ করত। হঠাৎ একদিন শ্রীমতী ব্যানার্জি এবং শ্রীমতী লাহা জিদ ধরলেন ও মেয়ে চলবে না।

বললাম, কেন?

—কারণ দেখানোটা আমরা প্রয়োজন মনে করি না।

আমি সবিনয়ে বললাম, সে তো অবশ্যই। আপনারা বলছেন, সেই যথেষ্ট। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, ও কি কাজকর্ম ঠিকমত করছে না?

মিস্ লাহা একটা দম্ভভঙ্গী করে বললেন, আমরা যা বলেছি, তার বেশী আর কিছু বলতে চাইনে।

এর পরে আর কথা নেই। পরিচারিকার পরিবর্তন হল।

পরদিন বিকালবেলা স্বদেশী ওয়ার্ডের চিঠিগুলো ডাকস্থ হবার আগে পড়ে দেখছিলুম, জেলের ভাষায় যাকে বলে সেন্সর। তখন চাকরি কাঁচা, মনটাও পাকেনি। এই পরের চিঠি-পড়া ব্যাপারটাকে কেমন যেন অশোভন এবং অশিষ্ট বলে মনে হত। "স্বদেশী" মহিলাদের যেদিন থেকে আবির্ভাব হ'ল এবং তাদের বাঁকা ছাঁদের দীর্ঘ পত্র হাতে আসতে লাগল, তখন বুঝলাম, সঙ্কোচটা আমার তরফে যতই হোক, ও তরফে তার একান্ত অভাব। সুতরাং আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠতে বেশীদিন লাগেনি।

মিসেস চ্যাটার্জির লেখা মোটা চিঠিখানা খুললাম। তাঁর কোনো বান্ধবীকে লেখা ঠাসবুনানী পাঁচ পাতা। কৌতূহল হল প্রথমেই ঐ পাহাড়ী মেয়েটার উল্লেখ দেখে। মুখবন্ধের পর মিসেস চ্যাটার্জি লিখছেন, কাল আমরা একটা মস্ত বড় কাজ করে ফেলেছি। একটি নেপালী মেয়ে-কয়েদি আমাদের কাজ-টাজগুলো করে দিত। মেয়েটি ভারী লক্ষ্মী, শান্ত এবং বিশ্বাসী। কাজে কর্মেও চটপটে। হঠাৎ আমাদের কানে এল, ও জেল খাটছে কোনো সুস্পষ্ট কারণে স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল বলে। এ-হেন স্ত্রীলোকের ঘৃণ্য সান্নিধ্য আমাদের মত সুসভ্য এবং সুনীতিপরায়ণা মহিলাদের অবশ্য বর্জনীয়। অতএব, আমরা জিদ ধরলাম, ওকে তাড়াতে হবে। কর্তৃপক্ষ রাজী না হলেও বাধ্য হলেন। তাকে যখন চলে যেতে বলা হল তার নিজের ওয়ার্ডে, মেয়েটার চোখদুটো ছলছল করছিল। কিন্তু সে-সব তুচ্ছ সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের মর্যাদা থাকে না। এবার যে এসেছে, সে করেছিল কাপড় চুরি। অতএব আমরা নিরাপদ।

সমস্ত রাত ধরে আমি ঐ মেয়েটার কথা ভেবেছি। স্বামীকে ও বিষ খাইয়ে মেরেছে। আর, আমি কি করেছি? আমার অন্তর, আমার কণ্ঠ, আমার প্রতিদিনের আচরণ থেকে যে বিষ ঝরে পড়েছে, সে কি আমার স্বামী

এবং তার পরিজনদের জর্জর করে তোলেনি? একদিনে মেরে ফেলাটাই মারা, আর তিলে তিলে পলে পলে মারাটা কি মারা নয়? ঐ মেয়েটা কি আমার চেয়েও অপরাধী?

আমি একা নই। আমার মত আধুনিকার দল, যারা আজ ঘর ছেড়েছে, কিংবা ঘরে থেকেও ঘরের বাঁধন স্বীকার করছে না, সবারই ঐ সব ইতিহাস। আমরা সব বিষ-কন্যার দল। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মর্যাদা আর নারী-প্রগতির ফণা তুলে আমরা আমাদের ঘর সংসার, স্বামী পুত্র কন্যা, শাশুড়ী ননদ, দেবর ভাসুর, সবারই দেহে নির্বিচারে বিষ ঢেলে বেড়াচ্ছি। তাই, সংসারও আমাদের কাছে বিষময়। ঘর আমাদের ধরে রাখতে পারলো না।

আমার মাকে মনে পড়ছে। বাবা ছিলেন সামান্য কেরানী; মানুষ হিসেবেও অতি সামান্য। আফিস থেকে যখন ফিরতেন, তার আগে থেকেই মা আমাদের সাবধান করে দিতেন, যেন গোলমাল চেঁচামেচি না করি। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে মা নিজে হাতে তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দিতেন। জামাটা চাদরটা হাত থেকে নিয়ে বাড়ির কাপড় এনে দিতেন। তারপর সযত্নে ঠাঁই করে নিকানো মেঝে আবার নিজে হাতে নিকিয়ে কত পরিপাটি করে দুখানা রুটি আর একটু তরকারি তাঁর সামনে ধরে দিয়ে পাখা নিয়ে বসতেন। আমাদের সেখানে আসবার হুকুম ছিল না। তবু যদি বাবা আমাদের জন্যে পাতে কিছু রেখে দিতে চাইতেন, মা ভয়ানক রাগ করতেন। বলতেন, ওর থেকে আবার ফেলে রাখছ? না, সে আমি কিছুতেই শুনবো না। এত খাটুনির পর এইটুকু না খেলে শরীর টেঁকে?

বড় হয়ে যখন নারী-প্রগতির আস্বাদ পেলাম, মার এই দাসীবৃত্তি দেখে মনে মনে লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু আমার চেয়ে কে বেশী জানে, মা দাসী ছিলেন না? মর্যাদা আর অধিকার নিয়ে বাবার সঙ্গে কোনোদিন লড়াই করেননি। তবু ছোট্ট সংসারের তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী।

অভাবের সংসার। তার উপর বাবা ছিলেন রুক্ষ মেজাজের লোক। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে অনেক রূঢ় কথা শুনতে হত মাকে। কিন্তু একটারও জবাব দেননি কোনোদিন। হেসে বলতেন, পুরুষ মানুষকে কতো সইতে হয়; আমরা একটা শক্ত কথাও সইতে পারবো না? কখনো বলতেন, রাগ হলে দুটো কথা আমাকে শোনাবেন, না, ঐ পাড়ার লোককে শোনাতে যাবেন?

সেই মায়ের মেয়ে আমি। আমার এবং আমার মত আর দুজন আধুনিকার স্বামী যখন কর্মক্লান্ত দেহে আফিস থেকে ফেরেন, আমরা থাকি ড্রয়িং রুমে, শয়নকক্ষে কিংবা বাইরে কোথাও। হঠাৎ সেলাই কিংবা বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সামনে এসে দাঁড়ালে পাছে খাটো হতে হয়, তাই আসি না। দেখাতে চাই, আমাদেরও আছে একটা স্বতন্ত্র জগৎ। তোমাদের চেয়ে আমরা কিছুমাত্র ছোট নই। কিন্তু পুরুষ চিরকালই পুরুষ। আধুনিকার স্বামী হলেও সে সেই সনাতন স্বামী। স্ত্রীর কাছে সে চায় সেবা, যত্ন, আর তার চেয়েও বেশী, আনুগত্য। যখন বঞ্চিত হয়, তার সমস্ত অন্তর বিষিয়ে ওঠে। সভ্যতার মোলায়েম আবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে তার ঝাঁজ। কিন্তু আমরা সই না কিছুই, মেনে নিই না কাউকে। রুখে দাঁড়াই মর্যাদার সঙ্গীন উদ্যত করে। তখন চলতে থাকে আঘাত আর প্রত্যাঘাত, বক্রোক্তি ব্যঙ্গোক্তি, আর কটূক্তির কবির লড়াই। সভ্য নরনারী যে ছুরি চালায়, তার অবস্থান হাতে নয়, জিহবাগ্রে। কিন্তু তীক্ষ্নতায় যে-কোনো কসাই-এর ছুরিকেও সে হার মানায়।

আর এক ধরনের দম্পতি আছে, আমাদের এই অতি-আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে, যারা ছুরি চালায় না। কিন্তু হানাহানি নেই বলেই যে তাদের প্রাণে 'প্রেম করে কানাকানি', সে ভুল করে বোসো না। সেখানে স্বামী ব্যক্তিটির একমাত্র আশ্রয়—অভিনয়। তার মুখে বিলিতি মুখোশ, রসনায় সস্তাদরের বিলিতি মধুর প্রলেপ। "দাঁতের আগে মিষ্টি হাসি টানি" ভদ্রতার বাণী দিয়ে তিনি ঢেকে রাখেন তার পুরুষ হৃদয়ের ক্রোধানল। যে স্ত্রীর কাছে তার দৈনিক বরাদ্দ অবহেলা, অনাদর আর ঔদাসীন্য, যার কঠিন মুখের দিকে চাইলে মাথায় খুন চেপে যায়, তাকে তিনি কাঁধে হাত দিয়ে আদর করেন, উপহার দেন নিত্যি নতুন জুয়েলারি। তার রূপের জৌলুস, কিংবা প্রসাধনের পালিস সম্বন্ধে দুটো গিল্টি-করা স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে ক্লাবে গিয়ে হাঁফ ছাড়েন। আমাদের ভ্যানিটি-বোধ হয়তো তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু অন্তর? অন্তর থেকে যায় উপবাসী।

তোমাদের চোখে আজ আমি মস্ত বড় দেশনেত্রী। আমার বক্তৃতায় আগুন ছোটে। করতালির দাপটে কেঁপে ওঠে দিঙ্‌মণ্ডল। কিন্তু, সভার শেষে ঘরে ফিরে আমার ভক্তের দল যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, সেটা কি জানো? সেটা হচ্ছে আমার রূপ, আমার দাঁড়াবার, চলবার, কিংবা বক্তৃতার ।। আমার পারিবারিক ইতিহাস যাদের জানা আছে, তারা যে ভাষা

প্রয়োগ করে, তোমাকে বলবো না। কেননা, তুমি আমার বাল্যবন্ধু হলেও গৃহস্থবধূ। এই আমার মর্যাদা!—যার লোভে ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে দেশের কাজে নেমেছিলাম।

আজ এই গভীর রাত্রে এই নগাধিরাজ হিমালয়ের পদপ্রান্তে বসে তোমার সেদিনকার কথাটাই অকপটে স্বীকার করছি। নারীর যদি কোনো গৌরব থাকে, সে তার প্রেম। সে অমৃতলোক থেকে বরণ করেছি স্বেচ্ছানির্বাসন। যে-তরুশাখায় নীড় বেঁধেছিলাম, নিজ-হাতে তারি মূলে করেছি নির্মম আঘাত।...

এমনিধারা আরো অনেকখানি আবেগ উচ্ছ্বাস পার হয়ে শেষটায় এসে পেঁছান গেল দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে। মিসেস চ্যাটার্জি বলছেনঃ—

স্বামীগতপ্রাণা বলে একদিন তোমাকে কত না অবজ্ঞার চোখে দেখেছি। আমার সে ধৃষ্টতা আজ তুমি ক্ষমা করো, মিনতি। তোমার একটি মাত্র মেয়ে। আশীর্বাদ করি, সে যেন তোমার মত হয়। তার এই দেশ-বন্দিতা মাসীমার মত তাকে যেন দেশের কাজের নেশায় না পায়। বড় হলে নিজেরা দেখে শুনে ভাল ঘর বর দেখে মেয়েকে পাত্রস্থ করো। নিজের ঘরে গিয়ে নিজেকে যেন সে নির্বিচারে বিলিয়ে দিতে পারে তারি হাতে, যার সঙ্গে তার জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল।

একজন অতি আধুনিকা অত্যুচ্চ রাজনৈতিক খ্যাতিসম্পন্না বিদুষী মহিলার মুখে এহেন সেকেলে তত্ত্ব তোমার কানে আজ অদ্ভুত শোনাবে জানি। তবু বলবো, নারী-জীবনে সুখ যদি কোথাও থাকে, এই তার একমাত্র রাজপথ। এ পথ থেকে যে সরে দাঁড়াল, আশ্রয় করল উদ্ধত শির আর উদ্যত তর্জনী, সে আর যাই পেয়ে থাক, পাবে না সুখ—পাবে না সম্মান।......

চিঠিটা শেষ করে মনে হল স্বপ্ন দেখছিলাম। এ কোন্ মিসেস্ চ্যাটার্জি? ইনিই কি সেই নীহারিকা চ্যাটার্জি, যাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার প্রচণ্ড ঝটিকায় ভেঙ্গে গেছে কত সাজানো সংসার? পুঁথির বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তরুণীর দল, ঘরকন্নার জোয়াল ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসেছে বহু-সন্তানবতী প্রৌঢ়া, খদ্দরের বোঝা কাঁধে নিয়ে ফেরি করেছে রাস্তায় রাস্তায়, পিকেটিং করেছে মদগাঁজার দোকানে, তারপর ভিড় করেছে জেলের দরজায়? আজ তার কণ্ঠে এ কী সুর? কে জানে কোন্‌টা তার আসল রূপ?

তারপর বাইশ বছর চলে গেছে। নারী-প্রগতির আলোক আজ পেঁছে

গেছে সাধারণ বাঙালীর ঘরে ঘরে নারীকণ্ঠের সোরগোলে আকাশ বাতাস মুখরিত। কিন্তু তারা যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে কি? পেয়েছে সুখ? পেয়েছে সম্মান? না, আজও তারা নীহারিকা চ্যাটার্জির মত বিনিদ্র রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে দুঃখের কাহিনী লিখে যাচ্ছে পাতার পর পাতা, কোনো পতিগত-প্রাণা সেকেলে বান্ধবীর উদ্দেশে?

[নয়]

দুর্জয়লিঙ্গের দেশে ঋতুরাজের ভূমিকা নিয়েছেন মহা শীত। সারা বছর তাঁরই অখণ্ড প্রতাপ। মাঝখানে কিছুকাল বিপুল সমারোহে আসর জমিয়ে রাখেন বর্ষা। ঋতুচক্রের বাকী শিল্পী যাঁরা, উইংসের পাশ থেকে একবার করে উঁকি দিয়ে চলে যান। এই সার্জ, ফ্লানেল এবং উলেন টুপির বর্ম ভেদ করে তাঁদের ক্ষণিক আবির্ভাব, শুধু বুঝতে পারি, যখন দেখি ম্যাল, বার্চহীল এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনের বেঞ্চিগুলো হঠাৎ ভরে উঠেছে রূপের জলুসে, বেশভূষার বৈভবে এবং হাসি-গল্পের ঝঙ্কারে। দোকানে দোকানে সদ্য সজ্জিত পণ্যসম্ভার; হোটেলে হোটেলে সুপ্তোত্থিত প্রাণ-চাঞ্চল্য! দার্জিলিং নাকি বাঙলা দেশের স্বাস্থ্যনিবাস। কিন্তু স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশি, তাদের দেখা নেই এর ত্রিসীমানার কোনখানে। এখানে ভিড় করে তারাই, স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার যাদের ভরে আছে কানায় কানায়।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মত দার্জিলিংও জেগে ওঠে বছরে দুবার। ঘরে-বাইরে উৎসবের সাড়া লাগে, পানভোজন, বিলাস-ব্যসন, পার্টি-জলসায় ধুম পড়ে যায়। তারপর কুম্ভকর্ণ আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই ক্ষণিক আনন্দের ঝলক দুদিনের তরে আমাদের মনেও রং ধরিয়ে দেয়। দুদিনের তরে আমরাও অনুভব করি জীবনের স্পর্শ, নিজেকে হারিয়ে ফেলি ইটালিয়ান চেস্টার এবং ফার-কোটের জঙ্গলে, উপভোগ করি অহেতুক হাসি, অমিত উচ্ছ্বাস এবং 'অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষা।'

বৈকালিক অফিস সংক্ষেপে সমাধা করে সেদিন তাই সকাল সকাল বাড়ি ফিরছিলাম। "সিজন্" শুরু হয়ে গেছে। দার্জিলিংয়ের পথে-ঘাটে নয়ন-

ভুলানো আকর্ষণ। বাড়ি গিয়ে কোনরকমে এক পেয়ালা চা। অতঃপর বেরিয়ে পড়া।

সুপারের বাড়ির ধার দিয়ে পথ। গেটের সামনে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস রায়। চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখ। চোখে উদাস দৃষ্টি। আমাকে দেখতে পেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, এই যে, চৌধুরী। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। ভাল আছ?

—আজ্ঞে, ভালই আছি। আপনাকে কিরকম শুকনো দেখাচ্ছে। অসুখ-টসুক করেনি তো?

—নাঃ। আমি তো ভালই আছি। এসো না? মিস্টার রায় রয়েছেন। তাছাড়া আমাদের ক'জন অতিথিও এসেছে ক'দিন হ'ল।

মিস্টার রায়ের সঙ্গলাভ, কিংবা তাঁর অতিথিবৃন্দের সাহচর্য, কোনোটার জন্যেই আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মিসেস যখন ডাকলেন, যেতেই হল। সোজা ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। মিস্টার রায় সরবে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আগন্তুকদের সঙ্গে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন নিখুঁত সাহেবী বেশধারী ভদ্রলোক, দুটি সযত্ন-সজ্জিতা মহিলা। মিস্টার রায়ের ভাই নিকোলাস রায়, ভ্রাতৃবধূ অচলা, ভগিনী মার্গারেট। এছাড়া ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল এক লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ—আমাদের রুটিওয়ালা গুঞ্জা হোসেন। তার সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। টেবিলের উপর কাগজে মোড়া একখানা পাউরুটি লক্ষ্য করলাম।

মিস্টার রায় আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি রুটি নাও কোত্থেকে চৌধুরী?

আমি উত্তর দেবার আগেই গুঞ্জা হোসেন বলল, আজ্ঞে, ও-সাহেবের রুটি আমার দোকান থেকেই যায়। ঐ আটখানা করেই নেন। জিজ্ঞেস করুন।

রায় বললেন, কিন্তু আমার বেলায় তোমার কিছু সুবিধে করে দেওয়া উচিত। ভেবে দ্যাখ, আমি এখানকার সিনিয়র হাকিম, তার মানে ডি সি না থাকলেই আমি ডি সি। তাছাড়া আমি জেলখানার বড়সাহেব, সিভিল কোর্টের সাব-জজ এবং ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার। বিপদে-আপদে, মামলা-মোকদ্দমায় আমাকে ছাড়া তোমার গতি নেই।

গুঞ্জা হোসেন হাত জোড় করে বলল, আচ্ছা, হুজুর অত করে যখন বলছেন, আপনি ঐ নখানা করেই নেবেন।

বলেই চলে যাচ্ছিল। মিস্টার রায় বললেন, দাঁড়াও। আর একটা কথা আছে। টাকায় নখানা হলে একখানা রুটির পড়বে?

রুটিওয়ালা প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বলল, আজ্ঞে, আপনি তো আর খুচরো দরে কিনছেন না?

—তবু?

গুঙ্গা হোসেন মনে মনে হিসাব করে বলল, তা সাত পয়সাই পড়বে।

রায় খুশি হয়ে বললেন, সাত পয়সা। বেশ। সেই হিসেবে নখানা রুটির দাম পড়ছে তেষট্টি পয়সা। তুমি নিচ্ছ এক টাকা, অর্থাৎ চৌষট্টি পয়সা। তার মানে, প্রতি টাকায় তুমি এক পয়সা করে বেশি নিচ্ছ। ঠিক কি না?

মার্গারেট মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, উঃ, মাথা ধরে গেল বাপু, তোমার হিসেবের জ্বালায়। সত্যি বলছি, হ্যারল্ড, ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে তুমি যদি মুদীর দোকান দিতে অনেক বেশি উন্নতি করতে পারতে।

রায় ভগিনীর কথায় কান দিলেন না। রুটিওয়ালাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন. তারই উপর আর একবার জোর দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছি কি না, বল? প্রতি টাকায় একটা করে পয়সা আমার পাওনা হচ্ছে।

রুটিওয়ালার মুখ দেখে মনে হল, সে চটেছে। গম্ভীর হয়ে বলল, বেশ। ঐ একটা করে পয়সা আপনাকে আমি ঘুরিয়ে দেবো।

রায় হেসে বললেন, না-না। ঘুরিয়ে দিতে হবে না। ওটা আমার হিসেবে জমতে থাকবে। সাত টাকার রুটি যেমনি কেনা হবে, একখানা রুটি আমি বেশি পাবো। এমনি করে প্রতি সাত টাকায় একটা করে ফালতু রুটি। ব্যস্। এবার বুঝলে তো?

গুঙ্গা হোসেন কি বুঝল, সেই জানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এবং এমনভাবে বেরিয়ে গেল, যেন মস্ত বড় একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সে চলে যেতেই মিস্টার রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ যাঃ। রুটিটা তো নিয়ে গেল না। চাপরাশির ডাক পড়ল এবং মিনিট কয়েক পরে সে রুটিওয়ালাকে আবার পাকড়াও করে নিয়ে এল।

রায় বললেন, তোমার রুটি যে ফেলে গেছ, মিঞা সাহেব।

—আজ্ঞে, ওটা হুজুরের স্যাম্পুল।

—বেশ; তাহলে ওর দামটাও ঐ হিসেবের মধ্যে রইল। মানে, ঐ সাত পয়সা হিসেবে।

গুঞ্জা হোসেন একগাল হেসে বলল, স্যাম্পলের তো দাম নেই হুজুর।

মিস্টার রায়ের মুখে খুশির আমেজ ফুটে উঠল। রুটিটার দিকে চেয়ে কি খানিকটা ভাবলেন। তারপর বললেন, এর থেকে একটা গল্প মনে পড়ছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনবে, না বেড়াতে যাবে ?

নিকোলাস বললেন, দুটোই করবো। আমরা ডুডুও খাবো, টামুকও খাবো। আপনার আপত্তি আছে মিস্টার চৌধুরী ?

বললাম, কিছুমাত্র না। ডুডু এবং টামুকের পরেও যদি কিছু থাকে, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

তোমার ইচ্ছাটা কি, অচলা ? ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মিস্টার রায়।

অচলা মৃদুকণ্ঠে বললেন, গল্প পেলে বেড়ানোটা বাদ দিতেও রাজি আছি আমি।

আমি বাপু তাতে রাজি নই, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মার্গারেট, যা বলবে, চটপট বলে ফেল। আবার একঝুড়ি অঙ্ক ঢোকাবে না তো গল্পের মধ্যে ?

রায় মৃদু হেসে বললেন, না, অঙ্ক নয়, তার বদলে এবার পাবে একঝুড়ি আম; আর তার সঙ্গে অনেকখানি Fun।

Fun-এর গন্ধ পেয়ে আমরা সবাই সাগ্রহে দৃষ্টি ফেললাম বক্তার মুখের উপর। অচলা চেয়ারটা টেনে আর একটু এগিয়ে বসলেন। মিস্টার রায় শুরু করলেন—

তখন সবে নতুন চাকরি। সেটেলমেন্ট ট্রেনিংয়ে যেতে হল দ্বারভাঙ্গায়। মাঠের মধ্যে ক্যাম্প। কতগুলোতে অফিস, কতগুলোতে থাকবার ব্যবস্থা। একদিন বিকেল বেলা নিজের ক্যাম্পে বিশ্রাম করছি। মহারাজার এক ম্যানেজার এলেন দেখা করতে। পেছনে লোকের মাথায় একটা ঝুড়ি। বললাম, ওটা কি ব্যাপার ?

ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বিশেষ কিছুই নয়। মহারাজাধিরাজ পাঠিয়ে দিলেন। ও'র বাগানের গোটা কয়েক ল্যাংড়া।

গম্ভীরভাবে বললাম, বাইরে নিয়ে যেতে বলুন। ওসব অভ্যাস আমার নেই।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন, কিসের অভ্যাস—

—এই ঘুষ নেবার কথা বলছি।

ভদ্রলোক মনে মনে চটলেন, বোঝা গেল। বললেন, আজ্ঞে ঘুষ দেবার অভ্যাস আমাদেরও নেই। আপনি ভুল করছেন। এটা ঘুষ নয়। এটা হচ্ছে রাজবংশের প্রাচীন প্রথা। রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে এলে খালি হাতে আসতে নেই; মহারাজাধিরাজের মর্যাদায় বাধে।

ভদ্রভাবেই বললাম, Excuse me, ম্যানেজারবাবু যেমন করেই বলুন, আসলে এ-ও একরকমের ঘুষ। ইংরেজীতে যাকে বলে illegal gratification। মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ জানাবেন, তাঁর এই উপহার আমি গ্রহণ করতে অক্ষম।

ম্যানেজার বোধ হয় অতটা আশা করেননি। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তার মানে, এই আম ক'টা আপনি নেবেন না?

—না।

—সেটা মহারাজের পক্ষে কত বড় অপমান, তা বুঝতে পারছেন?

এবার একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঐসব mediaeval যুগের রাজ-রাজড়াদের মর্যাদাবোধটা যেমন অত্যন্ত উঁচু, তেমনি বেজায় ঠুনকো। কখন কিসে যে সেটা ভেঙে পড়ে, কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

নিকোলাজ বললেন, Excuse me, Harold. ও'রা না-হয় mediaeval যুগের লোক। কিন্তু একজন আধুনিক যুগের পদস্থ সরকারী ব্যক্তির নীতি-বোধটাও তো কম ঠুনকো নয়। একঝুড়ি আমের ভার সইতে পারলো না?

মিস্টার রায়ের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। বললেন, একটা ভুল করছ। যে-ব্যক্তির কথা শুনছ, তিনি মোটেই আধুনিক ছিলেন না। সত্যি সত্যি আধুনিক যারা (আমাদের দুজনের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন), তাদের নীতিবোধ যে কিছুতেই টোল খায় না, সেকথা বিলক্ষণ জানি। আমের ঝুড়ি সেখানে বাইরে অপেক্ষা করে না। শুড় শুড় করে সোজা ভিতরে চলে যায়।

—তাতে অন্যায়টা কি, শুনি? আচ্ছা, আপনি হলে কি করতেন মিস্টার চৌধুরী? Honestly বলবেন, কিন্তু।

আমি চোখের ইঙ্গিতে boss-কে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, Honestly বলবার মত সাহস পাচ্ছি কই ?

মিলিত কণ্ঠের হাসির রোল উঠল।

মার্গারেট বললেন, তারপর আমের ঝুড়ির কি গতি হল ?

রায় বললেন, হ্যাঁ। তারপর ম্যানেজারকে বললাম, দেখুন ম্যানেজারবাবু, মহারাজাধিরাজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তেমন কিছু আমি করতে চাইনে। অথচ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমগুলো গ্রহণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে আসুন একটা রফা করা যাক। আম আমি নেবোও না ফেরতও দেবো না। Neither accept, nor reject. ইতিমধ্যে আমার Head office-এ সব ব্যাপারটা লিখে দিচ্ছি। গভর্নমেন্টের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আম এইখানেই থাক।

ম্যানেজার একটু হেসে বললেন, বেশ, তাই হোক। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তার সন্দেহ জন্মেছে। . .

নিকোলাস মৃদুকণ্ঠে ফোড়ন দিলেন, কিন্তু আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

—আমিও তোমার সঙ্গে একমত, যোগ করলেন মার্গারেট, তারপর হেড অফিসে চিঠি লেখা হল বুঝি ?

রায় বললেন, হ্যাঁ। চিঠি চলে গেল। দিন দশেক পরে একটা তাগিদও দেওয়া হল। এদিকে আমের অবস্থা বুঝতেই পারছ। ক্যাম্পে টেঁকা দায় হল। কিন্তু ঝুড়িটা সরাতেও পারি না। ম্যানেজারকে কথা দিয়েছি, Neither accept, nor reject. His Highness the মহারাজার মর্যাদা at stake! এমন সময় উত্তর এল। গভর্নমেন্ট বললেন, সরকারী কর্মচারীর পক্ষে কোন রকম উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। তবে, এইরকম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মানী লোকের মান-মর্যাদা যেখানে জড়িত, সেখানে দু-একটাকা মূল্যের কোন জিনিস গ্রহণ করতে বাধা নেই।

ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ঐ আমের দাম কত ? তিনি বললেন, দাম আবার কি ? আগেই তো বলেছি, ওটা আমাদের বাগানের আম।

—তা হোক, তবু ওর একটা বাজার-দর তো আছে।

ম্যানেজার নাকে কাপড় দিয়ে বললেন, বাজার দর ? বর্তমানে দু আনা; মানে, ঐ ঝুড়িটার দাম।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, বেশ! তাহলে মহারাজাধিরাজকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তার উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করছি।

ওঁদের চায়ের পাট আমি আসবার আগেই শেষ হয়েছিল। এবার বেড়াবার পালা। তারই উদ্যোগ করছিলেন। এমন সময় মিসেস রায় এসে বললেন, চৌধুরী, তুমি যেন চলে যেয়ো না। তোমার চা নিয়ে আসছি। মিস্টার রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেশ তাহলে তুমি বসো। আমরা একটু ঘুরে আসছি। কি বল? ডোরা রইলেন।

আমি সবিনয়ে সম্মতি দিলাম।

মিসেস রায় নিজের হাতে খাবারদাবার নিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে তাঁর দাঁড়িওয়ালা বয়। বললেন, আজ কিন্তু আমার কেকের ভান্ডার শূন্য। কি দিয়ে চা খাবে বল তো?

বললাম, আপনি যা দেবেন, তাই দিয়েই খাবো।

—তাহলে দেখছি শুধু চা-ই আছে তোমার কপালে। আবার যেদিন কেক্ করবো, খেয়ে যেয়ো দুখানা। খবর দিলে আসবে তো?

বললাম, নিশ্চয়ই আসবো। খবর দেবার দরকার হবে না।

মিসেস রায় খাবারের ডিশগুলো এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। চীজ, বিস্কুট, প্যাস্ট্রী এবং নানা রকমের ফল। প্রচুর আয়োজন। তবু উনি বার বার আপসোস করতে লাগলেন এই বলে যে, কোনটাই ওঁর নিজের হাতের নয়। সেজন্য অবশ্য আমার কোন আপসোস ছিল না। সুখাদ্যের সদ্ব্যবহারে কোন-দিন আমার কোন ত্রুটি বা অবহেলা দেখা দিয়েছে, এরকম অভিযোগ আমার ঘোর শত্রুর কাছেও শোনা যায়নি। মিসেস রায় নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে আমার খাওয়া দেখছিলেন। একটি অপূর্ব স্নেহদীপ্ত তৃপ্তি তাঁর চোখে ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, তুমি আজকাল আস না কেন, বল দিকিন? আমি বিদেশী মানুষ। তাই বুঝি পর মনে কর?

আমি একটা মস্তবড় মত্তমানের শেষ টুকরো কোনো রকমে গলাধঃকরণ করে বললাম, কিছুদিন আগে হলেও আপনার কথায় আমি প্রতিবাদ করতাম না। একজন শ্বেতাঙ্গী মহিলাকে পর মনে না করা সত্যিই আমার পক্ষে কঠিন ছিল। কিন্তু আজ একথা বলতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই, আপনাকে

দেখবার পর থেকে বুঝেছি, মানুষের পরিচয় তার দেশ বা চামড়ায় লেখা থাকে না।

আমার এই উচ্ছ্বাসের উত্তরে মিসেস রায় হঠাৎ প্রশ্ন করলেন তোমার খ্রীষ্টান নামটা কি, চৌধুরী?

—আমার নাম মলয়।

—আচ্ছা, সত্যি করে বল তো মলয়, এইমাত্র যা বললে, সেটা কি তোমার একটা সাধারণ মত, না, ঐ কথাটাই তুমি একান্ত মনে বিশ্বাস কর?

দৃঢ়ভাবে বললাম, এ আমার অকপট বিশ্বাস, মিসেস রায়।

উনি আর কোনো কথা কইলেন না। একটুখানি অপেক্ষা করে বললাম, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আপনাকে দেখলে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। অথচ আপনার সঙ্গে তাঁর তফাত এত যে লোকে আমাকে পাগল বললে, আশ্চর্য হবো না। তিনি দেখতে সুন্দর নন; বেশভূষা তাঁর কিছু নেই। লেখা-পড়া একেবারেই জানেন না। দূর পল্লীগ্রামে কাটিয়ে ছিলেন সারা জীবন। আদব কায়দার পালিশ তার দেহে বা মনে কোথাও লাগেনি। তবু মনে হয় আপনার সঙ্গে কোথায় তাঁর একটা গভীর ঐক্য আছে।

মিসেস রায়ের মুখের মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন, মলয়, তোমার সঙ্গে আমার দেখা এই সেদিন। ঘনিষ্ঠতা যেটুকু তাও সময়ের দিক থেকে সামান্য। তবু তুমি যে পরিচয় আমার দিলে, এই সাতাশ বছর যাদের নিয়ে ঘর করলাম, তারা কি তার একটা কণাও দেখতে পেল না?

চমকে উঠলাম। প্রগলভ মূর্খের মত এই বিদেশিনী মহিলার অন্তরের কোন্ গোপন তারে হঠাৎ আঘাত দিয়ে ফেলেছি! সাবধান হয়ে গেলাম। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, আমার জন্যে আজ আপনার বেড়ানো বন্ধ হল।

মিসেস অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, না না তুমি বোসো। কি বলছিলে? বেড়াতে যাওয়া? আমার তো বেড়াতে যাবার কথা ছিল না।

কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, আমি ভাবছিলুম, ওঁরা বেরিয়ে গেলেন, আপনিও যেতেন নিশ্চয়ই। সারা বিকেলটা একা-একা বাড়ি বসে কাটাবেন?

একা! উদাস কণ্ঠে বললেন মিসেস রায়, তুমি জান না, মলয়, আমি চিরদিনই একা। I have been alone all my life!"

একটু হেসে আবার বললেন, তুমি আমার সন্তানের মত। সব কথা হয়তো তোমাকে বলা উচিত নয়। তাছাড়া, তুমি ছেলেমানুষ; সব কথা বুঝবেও না। আজ নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি, আমি ভুল করেছিলাম। This marriage was a mistake!

শিউরে উঠলাম। নিতান্ত সহজ কণ্ঠে এ কী কঠিন কথা উচ্চারণ করলেন মিসেস রায়? সাতাশ বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর এ কী ভয়ংকর আবিষ্কার! এ কথার মর্ম ভেদ করবার মত না ছিল আমার বয়স, না ছিল বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা। কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম, এই মাত্র যা শুনলাম, সেটা একজন অভিমানিনী ক্ষুব্ধা রমণীর ক্ষণিক উচ্ছ্বাস নয়, একটি শান্ত স্থিতধী প্রৌঢ়া মহিলার অন্তরের নিগূঢ় উপলব্ধি।

আমি নিরুত্তর রইলাম।

মিসেস তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না, চৌধুরী। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। আমাদের দাম্পত্য-জীবনে যে সুখ, যে মাধুর্য পেয়েছি, খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই তা জুটে থাকে। কিন্তু তবু আমি বিদেশী। মা, ভাই, বোন, ভ্রাতৃবধূ নিয়ে যে সংসার, সেখানে আমার স্থান হলো না।

বিনিদ্র শয্যায় অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস ডোরা রায়ের বেদনাহত কণ্ঠস্বর আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করে বেড়াতে লাগল। এই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার বিচিত্র জীবন-কাহিনী আমার জানা নেই। যে-বিবাহ আজ তাঁর কাছে একটা মারাত্মক ভুল মাত্র, তার ইতিহাসও আমার অজ্ঞাত। এইটুকু শুধু কল্পনা করতে পারি, সাতাশ বছর আগে এই ডোরা রায় ছিলেন সুন্দরী তরুণী। দেহে যৌবনসম্ভার, নয়নে তড়িৎ-চমক, অন্তরে উদার আবেগ। জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে একদিন সুঠাম-দেহ, মেধাবী যুবক হ্যারল্ড রায়ের সঙ্গে ওঁর প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। ঠিক কোন্‌খানে জানি না। হয়তো লন্ডনের কোন নৃত্যগীতমুখর ভোজসভায়, হাইড পার্কের কোন নিভৃত লতাকুঞ্জে, কিংবা স্কটল্যান্ডের সাগরচুম্বিত পর্বতছায়ায়। সেদিন দুজনেরই চোখে ছিল যৌবনের ঘোর, যার মায়ায় মিলিয়ে গেল দেশ, জাতি এবং সমাজের দুস্তর ব্যবধান। ধীরে ধীরে আভাসে- প্রকাশে, ভাষা ও ইঙ্গিতে পরিচয় হল

অন্তরের সঙ্গে অন্তরের। অশ্রু-হাসিসিঞ্চিত বিরহ-মিলনের চিরন্তন পথে সঞ্চারিত হল অনুরাগ। তার পর একদিন বন্ধুসমাজকে সচকিত করে "merrily rang the bells, and they were wed."

ডোরাকে সেদিন অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছিল। জন্মভূমি, স্বজাতি, সমাজ, চিরপরিচিত পরিবেশ। কিন্তু কারো কথাই সে ভাবেনি, পিছন পানে তাকিয়েও দেখেনি একবার। পরম বিশ্বাসে একটিমাত্র মানুষের হাত ধরে সে বেরিয়ে পড়েছিল ঊর্মিমুখর সাগরের পথে, এক অজানা দেশের উদ্দেশে।

সেদিক থেকে মিসেস ডোরা রায় বঞ্চিত হননি। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে প্রেমের বন্ধন তাঁদের কোনদিন শিথিল হয়নি, একথা তাঁরই অকপট স্বীকারোক্তি। তবে কিসের এ দীর্ঘশ্বাস? জানি না। নারীহৃদয়ের লীলা-বৈচিত্র্যের সন্ধান আমি পাইনি। কোন মহিলা-রচিত একখানা উপন্যাসের একটি উক্তি মনে পড়ছে। "যতক্ষণ নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে সত্যকার প্রেমের যোগ থাকে, ততক্ষণই বিবাহ সার্থক ও সত্য। যে মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু, সেই মুহূর্তেই উদ্বাহ-বন্ধন উদ্বন্ধন হইয়া উঠে।"—বলেছেন জনৈকা নারী। এ কথার প্রতিধ্বনি শুনেছি কত শত কণ্ঠে, যে-কণ্ঠ একদিন পেয়েছিল মালার স্পর্শ, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতে পেল, 'তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।' সেই ডোরটাকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াবার ব্যর্থতা আর বিড়ম্বনা, সে তো অহরহ দেখতে পাচ্ছি। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বিবাহ কি শুধু প্রেম? শুধু প্রেম নিয়ে তৃপ্ত হয়েছে কোন নারী তার বিবাহিত জীবনে? ডোরা রায় হননি। তিনি স্বামী-প্রেম পেয়েছিলেন, পাননি স্বামীগৃহ। পেয়েছিলেন হৃদয়লক্ষ্মীর গর্ব। পাননি গৃহলক্ষ্মীর গৌরব। স্বামীর বন্ধুজনের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, পাননি তার আত্মজনের বিশ্বাস। স্বামীর কাছে তিনি চিরন্তন প্রিয়সখী, গৃহিণী নন, সচিবও নন। তাই সমস্ত জীবন ধরে এত পেয়েও তার অন্তরের ক্ষুধা মিটল না। অবশেষে একদিন সেই বুভুক্ষা-শীর্ণ অন্তরের রিক্ত রূপ তিনি তুলে ধরলেন বিদেশী বিধর্মী এক অনভিজ্ঞ অর্বাচীনের কাছে, ব্যক্ত করলেন তাঁর জীবনের যেটা সবচেয়ে গোপন আর সবচেয়ে মর্মান্তিক সত্য —This marriage was a mistake.

গভীর রাত পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করলুম, কেন এমন হল? ডোরা রায়ের এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী কে? তাঁর স্বামী—হ্যারল্ড রায়? তাই বা কেমন করে বলি? তিনি তো তাঁর সমস্ত উন্মুক্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর

এই বিদেশিনী পত্নীর কোমল করপুটে। সেখানে তো কোন কার্পণ্য নেই। সেখানে তো কোন ফাঁকি ছিল না। তবে?

আজ মনে হচ্ছে, একটা দিক চোখে পড়েনি হ্যারল্ড রায়ের। তাঁর মনে হয়নি—দয়িতের হৃদয়পদ্ম যত বড় কাম্য বস্তুই হোক, সারাজীবন তাকেই শুধু আঁকড়ে ধরে ভাবলোকে বিচরণ করবার সৌভাগ্য কোন নারীই কামনা করে না। সে চায় জীবনের যজ্ঞশালায় অমৃত বিতরণের আমন্ত্রণ। সে ভার যে পেল না, সংসারের রৌদ্রতাপে ললাটে ফুটল না স্বেদবিন্দু, অঞ্চল রইল ধূলিমুক্ত, প্রিয়-সুখ-মিলনের স্মৃতিভাণ্ডার তাঁর যত বড়ই হোক, মিসেস ডোরা রায়ের মত একদিন তাকে নিঃশ্বাস ফেলে বলতে হবে, আমি নিতান্তই একা!

[দশ]

সংসারে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে চিরন্তন অসহযোগ। যা চাই তা পাই না; আর যা চাই না বলে তারস্বরে চীৎকার করি, পাওয়ার ঘরে তারই বোঝা স্তূপাকার হয়ে ওঠে। এ অতি মামুলি কথা, যার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমন নরনারীর সাক্ষাৎ মিলবে না কোন দেশে এবং কোন যুগে। এই পুরাতন তত্ত্বের অধুনাতন দৃষ্টান্ত আমরা দুজন—বিখ্যাত জেলর, মৌলবী মোবারক আলি, আর তার অখ্যাত ডেপুটি, বাবু মলয় চৌধুরী।

খানিকটা আগেই বলেছি, স্বদেশীদের কাছে নিজের পরিচয়টা একটু বিশদভাবে দেবার জন্যে মোবারক আলি অনেকদিন থেকে ছটফট করছিলেন। সে বিষয়ে এখানকার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। কারণ, প্রথমত সংখ্যায় এঁরা নগণ্য। দ্বিতীয়ত, গোড়াতেই তাঁর ব্যাকরণ-নিষ্ঠার অমর্যাদা আলি সাহেবের অভিমানকে এতখানি আঘাত দিয়েছে যে, ওঁদের সংস্রব থেকে নিজেকে তিনি একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

এদিকে সমতল ভূমি থেকে নানাসূত্রে নানা রুচিকর খবর প্রতিদিন তাঁর কাছে ভেসে আসছিল। একদিন শুনলাম, কোন্ একটা বড় জেলে এক হাজার 'স্বদেশীওয়ালা' তাদের সদ্য-লব্ধ দু হাজার নতুন কম্বল একত্র জড়ো করে খাণ্ডব-দাহনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার একজোড়া করে নতুন কম্বল দাবি করে মাঠের মধ্যে সত্যাগ্রহ করে পড়ে আছেন। স্যাটানিক গভর্নমেন্টের কম্বলগুলোও যে শয়তান, এ-তত্ত্ব অস্বীকার করি না এবং শয়তানকে যে আগুনে পুড়িয়েই মারতে হয়, এ-যুক্তিও অকাট্য। অতএব বহ্ন্যুৎসবের অর্থ বুঝি। কিন্তু আর একজোড়া 'শয়তান' দাবি করে আবার সত্যাগ্রহ কেন?

কেন আবার? গর্জে উঠলেন মোবারক আলি, পিঠ চুলকোচ্ছে, বুঝতে পারছেন না? ওষুধ চাই।

আবার একদিন শোনা গেল, আর একটা কোন্ স্পেশাল না সেন্ট্রাল জেলে

ভাত-ডালের হোলি খেলা চলেছে। অন্ন উদরে প্রবেশ না করে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কারাকর্মীদের মাথায় এবং শূন্য থালার সামনে বসে সারিবন্দী রাজবন্দীরা গর্জন করছেন, ম্যয় ভুখা হুঁ!

এর ক'দিন পরেই কোত্থেকে এল এক উড়ো খবর—সেখানে নাকি 'স্বদেশী-বাবুরা' সন্ধ্যাবেলায় ব্যারাকে না ঢুকে, চড়েন গাছে এবং গভীর রাত পর্যন্ত আবৃত্তি করেন শিবরামের মহাসঙ্গীত। মোবারক বললেন, 'গুলি খেয়ে গাছের ওপর থেকে পাখি পড়তে দেখেছি। মানুষ কি করে পড়ে, দেখতে ইচ্ছা করে।' অর্থাৎ ওখানে উপস্থিত থাকলে দৃশ্যটা তিনি স্বহস্তে উপভোগ করতেন।

এই জাতীয় খবর আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর যে আঘাত করত, তার প্রতিক্রিয়া উভয়ের বেলায় ছিল বিপরীত। আমি প্রার্থনা করতাম, এই সব 'স্বদেশী'-পীঠস্থান থেকে আমাকে রক্ষা করো ভগবান! মোবারকের প্রার্থনা ছিল—হে খোদাতাল্লা, বেশি নয়, শ' পাঁচেক বেয়াড়া স্বদেশী আমার হাতে এনে দাও। একবার পরখ করে দেখি, তারা কী রকম চীজ।

নিছক নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনায় নির্ভর না করে তিনি শেষ পর্যন্ত কালি-কলমের আশ্রয় নিলেন। লিখিত আবেদনে জানালেন উপরওয়ালার দরবারে, এই সঙ্কটকালে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করতে উৎসুক। অতএব তাঁকে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক জেলে স্থানান্তরিত করা হোক।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের রসজ্ঞান আছে। তাঁর সরব এবং আমার নীরব—কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হল না। মোবারক রয়ে গেলেন পাহাড়ের দেশে চোর-ডাকাত আগলে; আমার ডাক পড়ল এক নির্জলা 'স্বদেশী' ছাউনিতে সত্যাগ্রহী দমনের মহান ব্রত স্কন্ধে নেবার জন্যে।

দুর্গম জঙ্গলে ঘেরা ডজন খানেক ভাঙা বাড়ি। এককালে ছিল গোলা-বারুদের কারখানা। প্রহরে প্রহরে বেয়নেট দেখাত টহলদার প্রহরী, অজ্ঞ পথ-চারীর প্লীহা কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিত—হুক্‌কুমদার! কালক্রমে প্রহরী বদল হল। বেলুচ্ রেজিমেন্ট যেখানে ছিল সেখানে দেখা দিল ফেরুপাল। তারাও প্রহর ঘোষণা করে। 'হুক্‌কুমদার' বলে না, বলে হুক্কা হুয়া।

এক যুগ পরে আজ আবার এল পট-পরিবর্তনের পালা। কোদাল, কুড়ুল, আর শাবলের ঘায়ে ভিটেছাড়া হয়ে গেল শিবরামের দল। নতুন দৃশ্যে, যারা

অবতীর্ণ, সরকারের চোখে তারাও একজাতীয় জীবন্ত গোলাবারুদ। তাই নতুন করে আবার শুরু হয়েছে সশস্ত্র প্রহরীর টহল-গর্জন। হুঁশিয়ারির সরঞ্জাম এবার ব্যাপকতর।

এই কারখানা থেকে একদিন যে বুলেট বেরিয়েছিল, তাদের খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক। রক্ত-পিছল পথে তারাই করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্বোধন। আজ যেসব বুলেট জড়ো হল এই ভাঙা ঘরের বুকে, তাদের পথ রক্তহীন। কে জানে হয়তো এদের হাতে এই পথ বেয়েই আসবে একদিন এই সাম্রাজ্যের উপসংহার।

জঙ্গলের পাশে মাঠ। সেখানে তৈরি হল সারি সারি চালাঘর। শালের খুঁটি, খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া। পাঁচিল ছাড়া জেল হয় কেমন করে? কারাগার বলতে প্রথমেই বুঝি কারাপ্রাচীর। সে থিওরি বাতিল হয়ে গেল। একটা সূক্ষ্ম কাঁটা তারের বেষ্টনী কোনরকমে আব্রু রক্ষা করে বাঁচিয়ে দিল জেলের মান, মসলিনের ওড়না যেমন করে লজ্জা নিবারণ করে রাজপুত রমণীর। কাস্তেধারী পথচারী কৃষকের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে। যারা তরুণ, ঠাট্টা করে বলে, এ জেল না বাবুদের বাগান-বাড়ি? একটু প্রাচীন যারা, সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দেয়, এখানে কারা থাকবে জানিস? স্বদেশীবাবুরা। গান্ধি-রাজার লোক। এতো চোর-ডাকাত নয়, যে পালাবে?

সেটা আমরাও বুঝি। তবু চিন্তিত হলেন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ জেলর মহেশ তলুকদার। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ইন্সপেক্টর জেনারেল তাঁর আশঙ্কাকে আমল দিলেন না। বললেন, দু-চার-দশটা যদি পালায়, টেক নো নোটিশ। তার বেশি হলে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিও আমার অফিসে। তবে rest assured, jailor সে রিপোর্ট তোমাকে দিতে হবে না। এঁরা পালাবার জন্যে আসেনি।

তার ঘেরা শেষ হতেই শুরু হল বন্যাপ্রবাহ। বড় বড় মোটরযান ভর্তি —আসছে তো আসছেই। যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও কিশোর। উচ্ছল হাসি আর প্রদীপ্ত উৎসাহ। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়।

—আজ কত এল?

—তিনশ পঁচিশ।

—মোটে? আমাদের এসেছে চারশ সাতান্ন।

পাশাপাশি দু জেলের কর্মীদের দিনান্তে দেখা হলে আলাপের বিষয় ঐ একটি। পাকা বাড়িতে থাকেন নেতা এবং উপ-নেতার দল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে খড়ের চালা। তাদের আর শেষ নেই। পাঁচশ, ছশ, আটশ, হাজার, বারশ। আর যে জায়গা নেই। কে শোনে সে কথা? বন্যার জল ফেঁপে ফুলে উঠছে প্রতিদিন। এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রুখবে কে?

কাঁটা তারের গেট। তার সামনেই টালির ঘরে অফিস বসেছে। কাজ চলেছে সকাল থেকে রাত বারোটা। লড়াইফেরতা সুপার, ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। প্রবীণ এবং সুদক্ষ জেলর মহেশ তালুকদার। চারজন তার ডেপুটি। তারপর আছে কেরানীকুল এবং সিপাই-সান্ত্রীর বিশাল বাহিনী। টেবিলে টেবিলে ওয়ারেন্টের হিমালয়, আর ফাইলের পিরামিড। নানা আকারের আর নানা প্রকারের খাতার উপর কলম চলছে অবিরাম। তার সঙ্গে চলছে হাসি, পরিহাস, চা-সিগারেট আর মাঝে মাঝে অফিসপলিটিক্সের রুচিকর ফোড়ন।

ও, বাবা! এ যে সবাই দেখছি rigorous imprisonment, সশ্রম কারা-দণ্ড। কি শ্রমটা করছেন এ'রা?—অনেকটা আপন মনেই বললে সুধাংশু। আমদানী বইতে ওয়ারেন্ট নকল করা তাঁর কাজ।

ডেপুটি জেলর হৃদয়বাবু চা খাচ্ছিলেন। বললেন, কেন, শ্রমটা কম হচ্ছে কোথায়? তোমাদের ঘানিটানা পাথরভাঙ্গা এসব করছে না বটে; কিন্তু ওদের লাইনে ওরা খাটছে সারাদিন।

—যথা?

—যথা, ভোরে উঠেই—মিলিটারী কায়দায় বললেন হৃদয়বাবু—

বাঁয়া ডাহ্‌িনা,
বাঁয়া ডাহ্‌িনা,
ঘুম্ যাও।
বাঁয়া ডাহ্‌িনা,
বাঁয়া ডাহ্‌িনা,
ঠ্যার্ যাও।

সকলেরই হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যতীশদা বললেন এধার থেকে. ক্ষেপে গেলেন নাকি হৃদয়বাবু? ওসব কি বলছেন?

হৃদয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, বুঝতে পারছেন না? প্যারেড; স্বদেশী প্যারেড! আপনারা যাকে বলেন,—

Left Right, Left Right
About Turn!
Left Right, Left Right
Halt!

হাসির রোল উঠল ঘর জুড়ে। যতীশদা কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরবেলার খবর রাখেন না। সন্দেহের সুরে বললেন, এসব সত্যিই করে নাকি ওরা, না, বানিয়ে বলছেন আপনি?

হৃদয়বাবু চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, আপনি ভাগ্যবান লোক দাদা। রোজ বৌদির হাতে লেহ্য পেয় খেয়ে দশটা-পাঁচটা করছেন। একদিন মশার কামড় খান না, আমাদের সঙ্গে এই জঙ্গলে? নিজেই দেখতে পাবেন, বানিয়ে বলছি কিনা। যতীশদা একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন। সুধাংশু বাধা দিয়ে বললে, সে থাকগে। আপনি বলুন। এর পরের পর্বটা কি? হৃদয়বাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এর পরেই শুরু হল ক্লাস। নিম্ন প্রাইমারি থেকে এম. এ. পর্যন্ত যত রকমের ক্লাস আছে, সব। কতক ঘরে, কতক মাঠে, কতকটা গাছতলায়। এত বড় রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি পৃথিবীতে আর কোথাও পাবে না।

—কটা অবধি ক্লাস চলে?

—ঘড়ি ধরে এগারোটা। তারপর স্নান এবং আহার পর্ব। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। দুটো থেকে শুরু হবে বক্তৃতা, আলোচনা, ডিবেট, আর তার মধ্যে (গলা খাটো করে বললেন হৃদয়বাবু) কোন কোন ঘরে সিক্রেট মিটিং কিংবা ক্লোজ-ডোর মন্ত্রণাসভা। এই জেলে বসেই ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তৈরি হচ্ছে, জেনে রেখো।

—তারপর?

—তারপর বিকেল বেলায় খেলাধুলো। দাঁতকপাটি, হাডু-ডু-ডু, দাড়ি বাঁধা, চোর চোর। সন্ধ্যার পরে আমোদ প্রমোদ। ক্যারিকেচার, ম্যাজিক, সাঁওতাল নাচ আর কত কি! কোনো কোনো ঘরে আবার গানের মজলিশও বসে। তার সঙ্গে জলের ড্রাম বা বালতির সংগত।

নিতাই বক্সী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছে কিন্তু লোকগুলো। জেল খেটে দেশোদ্ধারও হল, এ দিকে ফুর্তির সীমা নেই। আর আমাদের

অবস্থা দ্যাখ। কোন্ সকালে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি। বারোটা বেজে গেল। কখন যে ফিরবো, কে জানে? আর, ফিরেও তো সেই লোহাকাটাদের হোটেলের শুকনো ভাত। থালায় ঢাললে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে, যেন পাথরের টুকরো।

ছোকরামত কে একজন বলল, তার চেয়ে চলুন না, দাদা, গান্ধীজী কি জয় বলে বেরিয়ে পড়া যাক্। লোহাকাটাদের লোহার টুকরোর বদলে দিব্যি দুবেলা গরম গরম—

চলিয়ে হুজুর—জমাদার তমেশ্বরনাথ মিশির সেলাম দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। ব্যাপার নতুন কিছু নয়। প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। রন্ধন-যজ্ঞ সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে। এবার ভোজন-যজ্ঞের উপক্রমণিকা, অর্থাৎ পরিবেশন,—জেলের ভাষায় যাকে বলে ফিডিং প্যারেড্।

নিতাই বকসীর টিফিন ক্যারিয়ারে হোটেলের শুষ্ক অন্ন শুষ্কতর হতে লাগল। টুপিটা তুলে নিয়ে ছুটতে হল অপরের সদ্য-পক্ক অন্ন বিতরণ-উৎসবে খবরদারি করবার জন্যে। তিনি একা নন। আমরাও সঙ্গ নিলাম, সমব্যথার ব্যথী। ডেপুটি জেলর বাহিনীর এটা হচ্ছে দৈনন্দিন অভিযান। ফল যা হবে সেটাও আমাদের মুখস্থ। বন্টন ব্যাপারে যথা-সম্ভব হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অন্তত পঞ্চাশজনের ভাত কম পড়বে, যদিও চাল যেটা দেওয়া হয়েছে বরাদ্দমত তার হিসাব নির্ভুল এবং রান্নার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে কোনো ত্রুটি নেই। তারপর হবে একটা নিষ্ফল এনকোয়ারি অর্থাৎ স্বদেশী ক্যাম্পের পাণ্ডাদের সঙ্গে খানিকটা নিরর্থক বাগবিতণ্ডা।

জমাদার বলবে, হামি খোদ দেখেছি, এই পাঁচঠো বাবু দোবার করে ভাত লিয়েছে। স্বদেশীরা গর্জে উঠবেন, মিথ্যা কথা। আমরা ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ওঁদের কোনো মতে ঠাণ্ডা করে আমাদের রিপোর্ট দিতে হবে—রন্ধনশালার সাধারণ কয়েদীদের অনবধানতাবশত তেইশ সের দশ ছটাক চালের ভাত পুড়ে গিয়ে মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য হয়ে গেছে। অতএব ঐ পরিমাণ চাউল অতিরিক্ত ইসু করা হউক! অতঃপর বড় সাহেবের হুকুম হবে, তথাস্তু, এবং নতুন করে কয়লা পড়বে বয়লারে।

এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে প্রতিদিন। স্বদেশী নেতারা বলছেন, আমাদের হাতে কিচেন ছেড়ে দিন। সেখানকার সাধারণ কয়েদীদের চালাব আমরা। রসদ হিসাব করে বুঝে নেবো। বাকি দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু

কর্তৃপক্ষ রাজী নন। সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে এ ব্যবস্থা চলে কেমন করে? কিচেন আমাদেরই চালাতে হবে। জেল-ম্যানেজমেন্ট সরকারের দায়িত্ব। তোমরা কয়েদী। কয়েদীর হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা রসদ-গুদামের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। বারান্দায় বসে স্টোর ক্লার্ক সুরেশবাবু হিসাব কষছেন। টেবিলের ওপাশে আরেকখানা চেয়ারে বসে আছেন ও তরফের একজন ছোট নেতা, বিমল মজুমদার। তাঁর হাতে খাতা-পেন্সিল। সুরেশবাবুর হাঁক শোনা গেল,—হলুদ ৩৭ সের বার ছটাক হচ্ছে, বিমলবাবু। আপনার কত হল?

—আজ্ঞে, আমার হচ্ছে তের ছটাক।

—বেশ। ঐ এক ছটাক আপনাকে বখ্‌শিস্‌ দেওয়া গেল।

দুজনেই হেসে উঠলেন। যে-সব সাধারণ কয়েদীরা মাল ওজন করছিল, তাদের মুখেও দেখলাম খুশির ঝলক। সমস্ত রসদ কষে, মাল ওজন করে বিমলবাবু কিচেনে নিয়ে গেলেন, কয়েদীর মাথায় চড়িয়ে। শুনলাম, উনিই নাকি এ মাসের মত মেস কমিটির সেক্রেটারি। রন্ধনশালার তদারক করছেন আর একজন। তিনি কিচেন কমিটি। রান্নার চেহারাও দেখলাম বদলে গেছে। জেলের আইনে প্রত্যেক কয়েদীর প্রাপ্য হচ্ছে চার ছটাক সব্জি। এক গাড়ি তরকারী আসে রোজ। আলু, বেগুন, কুমড়ো, পালংশাক, মুলো, বাঁধাকপি আরও কত কি। এই হরেক রকমের জিনিস একসঙ্গে মিলিয়ে একটা উপাদেয় রসায়ন তৈরি হত এতকাল। আজ সেই একই উপকরণযোগে তরকারী হচ্ছে দুটো—আলু আর বাঁধাকপির ডালনা, বাকি সব দিয়ে একটা চচ্চড়ি মত। ডাল আর জলের অসহযোগ আমরা কোনোদিন ঘোচাতে পারিনি। এবারে দেখলাম, তারা বেমালুম মিলে গেছে এবং তার মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে মাছের মাথার ভগ্নাংশ। একমাত্র ভাজা ছাড়া মৎস্য-খণ্ডের যে আর কোনো সদ্‌গতি করা যেতে পারে, রন্ধন কর্তৃপক্ষের সেটা ছিল কল্পনার বাইরে। সেই মৎস্যকেই দেখলাম, কালিয়া-রূপে শোভা পাচ্ছে কয়েদীর থালায়।

কিচেন কমিটি হেসে বললেন, কি দেখছেন, ডেপুটিবাবু; বিধাতা আমাদের রসনা দিয়েছিল দুটো কাজের জন্যে—বক্তৃতা আর সুখাদ্যের রস গ্রহণ। প্রথমটা যখন আপনারা গায়ের জোরে বন্ধ করলেন, সে লোকসান তো দ্বিতীয়টা দিয়েই পুষিয়ে নিতে হবে।

আমি বললাম, শুধু পুষিয়ে নেওয়া? বলুন, সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেওয়া।

মেস কমিটি হেসে উঠলেন।

ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম, কার হুকুমে হল এসব? কেউ জানলো না, তবু হয়ে গেল রাতারাতি কর্তৃত্ব হস্তান্তর। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, কতকটা যেন স্বভাবের নিয়মে, আপনি আপনি। কর্তৃপক্ষ দেখেও চোখ বুজে রইলেন, মনে মনে বোধ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সব চেয়ে খুশি হলাম আমরা, অর্থাৎ নিতাই বক্সীর দল। পঁচাশ আদমিকা ভাত ঘট্ গিয়া—এই ভয়াবহ রিপোর্ট নিয়ে আর আসে না তমেশ্বর মিশির। এনকোয়ারির দায় থেকে মুক্তি পেয়েছি।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও যায় যায়। জোয়ারের বেগ শেষ হল। দেখা দিয়েছে ভাটার টান। যারা মাঝ দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছিল, ঝড়ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করেনি, তাদের মন আজ ঘরমুখী, তীরের আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল। দেশমাতৃকার দীপ্ত মূর্তি অনেকের চোখেই ঝাপসা হয়ে এসেছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আপন আপন গৃহের রূপ। দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, মেজাজ রুক্ষ। প্যারেড, ডিবেট আর ক্যারিকেচার আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় এসেছে অসহিষ্ণু বাগযুদ্ধ আর অহেতুক দলাদলি। বাইরের খবর কি? জেলের এই কদন্ন আর কম্বলশয্যা আর কতকাল কপালে আছে? মহাত্মাজী কি বলছেন? কম্প্রমাইজের কতদূর হল? এই সব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে গুঞ্জন করছে সবারই মনে মনে।

আফিস চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। যেখানে রাত বারোটায় নিঃশ্বাস পড়ত না, সেখানে বেলা বারোটায় নাক ডাকে। আগমনীর পালা অনেক দিন শেষ হয়েছে; এখন চলেছে বিদায়ের পর্ব। রোজই একদল বেরিয়ে যাচ্ছে জেলের মেয়াদ শেষ করে। বন্ধুরা গেট পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে যায়। মুরুব্বিরা ভিড় করেন আফিস পর্যন্ত। তারপর পাথেয় নিয়ে চলতে থাকে দর কষা-কষি। খোরাকী দুদিন হবে, না তিন দিন; নৌকা ভাড়া তিন টাকা হবে, না সাড়ে তিন। জেলর মহেশ তালুকদার খাঁটি ব্যুরোক্র্যাট—ইস্পাতের ফ্রেমের উপর কাদার গাঁথুনি। বিনয়ে সৌজন্যে গদগদ। সাড়ে তিন ঘণ্টা অসীম ধৈর্য নিয়ে বক্তৃতা শুনে যাবেন, কিন্তু টাকার অঙ্ক তিন থেকে সাড়ে তিন হবে না।

ওদিকে স্বদেশী পাণ্ডারাও ইস্পাতের জাত। মাঝে মাঝে যখন সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ডাক পড়ে আমার। জেলর সাহেবের অনুগ্রহে আমি হচ্ছি তাঁর ভৌগোলিক উপদেষ্টা।

—এই যে, মলয়, তুমি তো অনেক কাল কাটিয়েছ ওদেশে। বল তো কুমিল্লা থেকে বদরখালি নৌকা ভাড়া কত?

কুমিল্লার সঙ্গে আমার পরিচয় ভূগোলের পাতায়; আর বদরখালির নাম এই প্রথম শুনলাম। তবু বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে বলতে হয়, বদরখালির কোন্ পাড়ায় বাড়ি আপনার?

খালাসোদ্যত আসামীটি বললেন, দক্ষিণপাড়ায়।

নৌকো তো ওদিকে সস্তা। কত চাইছেন আপনি?

ভদ্রলোক উত্তর দেবার আগেই, তালুকদার সাহেব বললেন, উনি তো চার টাকা হেঁকে বসে আছেন। আমার মনে হয়, আড়াই টাকার বেশী লাগবে না।

আমি রায় দিলাম, টাকা তিনেকের মত পড়বে।

যেন সকল সমস্যার সামাধান হয়ে গেছে, এমনিভাবে বললেন মহেশবাবু, ব্যাস; মিটে গেল। মলয়ের যে সব জানা কিনা?

পাণ্ডারা মনে মনে উত্তপ্ত হলেও বাইরে কিছুই বললেন না। খালাসীটি ছেলেমানুষ। মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। উষ্মার সঙ্গে বলে উঠল, আচ্ছা। স্বরাজ হলে আমাদের হাতেই ক্ষমতা আসবে। তখন দেখবো, কি করে আপনাদের চাকরি থাকে।

তালুকদার মশায় হেসে উঠলেন, বলেন কি? চাকরি থাকবে না? বরঞ্চ মাইনে বেড়ে যাবে আমাদের। আজ বিদেশী সরকারের পয়সা বাঁচাচ্ছি; তখন বাঁচাবো আপনাদের।

কিন্তু আমি জানি, তালুকদার সাহেব কড়াকড়ি যতই করুন, শেষ পর্যন্ত হার হত তাঁরই—অন্তত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, ঠিক যেমন করে হারতেন আমাদের আঠারো নম্বর মেসের ম্যানেজার হরিদাসবাবু।

গল্পটা যখন মনে পড়ল, বলেই ফেলি।

অনেক দিন আগেকার কথা। ইস্কুলে পড়ি। থাকতাম এক মেসে। নতুন ঠাকুর বহাল হল—মহাদেব মিশ্র। অতবড় কারিতকর্মা লোক সারাজীবনে দ্বিতীয়টি আর দেখলাম না। কামিনীবাবুর আফিস ঠিক সাড়ে আটটায়। আটটা বাজতে পনর মিনিট হতেই খাবার ঘর থেকে হুঙ্কার এল—ঠাকুর ভাত

নিয়ে এসো। মাছ সবে কোটা হচ্ছে তখন। কামিনীবাবুর সঙ্গে তার যোগা-যোগ শুধু লোলুপ দৃষ্টি আর দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তার জন্য বরাদ্দ ছিল দু পয়সার দই, অর্থাৎ মধুপর্কের এক বাটি। হঠাৎ সেদিন দইয়ের বদলে হাতা হস্তে মহাদেবের প্রবেশ। কামিনীবাবু অবাক। ওটা আবার কি?

—আজ্ঞে রামরস।

—রামরস মানে?

মহাদেব হাতা উপুড় করে দিল কামিনীবাবুর পাতে। দস্তুরমত মাছের ঝোল। সঙ্গে একটুকরা মাছ। কামিনীবাবুর চোখে আনন্দাশ্রু; সেকি, এরি মধ্যে হয়ে গেল?

—করে ফেললাম একহাতা।

হাঁড়ি নয়, কড়া নয়, হাতায় করে রান্না মাছের ঝোল! কামিনীবাবুর কপাল ফিরে গেল সেই দিন থেকে।

দুদিন না যেতেই মহাদেব গোটা মেসটাকে জয় করে ফেলল। মহাদেব ছাড়া আর কোন বাবুরই চলে না। আস্তে আস্তে বাজারের ভারও এসে গেল তার হাতে। লেখাপড়া সে জানত না। কাগজ-কলমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হিসাব সব মুখে মুখে। রোজ সকালে ম্যানেজার হরিদাসবাবু দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতে ধরে দিতেন। সন্ধ্যাবেলা সে খরচ লিখিয়ে হিসাব মিটিয়ে যেত। হরিদাসবাবু খাতা খুলে বললেন, বল, মাছ?

—মাছ ৮৷৶৹

হরিদাসবাবু লিখলেন ৭৸৹

—পটল?

মহাদেব বলল, পটল ২৸৶৹

হরিদাসবাবু লিখলেন, ২৷৹

এমনি করে মহাদেব যা বলত, প্রতি দফায় বেশ কিছু ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে ম্যানেজার বসাতেন তার খাতায়। লেখা শেষ হলে মহাদেব জিজ্ঞেস করত, কত হল বাবু? হরিদাসবাবু খাতার অঙ্ক যোগ করে বললেন, ১৭৷৵৹১০

—কত ফেরত দিতে হবে?

—২৷৶১০

মহাদেব বিনা বাক্যব্যয়ে ২৷৶১০ ফেলে দিয়ে চলে যেত। হরিদাস

তাকিয়ে থাকতেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগত তাঁর হাঁ বন্ধ হতে। যতই কাটুন, সব যেত জলের উপর দিয়ে। দুধে হাত পড়ত না কোন-দিন।

গল্পটা একদিন জেলর সাহেবকে শোনালাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর হেসে বললেন, তোমার ঐ হরিদাসের সঙ্গে আমার আসল জায়গাতেই তফাত।

—যেমন?

—তিনি জিতবার চেষ্টা করে ঠকতেন। আমি জিতবার চেষ্টা করি না।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। মহেশবাবু আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, বুড়ো হয়ে গেলাম। জীবনে নিজের রোজগার থেকে দুটো পয়সা কোন সৎকাজে কারো হাতে তুলে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। দৈবক্রমে গৌরীসেনের এত বড় সিন্দুকটা যখন হাতে এসে পড়েছে, তার থেকে দু-চারটা পয়সা যদি ঐ বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো ছেলে-গুলোর ভোগে লাগে তো লাগুক না, আমার তো কোন লোকসান নেই।

[এগারো]

স্বপ্ন দেখছিলাম। দার্জিলিং-এ আমার সেই বাংলো। বাইরের ঘরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। বেলা গড়িয়ে গেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে ডেকে যাচ্ছে কাঞ্চী, বাবুজি বাবুজি। ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। কাঞ্চীর হাসির ফোয়ারা খুলে গেল, ছড়িয়ে পড়ল স্বপ্নময় মধুর ঝঙ্কারে।......

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। বিছানার পাশে বিশ্রী কর্কশ সুরে বেজে চলেছে অ্যালার্ম ঘড়িটা। রাত দুটো বেজে পনের। রাউন্ডে যেতে হবে। নিতান্ত যে ক্রীতদাস তারও আছে গভীর রাত্রির বিশ্রামের অবকাশ। আমার নেই। সেই কথাটাই জানিয়ে দিল ঘড়িটা।

ফাল্গুনের শেষ। শীত চলে গেছে। রাত্রিশেষের কোমল দেহে লেগে আছে তার বিদায়ের স্পর্শ। কি মধুময় এই নিশীথ রাত্রির শয্যার আলিঙ্গন! 'ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম।' কিন্তু তার চেয়েও প্রবলতর টান মহেশ তালুকদারের ডিউটি রোস্টারের চতুর্থ লাইন—"বৃহস্পতিবার লেট্ রাউন্ড—ডেপুটি জেলর বাবু মলয় চৌধুরী।" কোনোরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে পড়লাম, শেক্সপিয়র যাকে বলেছেন crawling like a snail. আজ বুঝলাম, এই অনবদ্য বিশেষণটির এর চেয়ে যথাযথ প্রয়োগ আর হতে পারে না। কোনো রাউন্ড-গামী জেলর কিংবা তার ডেপুটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি মহাকবির। যদি হত, বেচারা ইস্কুলের ছেলেগুলোর মাথায় এত বড় অপবাদের বোঝা চাপিয়ে যেতেন না।

রাউন্ডে চলেছি। কিসের উদ্দেশ্যে আমার এই নৈশ অভিযান? কর্তব্য-পরায়ণতা, সতর্কতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বড় বড় কথার খুঁটো দিয়ে যতই কেননা একে উঁচুতে তুলে ধরি, নিজের কাছে একথা লুকোনো নেই যে, আমার আসল উদ্দেশ্য—শিকার সন্ধান। চাকরির উচ্চ মঞ্চে আরোহণের যতগুলো সোপান আছে, এও তার মধ্যে একটি। এই শিকার-সংখ্যাই হচ্ছে আমার কৃতিত্বের মাপকাঠি। গিয়ে যদি দেখি, আমার শিকারের দল, অর্থাৎ নিশাচর প্রহরীকুল সজাগ ও সতর্ক, তাদের মাথার পাগড়ি মাথার উপরেই আছে, চাদরত্ব প্রাপ্ত হয়ে দেহ আবৃত করেনি; তাদের পায়ের জুতো পায়েই শোভা পাচ্ছে উপাধানে

রূপান্তর লাভ করেনি, আমার সমস্ত পরিক্রমা ব্যর্থ হবে। আমার রিপোর্ট হবে একটি লাইন—Found everything in order. বলা বাহুল্য, এই সরল এবং সুরহীন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কর্ণে সুধা বর্ষণ করবে না, অর্জন করবে কুঞ্চিত নাসিকার অবজ্ঞা—লোকটা কি ওয়ার্থলেস্! অর্থাৎ অন্যের গলদ আবিষ্কারের অক্ষমতাই হচ্ছে আমার নিজের গলদের বড় প্রমাণ।

কিন্তু অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয়, আমার রিপোর্টের পাতা ভরে উঠবে বিচিত্র শিকার-কাহিনীর সরস বর্ণনায়। কারো হাতে লাঠি নেই, কারুর জামায় নেই বোতাম, কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে গেছে দু মিনিট, অবিরাম টহল দিতে দিতে কেউ বা নিজের সীমানা ছেড়ে গিয়ে গল্পের থলেটা খুলে ধরেছে সদ্য-মুলুক-প্রত্যাগত কোনো ভাইয়ার কাছে। এছাড়া থাকবে দুটো একটা sleeping while on duty—নৈশ প্রহরীর সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ—ঘুম।

ঘুম! তারই বা কত বিচিত্র রূপ। এতদিন জানা ছিল মুদ্রিত চক্ষুই নিদ্রাদেবীর আসন। খাট নাই, পালঙ্ নাই, খোকার চোখে বস। কিন্তু খোকার সে চোখ যদি চেয়ে থাকে, ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী তো সেখানে বসতে পারেন না। এই কথাই তো শুনে এসেছি মা-ঠাকুরমার কাছে। রাউন্ডে বেরিয়ে ধরা পড়ল, ছেলেমানুষ পেয়ে কী প্রতারণাই না তাঁরা করে গেছেন। ঐ যে সিপাইটি লাঠি ঠুকে ঠুকে টহল দিচ্ছে, পা ফেলছে ঠিক সমান তালে, চোখ খোলা, দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, কাছে এগিয়ে যান, শুনতে পাবেন ওর নাকের ডাক। পথ আগলে দাঁড়ান, ও সোজা এসে পড়বে আপনার ঘাড়ের উপর। মাথার উপর থেকে টুপিটা তুলে নিন, ও জানতে পারবে না। ও জেগে নেই। গভীর ঘুমে বিভোর। ঐ পাঁচিলের ধারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে শিবনেত্র প্রহরী, লাঠিটা ধরে আছে নিখুঁত অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে, আমাকেই যেন সম্মান দেখাবার জন্যে, দেহ নিস্পন্দ, মাথাটি পর্যন্ত দুলছে না,—ওরও সমস্ত চেতনা নিদ্রাচ্ছন্ন। এরা হঠযোগী নয়, চলন্নিদ্রাসন বা অন্য কোনো উৎকট আসনও অভ্যাস করেনি বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়। কিন্তু এর পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের সাধনা আর তার মূলে নিতান্ত প্রাণের দায়। সমস্ত জীবনে একটি সম্পূর্ণ রাত্রিও যাদের কাটে না শয্যার আশ্রয়ে, নিদ্রা-বশীকরণের এই দুরূহ প্রক্রিয়া তাদের বাধ্য হয়েই শিখতে হয়। এই বিদ্যার জোরেই এরা ধূলি নিক্ষেপ করে আমাদের হুঁশিয়ার চোখে এবং আমাদের মারাত্মক লেখনীর কবল থেকে মুক্তি পায়। মুক্তি পায় না তারা, এই জাতীয় ভ্রাম্যমাণ এবং দণ্ডায়মান নিদ্রা যাদের আয়ত্ত হয়নি, নিদ্রা যাদের

কাছে শয়নসাপেক্ষ, অর্থাৎ কোনো যৌগিক বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় না নিয়ে যারা সোজা সটান আশ্রয় করে ভূমিতল। কিন্তু ধূলি-নিক্ষেপের হাত থেকে সেখানেও যে আমাদের চক্ষুযুগল পুরোপুরি মুক্ত নয়, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমাদের সহকর্মী মহীতোষদা।

ভালোমানুষ বলে মহীতোষবাবুর অখ্যাতি ছিল। সেটা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পুরো তিন মাসের মধ্যেও তাঁর রাউন্ডের জালে কোনো শিকার ধরা পড়ল না। মহীতোষ রাউন্ডের সংখ্যা ও সময় বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর কপাল ফিরল না। তারপর একদিন তাঁর নজরে পড়ল, রাউন্ডে বেরিয়ে প্রতিবারই একটা-না-একটা পোস্ট তিনি খালি দেখতে পান। অনুপস্থিত সিপাহীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তার প্রতিবেশী ওয়ার্ডার এমন একটা জায়গার নাম করে, যেখানকার ডাক জৈবিক প্রয়োজনে অলঙ্ঘনীয়। একদিন তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা যায়। প্রতিবেশী সিপাহী কেমন অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু তার বন্ধুর দেখা নেই। মহীতোষদা একটা গাছের গোড়ায় বেশ স্থায়ীভাবে বসলেন। ক্রমে প্রহরী বদলের ঘণ্টা পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরে একদল নতুন সিপাহীও এসে গেল। পুরানো দলকে এবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যার জন্যে তিনি অপেক্ষা করে আছেন, তার অগস্ত্য যাত্রার অবসান হল না।

তারপর সেই বিশেষ স্থানটিও খুঁজে দেখা গেল। কেউ নেই। মহীতোষবাবু নিরাশ হয়ে অগত্যা ফিরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ গাছের উপর থেকে ঝুপ করে তার মাথায় একটা কি পড়ল। এ কি? খাকী টুপি এল কোত্থেকে? প্রথমটা মনে হল ভৌতিক ব্যাপার। কিন্তু গভীর রাতে গাছের ডাল থেকে নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় টুপি বর্ষণ করে মজা দেখবার মত রসজ্ঞান ভূতেরও আছে কিনা সন্দেহ হল মহীতোষবাবুর। সন্দেহভঞ্জনে দেরি হল না। নিরুদ্দেশ সিপাহীর সন্ধান পাওয়া গেল। অর্থাৎ দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনি 'উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়' নির্বিঘ্নে এবং সুস্থদেহে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছেন। শিরশ্চ্যুত টুপিটা অসময়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবার আশু সম্ভাবনা ছিল না।

মহীতোষবাবু অতঃপর আবিষ্কার করলেন, ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। তিনটি বৃহৎ শাখার প্রশস্ত সঙ্গমস্থলে কম্বল-বিছানো এবং সেটা নিয়মিত

নিদ্রার স্থায়ী ব্যবস্থা। কারো ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত নয়, রীতিমত যৌথ কারবার। লভ্যাংশ সমান ভাগে বণ্টন করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সিপাহী পালা ক্রমে এই নিদ্রাসুখ ভোগ করেন এবং তার শূন্য পোস্টের উপর যখন রাউন্ড অফিসারের নজর পড়ে, পার্শ্ববর্তী বন্ধুরা কৈফিয়ত দেয়—call of nature, sir.

জেল কর্তৃপক্ষের সৌভাগ্য, সকলেই মহীতোষবাবু নয়। পাহারাওয়ালার মধ্যে যেমন একদল থাকে বুনো ওল, রাউন্ডওয়ালাদের মধ্যেও তেমনি আছে দুচারটা বাঘা তেঁতুল। তার সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের 'গগন ডিপুটি'। ভদ্রলোক পদে কেরানী, কিন্তু পরিচ্ছদে ডেপুটি জেলর। নাম গগন হালদার; সিপাহীরা বলে গগন ডিপুটি। যদিও কেরানী হিসাবে 'রাউন্ড' তাঁর অবশ্য-করণীয় নয়, তাঁর অত্যধিক উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষ্য করে কোনো সুরসিক জেলর রাউন্ডের তালিকায় গগনবাবুর নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অবধি তাঁর দাপটে সিপাহী-কুল কম্পমান। টহল দিতে দিতে দু' মিনিট যদি কারো পা দুটো থেমে যায়, লাঠিখানা জড়িয়ে ধরে চোখ দুটো যদি জড়িয়ে আসে তন্দ্রায়, অন্য বাবুদের কাছে কান্নাকাটি চলে, রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু গগন ডিপুটির কাছে নিস্তার নেই। তাই তাঁর রাউন্ডের পালা যেদিন পড়ে, সিপাহী মহলে হুঁশিয়ারির অন্ত নেই। সবাই সেদিন পুরোদস্তুর ভালো ছেলে। Everything in order. বলা বাহুল্য সেটা গগনবাবুর কাম্য হতে পারে না। তাঁর কলমের খোঁচায় দুচারটা যদি ধরাশায়ী না হল, তাঁর ডেপুটিত্ব বজায় থাকে কেমন করে? কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, সিপাহীরা ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁকে সে সুযোগ দেবে না।

একদিন এক অভিনব কৌশল এল তাঁর মাথায়। গগনবাবু জানেন, আমাদেরও অজানা নেই, রাউন্ড শেষ হলেই প্রহরীদের মধ্যে জাগে আরামের লোভ। যাক্, ফাঁড়া কাটল—বলে সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কেউ কেউ হয়তো বুট খুলে একটু আরাম করে বসে, কেউ বা খানিক গড়িয়ে নেয় কোনো গাছের নীচে কিংবা বারান্দার কোণে। সেই দুর্বল ক্ষণের সুযোগ নিলেন গগনবাবু। একটা পরিক্রমা শেষ করে আধ ঘণ্টা লুকিয়ে রইলেন আফিসে। তারপর আবার শুরু হল তাঁর দিগ্বিজয়। এবার জাল ভরে গেল মূল্যবান শিকারে। গোটা চারেক স্লিপিং, ছ'সাতটা সিটিং অ্যান্ড ডোজিং; তাছাড়া ডজনখানেক টুপিহীন মাথা আর বেল্টহীন কোমর। শাস্তির হিড়িক

পড়ে গেল পরদিন সকালের আফিসে। গগন ডিপ্‌টির কৃতিত্বে ম্লান হয়ে গেল সত্যিকার ডিপ্‌টির দল।

সেবার মাঘ মাসের মাঝামাঝি। পদ্মার তীরে খোলা মাঠের মধ্যে জেল। তার উপর উত্তর বাঙলার শীত। হাড়ের ভিতর থেকে কাঁপুনি উঠে ছড়িয়ে পড়ে দেহের প্রতি অঙ্গে। রাত সাড়ে তিনটা। চারদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার কণাগুলো ঝরে পড়ছে বৃষ্টিধারার মত, আর বিঁধে যাচ্ছে অস্থি-মজ্জায়। সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে চোখ দুটো কোনো রকমে খুলে রেখে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সিপাইএর দল। এই ভয়ঙ্কর নিশীথে, দীর্ঘ প্রাচীরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কে ও? আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা, যেন কুয়াশার সাগরে একটি ভাসমান ভেলা। সাত নম্বরের কোণ পার হতেই হাঁক দিল সতর্ক প্রহরী, আসামী ভাগতা হ্যয়। সেই ভয়াবহ বার্তা তীরের ফলার মত বিঁধল গিয়ে সকলের কানে। বেজে উঠল হুইস্‌ল্‌ এবং সঙ্গে সঙ্গে গেট-সেন্ট্রী বাজিয়ে দিল অ্যালার্ম। আশে পাশে যারা ছিল ছুটে এল লাঠি হাতে। বেগতিক দেখে 'কম্বল' ধাবমান হল। কিন্তু সিপাইরা ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। কী যে সে বলল, কারো কানে গেল না। লাঠি চলল বেপরোয়া।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কর্তারা যখন এসে পৌঁছলেন, 'কম্বল'কে তার আগেই ধরাধরি করে তোলা হয়েছে হাসপাতালের বারান্দায়। চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। চিনতে কষ্ট হয়। আর্তনাদ শুনে বোঝা গেল, কম্বলধারী পলাতক আসামী নয়, স্বনামধন্য রাউন্ডবিশারদ গগন ডিপ্‌টি।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কি বলছিলাম? আমি রাউন্ডে চলেছি। রাত দুটো বেজে পঁচিশ। খানিকটা পথ চলবার পর একবার চারদিক যখন তাকিয়ে দেখলাম, নিঃশব্দে ঝরে পড়ে গেল মুহূর্ত-পূর্বের পুঞ্জীভূত গ্লানি আর বিরক্তির বোঝা। এ কোন্‌ পৃথিবী? এর দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে উঠেছে বাসন্তী জ্যোৎস্নার রজত প্লাবন; নিস্তব্ধ রাত্রির সর্বদেহে সঞ্চার করেছে 'শোভা, সম্ভ্রম ও শুভ্রতা'। দিনের আলোয় যা কিছু ছিল তুচ্ছ ও রূপহীন, জ্যোৎস্নার মায়াস্পর্শে তাকেই দেখছি সুন্দর ও মহিমময়। ঐ চুন-বালিখসা ভাঙা বাড়িটা যেন রূপকথার রাজপুরী। ঐ কাঁটা ঝোপটা যেন মায়াকানন। হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে এল বাঁশির সুর। ক্লান্ত করুণ বেহাগের

ব্যাকুলতা। কে ও? কার হৃদয়মথিত আকুল কান্না গলিত ধারায় লুটিয়ে পড়ছে ফল্গুনী নিশীথিনীর বুকের উপর?

গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। ১২৭ ঠিক হ্যায়, হুজুর, তালা জান্‌লা সব ঠিক হ্যায়—বুট ঠুকে স-সেলাম রিপোর্ট জানাল 'দো-সে তিন্‌কা' সতর্ক প্রহরী। অর্থাৎ দুই এবং তিন নম্বর ওয়ার্ড মিলে আসামীর সংখ্যা ১২৭; এবং তারা সবাই উপস্থিত—এই কথাই জানিয়ে দিল ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডার। তাকিয়ে দেখলাম, ১২৭এর একও নেই এই দুটো ব্যারাকের কোনো কোণে। চাটাইয়ের বেড়া আর বাখারির জানালা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কয়েদীরা সব ছড়িয়ে আছে মাঠের এখানে ওখানে, মিশে গেছে অন্য সব ওয়ার্ডের বন্দীদের দলে। তবে তালাগুলো সব বন্ধ আছে ঠিকই এবং তার শক্তি পরীক্ষাও চলছে যথারীতি। দু ঘণ্টা অন্তর নতুন প্রহরী এসে শূন্য ঘরের তালা টেনে জানালা ঠুকে রিপোর্ট দিচ্ছে—সব ঠিক হ্যায়, হুজুর।

আরো এগিয়ে গেলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিদ্রিত মানুষ। মাঝে মাঝে ঠকাস্ ঠকাস্ বুটের শব্দ। সবার উপর গড়িয়ে পড়ছে অবিশ্রান্ত বাঁশির সুর। বারো নম্বরের কোণে মেহগনি গাছের তলায় একটি ছোট বাঁধানো চত্বর। তারই উপর বসে যে ব্যক্তিটি এই সুরের জাল বুনে চলেছেন, তাঁর কাছে আমার আগমন অজ্ঞাত রয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কখন এক সময়ে তাঁর পাশটিতে বসে পড়েছি এবং কখন সে সুর থেমে গেছে, কিছুই বুঝতে পারিনি। চমকে উঠলাম তাঁর কণ্ঠস্বরে—কি খবর ডেপুটিবাবু; বে-আইনী হচ্ছে, না?

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম, তা একটু হচ্ছে বৈ কি?

—বাঁশিটা কেড়ে নেবেন তো?

—নেওয়াই তো উচিত। কিন্তু নিতে পারছি কৈ?

—কেন?

—কেড়ে নেবার জোরটাই যে আপনি কেড়ে নিলেন। বড্ড কবিত্ব হয়ে গেল; কি বলেন?

—তা একটু হল। কিন্তু যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলবো এ পথে আসা আপনার ঠিক হয়নি। আপনি মিসফিট্।

আমি বললাম, ঠিক ঐ কথাটা আমিও আপনার সম্বন্ধে বলতে পারি, অনিমেষবাবু। এ রাস্তা আপনার নয়।

—কেন ?

আপনি শিল্পী, আপনি রসস্রষ্টা। আপনার পথ সুন্দরের পথ, বিরোধের পথ নয়। রাজনীতির বন্ধুর পথে আপনি ক্রমাগত হোঁচট খাবেন, অভীষ্ট সীমায় কখনো পৌঁছতে পারবেন না।

অনিমেষ চুপ করে রইলেন। আমি একটু থেমে আবার বললাম, আপনি হয়তো বলবেন, এ পথে সঙ্ঘর্ষ নেই। মহাত্মাজী শান্তিকামী। তিনি বলেছেন, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, তাঁর নীতির সঙ্গে আমাদের অসহযোগ। কিন্তু ওটা শুধু কথার মার-প্যাঁচ। আসলে ও দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই।

অনিমেষ এবারও প্রতিবাদ করলেন না। তেমনি নীরবে বসে রইলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা আপনি এদের এই অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন ?

নিঃসঙ্কোচে উত্তর এল—না।

—এদের এই খদ্দর ফিলজফি ?

—তাও করি না।

—হিন্দু মোস্‌লেম ইউনিটি ?

—না; সে বস্তুতেও আমার বিশ্বাস নেই।

আমি হেসে ফেললাম, তাহলে দেখছি, আপনার মত বিশ্বস্ত এবং অকপট সৈনিক এদের আর নেই।

অনিমেষ গাম্ভীর্য রক্ষা করেই বললেন, কারো মতবাদ নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই, মলয়বাবু। আমার কাছে মানুষের থিওরির চেয়ে অনেক বড় সেই মানুষটি। সেখানে আমার বিশ্বাস অন্ধ এবং অটল। সে-জায়গায় যদি কোনো-দিন ভাঙন ধরে, সেইদিন এ রাস্তা ছেড়ে দেবো।

ঠিক দু বছর পরের কথা। মহাত্মাজী তার আগেই হিমালয়ান ব্লাণ্ডার ঘোষণা করে সম্মুখ সমর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। যারা তাঁর এবং তাঁর অধিনায়কদের আহ্বানে স্যর আশুতোষের গোলামখানায় পদাঘাত করে বেরিয়ে পড়েছিল তাদের কানে আবার নতুন মন্ত্র বর্ষিত হচ্ছে—ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ। কিন্তু সে তপস্যা নতুন করে শুরু করবার পথ কোথায়, সে সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ নীরব। যারা ঘাটেও নহে, পারেও নহে, সেই ঘোর সন্ধ্যাবেলায় তাদের ডেকে নেবার কেউ নেই।

এমনি সময়ে একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে

গেল অনিমেষের সঙ্গে। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। চিনবারও কথাও নয়। তিনিই আমাকে ডেকে থামালেন। পরনে একটি জীর্ণ খদ্দরের পাঞ্জাবি, জুতো জোড়া তালির কল্যাণে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গায়ের উজ্জ্বল রং তামাটে। বয়স বেড়ে গেছে অন্তত দশ বছর।

বললাম, কি করছেন আজকাল? কলেজে ভর্তি হননি?

—কই আর হলাম? মা মারা গেলেন। দুটো বড় বড় বোন গলার ওপর। আর একটা ছোট ভাই। চাকরি খুঁজছি।

—চাকরিই যখন করতে চান, বি. এ.টা পাশ করলে সুবিধা হত না?

অনিমেষ হেসে বললেন, পাশ করতে চাইলেই তো আর করা যায় না। তাছাড়া, পাশ করেই বা আর কি লাভ হত? স্বদেশী মামলায় জেল খেটেছি শুনে সবাই দরজা দেখিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট অফিসে তো বটেই, মার্চেন্ট্ অফিসগুলো পর্যন্ত। আপনার খোঁজে আছে না কি কিছু? পনের কুড়ি— যা দেয়, তাতেই রাজী আছি।

—আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

ঠিকানা লিখে দিয়ে অনিমেষ আবার জনারণ্যে মিলিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই অনিমেষ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তার বিধবা মায়ের এবং দু-তিনটি নিঃসহায় ভাইবোনের একমাত্র ভরসাস্থল। মার একান্ত কামনা ছিল, ছেলে বিদ্বান্ হবে, মানুষ হবে, সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এই আশা নিয়েই তিনি তাঁর শেষ সম্বল ছেলের কল্যাণে নিঃশেষ করেছিলেন। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। ছেলে কলেজ ছেড়ে আশ্রয় নিল জেলে, আর মায়ের আশ্রয় হল শয্যা। সে আশ্রয় আর তাঁর ঘুচল না। তারপর একদিন সংসার থেকে তিনি বিদায় নিলেন, সম্ভবত বিনা চিকিৎসায়। রেখে গেলেন দুটি নিরাশ্রয়া অনূঢ়া কন্যা আর একটি সহায়বিহীন শিশুপুত্র। একটি ভদ্র শিক্ষা-মার্জিত সুখী পরিবার বন্যার জলে ভেসে চলে গেল।

অনিমেষ একটা দুটো নয়। এমনি হাজার হাজার অনিমেষ এবং তাদের মুখাপেক্ষী আরো কয়েক হাজার নর-নারী শিশু এইভাবেই সেদিন তলিয়ে গেছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙলার ঘরে ঘরে। কে তার জন্যে দায়ী? যাঁরা রাজনীতির উচ্চ মঞ্চে বিচরণ করেন, তাঁরা হয়তো বলবেন, এরা সব স্বাধীনতার বলি। বৃহৎ সাফল্যের স্রোতের মুখে এই সামান্য ক্ষতি তৃণের মতই ভেসে গিয়ে থাকে সকল দেশে, ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে। স্বাধীনতা-

কামী পরপদানত দেশের এইটাই একমাত্র পরিণাম। অস্বীকার করি না। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের গভীর তাৎপর্য মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনিমেষের অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানা এবং তাকে ঘিরে তিনটি অ-দৃষ্ট, অপরিচিত ও অসহায় কিশোর-কিশোরীর ম্লান মুখ বারংবার চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করা হল না। অনিমেষের সেই "অন্ধ বিশ্বাস" কি আজও অটুট আছে? একটা ক্ষুদ্র ফাটলও কি দেখা দেয়নি কোনোখানে?

[বারো]

অফিসে এসে দেখলাম, ব্যস্ততা দেখাবার মত উপকরণ টেবিলে বিশেষ কিছু সঞ্চিত নেই। অগত্যা ডাকের ফাইলটা টেনে নিয়ে উলটে পালটে দেখছিলাম। তাও এক সময়ে শেষ হয়ে গেল। তখন সব শেষের চিঠিখানার দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলাম।

গুন গুন করে কীর্তন ভাঁজতে ভাঁজতে হৃদয়বাবুর প্রবেশ। হেলমেটটা ব্রাকেটে ঝুলিয়ে দিয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন এবং বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষয়টা যেন অত্যন্ত জটিল বলে মনে হচ্ছে, মলয়বাবু। কী ওটা Differential Calculus না Law of Relativity?

আমিও গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, তার চেয়েও জটিল।

—যথা?

—নোটিশ পাওয়া গেল, মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবেন না; পর্বত মহাশয় অভিযান করছেন মহম্মদের দরবারে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, ফিঙ্গার-প্রিন্ট কেসের আসামী ভূপেশ সেনের বিচার হবে জেলে। এস. ডি. ও. লিখেছেন কোর্টের আয়োজন করতে।

হৃদয়দা বললেন, এর মধ্যে জটিলতাটা দেখলেন কোথায়?

বললাম, বিষয়টা তলিয়ে দেখুন। বিচারপ্রার্থী বন্দী প্রকাশ্য বিচারশালায় দাঁড়াবার অধিকার পেল না—

বিচারক নেমে এলেন তার বিচার করতে জেলখানায়, কেমন?—যোগ করলেন হৃদয়বাবু।

আমি বললাম, তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন, এর মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে, যার নাম administrative necessity.

—সেইখানেই তো আমার আপত্তি। শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন যখন বিচারের আদর্শকে ডিঙিয়ে যায়, তখন আর যাই হোক, কোর্টের মর্যাদা রক্ষা পায় না। শাসনদণ্ডের কাছে মাথা নোয়ালো ন্যায়দণ্ড; এর চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে?

—আপনি বড্ড বেশী তলিয়ে গেছেন, মলয়বাবু।

—না, হৃদয়দা, আমি একেবারে সারফেস্ থেকে দেখছি। সবাই জানে, আসামী যতক্ষণ বিচারাধীন, আইনের চোখে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ব্রিটিশ ল'এর এই হচ্ছে গোড়াকার কথা। তার দোষমুক্তি প্রমাণের ভার তার নিজের ওপরে নয়, অভিযোক্তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে অপরাধী। অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে সমর্থন করবার তার যে মৌলিক অধিকার, সেটা হবে নিরঙ্কুশ, এবং তার জন্যে তাকে দিতে হবে পরিপূর্ণ সুযোগ আর অবাধ সুবিধা। এই জেলের মধ্যে তার কোন্‌টা সম্ভব, বলুন?

হৃদয়দা প্রতিবাদ করলেন না। অনুকূল শ্রোতা পেয়ে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল এবং তারই ঝোঁকে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। শেষটায় বললাম, ইংরেজ পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে—অনুপম সাহিত্য, সুগভীর দর্শন এবং মহাশক্তিশালী জড়বিজ্ঞান। কিন্তু আমার মনে হয় তার সব অবদানকে ছাড়িয়ে গেছে একটা জিনিস, যাকে বলা যেতে পারে Rule of law. ব্যক্তির চেয়ে বড় বিধান এবং তারই কাছে নির্বিচারে মাথা নোয়াবে প্রাইম মিনিস্টার থেকে টম্, ডিক্, হ্যারি,—এটা হল British Jurisprudence-এর প্রথম কথা। অন্য দেশে যান। বেশী দূরে নয়, ইংলিশ চ্যানেল পার হলেই দেখবেন, অত বড় Revolution-এর জন্মভূমি যে ফ্রান্স, সেখানেও আইনের চোখে সব মানুষ সমান নয়। সেখানে রাজপুরুষদের জন্যে বিশেষ আইন, তাদের বিচারের জন্যে স্বতন্ত্র বিচারশালা। একজন সাধারণ ইংরেজের চোখে সেটা শুধু বিসদৃশ নয়, অন্যায়। সাম্রাজ্যের স্বার্থ সেই ইংরেজকে আজ কোথায় টেনে নামিয়েছে!

বক্তৃতার নেশায় লক্ষ্য করিনি যে হৃদয়বাবুর পদযুগল ইতিমধ্যে কখন

টেবিলের তলা থেকে উপরে প্রমোশন লাভ করেছে। দেহের ভঙ্গী অর্ধশয়ান, চক্ষু মুদ্রিত এবং হস্তে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

—ঘুমুলেন নাকি, হৃদয়দা?

—ঘুমুতে আর দিলেন কই?

—একদম ঝিম ধরে গেলেন যে? সাড়া-শব্দ দিন।

হৃদয়বাবু টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে এবার সোজা হয়ে বসলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এত গভীর যে কোনো রকম মন্তব্য করে বাচালতা প্রকাশ করবো না। আপনার বক্তৃতা শুনে অন্য একটা কথা মনে হল। তাই শুধু বলবো। সেটা আমার একটা থিওরি। শুনে আবার হাসবেন না তো?

বললাম, যদি হাসি, বলতে হবে আপনার থিওরি সার্থক। পৃথিবীতে বেশীর ভাগ থিওরিই তো কেবল চোখের জলের সৃষ্টি করে গেছে।

হৃদয়বাবু একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, আজ হোক, কাল হোক, ইংরেজকে একদিন জাল গুটিয়ে সরে পড়তেই হবে। সেদিন যদি বেঁচে থাকি, পেনশন তো পাবো না নিশ্চয়ই; অথচ পেটের সংস্থান তো করতে হবে। তাই ঠিক করেছি একখানা ইস্কুল-পাঠ্য ইতিহাস লিখবো। তাতে একটা অধ্যায় থাকবে—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। কি কারণ? উত্তর—ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন। ইংরেজের সঙ্গে সত্যিকার বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ করে থাকে, সে তার নিজের ভাষা। থিওরিটা মনঃপুত হল না, কি বলেন?

আমতা আমতা করে বললাম, কেমন যেন বোধগম্য হচ্ছে না।

হৃদয়বাবু এবার নড়ে চড়ে বসে বললেন, ভেবে দেখুন তো একবার, ১৮৫৭ সালের পর ওদের রাজত্বের ভিত যখন পাকাপোক্ত হয়ে বসল, কত আশা করে এই ভাষাকে ওরা নিয়ে এসেছিল সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে! উদ্দেশ্য কি? একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার। ভেবেছিল, এর কয়েকটা ডোজ পেটে পড়লেই নেটিভের প্রাণে রাজভক্তির বান ডেকে যাবে। বশংবদ কেরানী সরবরাহের অভাব হবে না কোনোদিন। সেদিকে ওরা ভুল করেনি। কিন্তু কে জানি, কোথায় ছিল একটুখানি হিসেবের গোল। তাই ইংরেজি ইস্কুলের কারখানা থেকে কাতারে কাতারে কেরানী যেমন তৈরি হল, তার সঙ্গে বেরোল আর একরকম জীব, আপনাদের ইকনমিকসের ভাষায় যাকে বলে by-product; অর্থাৎ কয়লার খনি থেকে যেমন বেরিয়ে আসে দু-চারখানা

মল হীরে। এদের চেহারা একেবারে আলাদা। ডোজ-মাপা বিদ্যার বরাদ্দ-কু পান করেই তারা ক্ষান্ত হল না, নিঃশেষে শুষে নিল পশ্চিম দিগন্তের বপন্ন জ্ঞান-ভাণ্ডার; এবং তারই জোরে মোক্ষম আঘাত দিল সাম্রাজ্যের বুকের ওপর। এদের চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই। এরাই হচ্ছে আপনার ঐ গোখ্‌লে, গান্ধী, সুভাষ, প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন, জওহরলালের দল—কেরানী-ফ্যাকটরির মারাত্মক by-product, ইংরেজি পণ্ডিতের গুরুমারা চেলা। টোল বা মক্তব থেকে এদের জন্ম হত না কোনোদিন।

শুধু কি এরাই?—বলে চললেন হৃদয়বাবু, আমার মনে হচ্ছে ফ্যাকটরি থেকে আসল মাল আর বেরোচ্ছে না। আজকাল যা কিছু আসছে, সবই ঐ by-product. তফাত শুধু প্যাকিং মোড়কটার। কোনোটা খদ্দর কোনোটা আব্যর খাকী—

বলে তিনি চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে একটু বিশেষভাবে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি আপসোস করছিলেন না?—সেই ইংরেজ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! আপসোস আমারও হয়। তবে সেটা অন্য কারণে—কী ওরা চাইল, আর কী ঘটল! লোকে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে। ওরা বাঁদর গড়তে শিব গড়ে ফেলল। বানাতে গেল আরো গোটা কয়েক হৃদয় সামন্ত, কপাল-দোষে সেগুলো হয়ে গেল মলয় চৌধুরী।

হৃদয়দা নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন। খোদা বকস্‌, মোয়াজ্জেম হোসেন আরও কে কে তখন ঘরে ঢুকছে।

—কি খবর হৃদয়দা, বড্ড ফুর্তি যে আজ?

—আরে ভাই, বল কেন? এত কষ্ট করে একখানা নতুন গান লিখলাম, তা মলয়বাবুর মোটেই পছন্দ হল না। মুখখানা কি রকম তেলো হাঁড়ি করে বসে আছেন, দ্যাখ।

মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, কি গান লিখলেন, আমরা একটু শুনতে পাইনে?

হৃদয়বাবু চাপা গলায় কীর্তনের সুরে গাইলেন,

প্রভাতে উঠিয়া
হুঁকা হাতে নিয়া
কানু কহিলেন, রাই গো,
তোমার মালসাতে কি আগুন আছে?

একটা হাসির রোল উঠল।

কোর্ট বসল সুপারের ঘরে।

হাকিম সদ্য আমদানি ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। বেশভূষায় চেষ্টাকৃত তাচ্ছিল্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। পাইপ সংযোগে দুর্বোধ্য ভাষাকে অধিকতর দুর্বোধ্য করবার যে মানব-সুলভ প্রচেষ্টা, তাতে এখনো পুরোপুরি দক্ষ হয়ে ওঠেননি। আসামী ভূপেশ সেন স্বদেশী মামলায় জেল খাটছে কিন্তু পুলিশের বিশ্বাস, ওটা তার একটা গৌরবময় আবরণ। আসলে সে অন্ধকারের জীব। অতএব কর্তৃপক্ষের হুকুম এল, তার আঙুলের ছাপ দিতে হবে পুলিশের খাতায়। ভূপেশ করল যথারীতি অস্বীকার। তারই জের এই মামলা।

হাকিম তাঁর নবলব্ধ বাঙলায় প্রশ্ন করলেন, টুমি টিপ্ ডিটে অস্বীকার আছো?

ভূপেশ দু বগলে হাত পুরে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যাজিস্ট্রেট সুর চড়িয়ে বললেন, জবাব ডাও।

ভূপেশ নিরুত্তর। কোর্ট ইনস্পেক্টর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সেদিকে ফিরে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, Is your accused deaf and dumb, Inspector ?

I am examining him, Your Honour. ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলেন ইনস্পেক্টর। তারপর ভূপেশের দিকে ফিরে বললেন, কি মশাই, হাকিম কি বলছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?

ভূপেশ জবাব দিল ইংরাজিতে, পাচ্ছি। আপনার সাহেবকে বুঝিয়ে দিন, ভদ্রলোকের কাছ থেকে জবাব পেতে হলে প্রশ্নের ভাষাও ভদ্র হওয়া দরকার।

হোয়াট!—রুখে উঠলেন সাহেব। কিন্তু এবার প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, আমি জানতে চাই তুমি টিপ্ দেবে কিনা?

ভূপেশ জবাব দিল, না।

—না দিলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

ভূপেশ হেসে বলল, বৃথা আস্ফালন না করে, সেটা চটপট দিয়ে ফেললেই তো পার।

এমনি করে চলল কিছুক্ষণ বাদানুবাদ—একে আই. সি. এস.—এস. ডি. ও.

তায় নবাগত। কালা আদমির ঔদ্ধত্য সহ্য করবার কথা নয়, অভ্যাসও হয়নি। তিনি যে কোর্ট একথা সম্ভবত মনে রইল না। হঠাৎ হুকুম দিয়ে বসলেন, Take his finger-impression by force.

ইনস্পেক্টর ইতস্তত করতে লাগলেন। জোর করে টিপ্ নেওয়া যদি চলত, তাহলে আর এত মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজন ছিল কি?

সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। বিকট চীৎকার করে উঠলেন, পাকড়ো উসকো। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে ভূপেশকে ধরতেই সে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হুঙ্কার দিল—'বন্দে মাতরম্'।

—শাট্ আপ্, ইউ স্কাউন্ড্রেল!—গর্জে উঠলেন এস· ডি· ও·।

উত্তর এল পাল্টা গর্জন—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!

জেলের ভিতর থেকে শত কণ্ঠে উঠল তার প্রতিধ্বনি—মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!

সাহেবের লাল মুখ থেকে মনে হল রক্ত ফেটে পড়বে, আর চোখ থেকে ঠিকরে পড়বে আগুন। নীচের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরে একবার তাকালেন ভূপেশের দিকে। মুহূর্তে সে দৃষ্টি নেমে এল টেবিলের উপর। সেখানে পড়েছিল তাঁর হান্টার। হঠাৎ সেটা তুলে নিয়ে সপাং করে বসিয়ে দিলেন আসামীর উদ্ধত কপালে। ভূপেশ ঘুরে পড়ে গেল এবং দু-হাতে কপাল চেপে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলে উঠল, মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়।

পঁচিশ হাত দূরে জেল গেট। খবর পৌঁছতে লাগল পঁচিশ সেকেন্ড। তারপর শুরু হল তাণ্ডব। গেট রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল গেট-কীপারের পক্ষে। উপায়ান্তর না দেখে সে বাজিয়ে দিল পাগলা ঘণ্টী। ফতুয়া গায়ে চটি পায়ে ছুটে এলেন জেলর সাহেব। আর তার পিছনে ততোধিক বিচিত্র বেশে আমরা, তাঁর অনুচরবৃন্দ। রাইফেলধারী স্কোয়াড গেট পার হয়ে থেমে গেল। সমস্ত রাস্তা জুড়ে লাইন করে বসে আছে বন্দীর দল। 'বন্দে মাতরম্' থেমে গেছে; কিন্তু সবারই মুখে উৎকণ্ঠা, চোখে উত্তেজনা। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রথম লাইনে, গেটের ঠিক সামনেটায়। তাদেরই একজনকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন তালুকদার সাহেব. ব্যাপার কি বরেনবাবু?

ক্ষীণকায় বরেনবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ব্যাপার তো দেখতেই

পাচ্ছেন। গুলি চালান, রাস্তা সাফ হয়ে যাবে। একটাকে তো ওদিকে সাবাড় করে এলেন।

—কাকে আবার সাবাড় করলাম? বলছেন কি আপনি!

বরেনবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, আকাশ থেকে পড়লেন যেন মনে হচ্ছে। ভূপেশ সেন খতম—সে সুসংবাদ কি জানা নেই আপনার?

ভূপেশ সেন খতম!—সত্যই আকাশ থেকে পড়লেন তালুকদার। ফোর্স ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং গেটের বাইরে আসতে ডিস্‌মিস্‌ করবার হুকুম দিলেন। সবাই মিলে ছুটে গেলাম আফিসে। কোর্টের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। হাকিম, পেস্কার, ইনস্পেক্টার, সিপাহী সব যেন ভোজবাজির মত উড়ে গেছে। মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে আসামী ভূপেশ সেন। কপালের ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দু-চারজন জেলের লোক। ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তুলো আর ওষুধ নিয়ে। পিছনে স্ট্রেচার হাতে দু-জন সাধারণ কয়েদী।

ঘটনা যা ঘটবার ঘটে গেল। আমাদের কাজ হল রিপোর্ট দেওয়া। সে রিপোর্টের ভাষা কতটা জোরালো হলে জেলের তরফ থেকে উপযুক্ত প্রতিবাদ জানানো হবে, অথচ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ক্রোধের উদ্রেক হবে না, এইটাই হল বিবেচনার বিষয়। প্রথম দিকটার উপর জোর দিলেন স্বল্পাভিজ্ঞ সুপার, যুদ্ধপ্রত্যাগত উষ্ণরক্ত ক্যাপ্টেন, মর্যাদা সম্বন্ধে যিনি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন; আর দ্বিতীয় বিষয়টা বিশেষভাবে আঁকড়ে রইলেন বহুদর্শী, শীতল-শোণিত, প্রৌঢ় জেলর, প্রেস্টিজের ফাঁকা বুলি যার কাছে একেবারেই অর্থহীন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়ে রিপোর্টের মুসাবিদা যখন ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় সাইকেল মারফত সুপারের নামে জরুরী চিঠি এসে উপস্থিত। এস· ডি· ও· সাহেব লিখছেন, একটা বেয়াড়া এবং বিপজ্জনক আসামীকে দমন করবার জন্যে কোর্টের মধ্যেই কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল। জেল-সুপারের আফিসে বসে এই অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে বলে তিনি ক্ষমা চাইছেন এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছেন।

ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি চিঠিখানা তালুকদার সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, লোকটা একেবারে কাঁচা। ইটনের গন্ধ এখনো মুখ থেকে যায়নি, দেখছি। নিজের মৃত্যুবাণ পাঠিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে,—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ব্যানার্জির উল্লসিত হবার কারণ ছিল। এই ক'দিন আগেই ক্লাবের পানশালায় তার মিলিটারী কৌলিন্যের প্রতি অমার্জনীয় তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে এই অর্বাচীন এবং উন্নাসিক সিভিলয়ান। সেই আক্রোশের জ্বালা মেটাবার সুযোগ উপস্থিত।

চিঠিখানা পকেটস্থ করে বিজয়ীর আনন্দ নিয়ে তিনি ছুটলেন এই ছোট হাকিমের উপরওয়ালা বড় হাকিম অর্থাৎ স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে। সে তক্তে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনিও বিলাতী সিভিলিয়ান। কিন্তু তফাত অনেক। তাঁর মুখে ইটন বা অক্সফোর্ডের গন্ধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, উগ্র হয়ে উঠেছে খাঁটি এবং পুরোদস্তুর "ভারতীয়" গন্ধ। তাঁর তাম্রাভ দেহ-চর্মে এবং কেশ-বিরল মস্তকে দেশী সূর্যের সুদীর্ঘ প্রভাব সুস্পষ্ট। চিঠিখানা তিনি নিঃশব্দে পাঠ করলেন এবং ধীরভাবে পকেটে পুরলেন। তারপর ঘটনা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস গ্রহণ করে বিনয় ও সৌজন্যে বিগলিত হয়ে বললেন, আপনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। এসব অপ্রিয় ব্যাপারে আপনাকে আর বিব্রত হতে হবে না। বাকী যেটুকু আমার হাতেই ছেড়ে দিন। যা কিছু করবার, আমিই করবো, বলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ব্যানার্জির দিকে। ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হল না। সুপার সাহেব কলের পুতুলের মত সেই প্রসারিত হাতখানায় কোনো রকমে একটা দোলা দিয়ে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন। 'মৃত্যু-বাণের' পরিণাম যে এই দাঁড়াবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি।

প্রতিশ্রুত "অ্যাকশনে" বিলম্ব হল না। যথারীতি এন্‌কোয়ারি কমিটি নিযুক্ত হল। মেম্বর দুজন—ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে রইলেন কারাবিভাগের বড়কর্তা, ততোধিক ঝানু এবং পক্ককেশ শ্বেতাঙ্গ আই. এম. এস্‌। যথাসময়ে তাঁরা দর্শন দিলেন আবার সেই সুপারের ঘরে।

প্রথম আলোচনার বিষয় হল, মেডিক্যাল সাক্ষ্য। রিপোর্ট রয়েছে দুখানা। প্রথমটা দিয়েছেন ক্যাম্‌বেল-ফেরত এস্‌. এ. এস্‌.। দ্বিতীয়টা, লড়াই-ফেরত আই. এম্‌. এস্‌.। একজন নগণ্য জেল ডাক্তার; আর একজন মহামান্য সিভিল সার্জন। তাঁদের মতের পার্থক্যও পদানুরূপ। আমাদের ডাক্তার লিখেছেন, ক্ষতের পরিমাণ তিন ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি গভীর। সম্ভবত লাঠি বা ঐ জাতীয় কোনো কঠিন বস্তু দ্বারা আঘাতের ফলে তার উৎপত্তি। সিভিল

সার্জনের মতে, আঘাতের পরিধি এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ½ ইঞ্চি প্রস্থ; উৎপত্তির কারণ —কোনো কঠিন বস্তুর উপর আকস্মিক পতন।

জেল-ডাক্তারকে তলব করা হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দুখানা রিপোর্টই তার হাতে দিয়ে বললেন, এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?

ডাক্তার বললেন, নো স্যার।

ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে আপনি ক্ষত পরীক্ষা করেছিলেন ২৪ তারিখে, আর সিভিল সার্জন করেছেন ২৫ তারিখে। একদিনের ব্যবধানে কোনো আঘাতের এতখানি উন্নতি হতে পারে বলে, আপনি মনে করেন? ডাক্তার জানালেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছুই বলবার নেই। ইন্সপেক্টর-জেনারেল বললেন, আপনার রিপোর্ট থেকে এই সিদ্ধান্তই আমাদের করতে হচ্ছে যে, হয় আপনার সাধারণ জ্ঞানের অভাব, নয়তো আপনি সরকার-বিরোধী কোনো প্রভাবের অধীনে পরিচালিত হয়েছিলেন।

ডাক্তার বললেন, সে সম্বন্ধেও তাঁর কোনো বক্তব্য নেই।

আমাদের আফিসের দুজন কেরানী ছিল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সুপারের আদেশে তাদের একটা জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল এবং সে-কাজটা পড়েছিল আমার উপর। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেছিল। সুতরাং বিবৃতির ভাষাটাও ছিল অনুরূপ জোরালো। তার একটা নকল কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছিল। সুতরাং কেরানী-দ্বয়ের ডাক পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, আপনারা কদ্দুর লেখাপড়া করেছেন?

একজন বলল, সে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে, আর একজন জানাল, সে আই. এসসি. পাশ করেছে।

—তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, এ বিবৃতি আপনাদের নয়?

—আজ্ঞে, ওটা আমাদেরই স্টেটমেন্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট বিস্ময়ের সুরে বললেন, এরকম ইংরেজি আপনারা বলতে বা লিখতে পারেন?

তারা জানাল, আমরা বাংলায় বলেছি; ডেপুটি জেলর মলয়বাবু সেটা ইংরেজিতে তর্জমা করে লিখেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ওঃ তাই বলুন। মলয়বাবু ঠিকমত তর্জমা করলেন কিনা, সেটা অবশ্যই আপনাদের জানবার কথা নয়।

কেরানীদ্বয় নিরুত্তর।

সকলের শেষে এলেন কোর্ট-ইন্সপেক্টর। আসামীর আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে বললেন, কেস সম্বন্ধে হাকিমের সঙ্গে আসামীর দু-চারটে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল। হঠাৎ লোকটা আস্তিন গুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এস. ডি. ও. সাহেবের ওপর। আমরা তখনো এগিয়ে যেতে পারিনি। হাকিম উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে এমনি করে ঠেকাতে গেলেন। তাঁর হাতে লেগে আসামী ছিটকে পড়ল ঐ ধারে। ওখানে ছিল একটা টেবিল। বোধ হচ্ছে ঐ টেবিলটাই হবে। ওরই কোণে লেগে একটুখানি কেটে গেল কপালের এই ডান দিকটায়।

কমিটির মেম্বারদ্বয় পরস্পরের দিকে তাকালেন। উভয়ের মুখেই ফুটে উঠল একটা নিশ্চিন্ত তৃপ্তির ভাব। মনে হল, এতক্ষণ তাঁরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। ইন্সপেক্টর তাঁদের আলোকের সন্ধান দিয়ে রক্ষা করলেন।

কমিটির রায় আপাতত মুলতুবি রইল। কিন্তু তাঁদের আসন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না।

সাহেবরা চলে গেলে ইন্সপেক্টরও যাবার আয়োজন করছিলেন। জেলর সাহেব ডেকে বললেন, এত তাড়া কিসের? আসুন না, একটু চা খাওয়া যাক। ছোকরাদের মধ্যে কে একজন বলল, হ্যাঁ; বড্ড পরিশ্রম গেল আপনার। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন, স্যার।

সুধাংশু বলে উঠল, সত্যি একখানা সীন যা দেখলাম; তার মধ্যে আবার সবচেয়ে সেরা পার্ট আপনার। বিবেকটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, দাদা?

কে একজন বলল, দাদার ওসব বিবেক-টিবেকের বালাই নেই।

জেলর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করলেন। একটু ধমকের সুরে বললেন, থামনারে বাপু।

ইন্সপেক্টর কিন্তু বিরক্তির লক্ষণ দেখালেন না। চায়ে চুমুক দিয়ে হাসিমুখেই বললেন, বলতে দিন। ছেলেছোকরাদের কথা গায়ে মাখলে চলে না।

একটু থেমে চায়ের কাপে আরো গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে বললেন, বিবেকের কথা কে বলছিলে, ভাই? তুমি? "তুমি" বলছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন।

—না, না। মনে করবো কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

ইন্সপেক্টর সিগারেট ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়ে বললেন, সত্য-নিষ্ঠা, মহানুভবতা—ইত্যাদি বড় বড় বুলি তোমাদের বয়সে আমরাও অনেক ঝেড়েছি। তারপর দেখলাম, ওগুলো ঐ স্বদেশীওয়ালাদের খদ্দরের ঝোলাতেই মানায় ভাল। যারা কাজের লোক, অর্থাৎ সংসারে যাদের উপার্জন করে খেতে হয় এবং দশজনকে খাওয়াতে হয়, তাদের ওসব বালাই থাকলে সত্যিই চলে না। চাকরি যখন করতে হবে, তখন একমাত্র লক্ষ্য হবে উন্নতি, অর্থাৎ মনিবকে খুশী রাখা। গোটা দুই মিছে কথা বলে যদি সে কাজটা হাসিল করা যায়, দোষের তো কিছুই দেখি না।

সুধাংশু বলল, এ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন দাদা। আপনার উন্নতি মারে কে? প্রমোশন বলুন, খেতাব বলুন সব আপনার হাতের মধ্যে।

এসব কথার কোনো জবাব না দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, তোমাদেরও বলি, এ পথে যখন এসেছ, এই পথ ধরেই চল। দু নৌকায় পা দিও না। হঠাৎ একদিন কোথায় তলিয়ে যাবে, টেরও পাবে না। ঐ বিবেকের বোঝা সেদিন কোনো কাজেই লাগবে না।

হৃদয়বাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল, জেলের পাশে একটা খেজুর গাছের ঝোপ ছিল, তারই এক কোণে।

—এখানে বসে কি করছেন, দাদা?

—ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

—ভাবছি, আমার ইতিহাসখানা এবার আরম্ভ করা দরকার।

—এত শীগগির?

—শীগগির কোথায় দেখছেন? ওদের তো হয়ে গেল। ঘুণে-ধরা বাড়ি ভেঙে পড়তে আর দেরি নেই।

—ভেঙে পড়বে! ঐ ইন্সপেক্টরের মত লোহার পিলার ওদের কত আছে তার খবর রাখেন?

—যতই থাক, তবু আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দিন ওদের ঘনিয়ে এসেছে। ভীরুর রাজত্ব বেশিদিন টেঁকে না, মলয়বাবু।

—ভীরু!

হৃদয়বাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, ভীরু নয়? তের বছর আগেকার

কথা স্মরণ করুন। ১৯১৯ সাল। নিরীহ চাষাভুষা, অসহায় নারী আর অবোধ শিশুর রক্তে ভেসে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ। আমরা যেমন করে ইঁদুর মারি, ঘরের নর্দমা বন্ধ করে ঠেঙিয়ে, ওরা তার চেয়েও অনায়াসে গুলি করে মারল মানুষ। গুলি করতে যাদের পারলো না, তাদের পিঠে ভাঙল চাবুক। লাজপত রায়কে ধরে বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রকাশ্য রাজপথে এমনি দিনের বেলায়। তারপরে এল এমনি ধারা এক কমিশন। মনে আছে কি বলেছিল জেনারেল ডায়ার? বুক টান করে বলেছিল, হাঁ, আমি মেরেছি এবং বেশ করেছি। আরো মারতাম যদি গুলি ফুরিয়ে না যেত।

তার পেছনে এসে দাঁড়াল মাইকেল ওডায়ার। বললে, Dyer is right. তারি প্রতিধ্বনি উঠল পার্লামেন্টে, উঠল ওদের প্রেসে এবং অসংখ্য সভা-সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে। ভেবে দেখুন একবার বুকের পাটা! আমাদের রাজ্য; আমরা যেমন করে পারি শায়েস্তা করবো। এই তো পুরুষের মত কথা। আর আজ? সামান্য একটা লাঠির খোঁচা মুছে ফেলবার জন্যে কী রকম হিমশিম খেয়ে গেল এতগুলো জাঁদরেল আই. সি. এস. আর আই. এম. এস.-এর গোষ্ঠী। ইনস্পেক্টরকে শিখণ্ডি খাড়া করে লুকিয়ে রইল জঘন্য মিথ্যার ধামা মাথায় দিয়ে। কি জন্যে? না, গোটাকয়েক নিরীহ কাগজ-ওয়ালার বাক্যবাণের ভয়ে।

হৃদয়বাবুর কণ্ঠে এই ঝাঁজ এবং তাঁর সদাপরিহাসদীপ্ত মুখে এইরকম তীব্র ঘৃণার কুঞ্চন কোনোদিন দেখিনি। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। উনি তেমনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন, জানেন মশাই, ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী একদিন দম্ভভরে এদেরই নাম দিয়েছিলেন স্টীল ফ্রেম। সে স্টীলের আর জোর নেই। তার আগাগোড়া মরচে ধরে গ্যাছে। অত বড় জাতটার গোটা মেরুদণ্ডটাই বেঁকে গেছে। রাজদণ্ড বইবার শক্তি আর নেই।

তাই তো বলছিলাম, এবার আমার বই শুরু না করবার আর কারণ দেখি না। হ্যাঁ, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ বলুন।

হৃদয়দা অনুনয়ের সুরে বললেন, আপনার জানাশুনো হোমরা ব্যক্তি দু-চারজন নিশ্চয়ই আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তলায়। একটু তদ্বির টদ্বির করবেন, ভাই। বইখানা যেন আমরা উতরে যায়।

[তের]

বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর চরম লক্ষ্য যেমন শ্রীবৃন্দাবন, আমাদের অর্থাৎ কারা-সেবকযাত্রীর পরম তীর্থ তেমনি সেন্ট্রাল জেল। ডিস্ট্রিক্ট আর স্পেশ্যাল জেলগুলো যেন ওয়েসাইড স্টেশন। সেন্ট্রাল হল টার্মিনাস। এখানে এলে মনে হবে, হ্যাঁ, এইবার এসে পড়েছি। আমার প্রথম মনিব মোবারক আলি তাঁর ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যটির দিকে তাকাতেন আর বলতেন, আরে ছ্যা, এ আবার একটা জেল! চাকরি করা গেছে বটে সেই অমুক সেন্ট্রাল জেলে। কর্নেল ম্যাকফারসন্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গণপতি সান্যাল জেলর। সে সব দিন —ইত্যাদি। বলতে বলতে চোখ দুটো তাঁর সজল হয়ে উঠত। মুখের উপর দীপ্ত আলো ফুটিয়ে তুলত সেই কটি গৌরবময় দিন, আলি সাহেবের জীবনে যারা এনেছিল "পরম লগন।" কোনো দুর্বল মুহূর্তে একদিন তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। রাজত্ব নয়, মন্ত্রিত্ব নয়, জমিদারি জায়গীরদারিও নয়, কোনো একটি সেন্ট্রাল জেলে জেলরের উচ্চাসন। কিন্তু হায়! এ আশা তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়নি। থাক সে কথা।

"স্বদেশী স্পেশ্যাল" থেকে সেন্ট্রালে যেদিন প্রথম এলাম, মনে হল দীনেশ পণ্ডিতের গ্রাম্য পাঠশালা থেকে আর একবার শহরের মিশনারী ইস্কুলে পড়তে এসেছি। এলোপাথাড়ী হট্টগোলের এলাকা শেষ হল। ঢুকলাম এসে সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ নিয়মের রাজ্যসীমায়। দুধারে সুবিন্যস্ত পুকুর, বাগান, ফুলের কেয়ারী। এখানকার যারা অধিবাসী, তাদের পোশাক অভিন্ন। জাঙ্গিয়া কুর্তা, কোমরে গামছা, মাথায় টুপি। তারা "ফাইলে" চলে, ফাইলে বসে, ফাইলে খায় এবং ফাইল করে ঘুমোয়। এদের দৈনন্দিন জীবন কতগুলো প্যারেডের সমাহার—ল্যাট্রিন প্যারেড, বেদিং প্যারেড, ফীডিং প্যারেড, ওয়াশিং প্যারেড আরো কত কি প্যারেড। সুদক্ষ সেনানায়কের মত এই প্যারেডগুলো চালনা করে যেসব কয়েদি—তাদের নাম মেট। তাদের পরনে কুর্তার বদলে কোট, কোমরে

চাপরাশ, পায়ে স্যান্ডাল্। এই মেট-গোষ্ঠীই হচ্ছে কারা-শাসনের স্টীল-ফ্রেম, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে বৃহৎ বৃহৎ জেলের ডিসিপ্লিন। আহারে, বিহারে, কর্মে এবং দুষ্কর্মে সাধারণ কয়েদির জীবনযাত্রা এই মেট-রাজতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা মেটের ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, মেটের ডাকে জাগে।

সেন্ট্রাল জেলের রাষ্ট্রতন্ত্রে সুপারের যে Sovereignty বা পূর্ণাধিপত্য, সেটা হচ্ছে de jure. ডি ফ্যাকটো অধীশ্বর যিনি, তাঁর নাম চীফ হেডওয়ার্ডার বা বড় জমাদার। মেট-রাজতন্ত্রের তিনিই কর্ণধার এবং তাঁরি হাতে আসল শাসনদণ্ড। সুপারের হাতে যে শাসন, সেটা হচ্ছে Rule of Law, আর চীফের হাতে যে শাসন তার নাম Rule of Awe. প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা যে অনেক বেশী কার্যকরী, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মুরুব্বি মহলে দ্বিমত নেই। লাঠির মাহাত্ম্য যে কতখানি জীবন্ত এইখানে এসেই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, এবং সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠি-প্রশস্তি গেয়ে গেছেন, এ যুগেও তার মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি পাওয়া যাবে না।

কারারাজ্যের প্রধান বিভাগ দুটি—General Department বা সাধারণ বিভাগ, আর Manufactory Department বা উৎপাদন বিভাগ। প্রথমটির উপর ন্যস্ত রয়েছে তার শাসকমণ্ডলীর পরিবহন এবং শাসিত বাহিনীর পরিচালন, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ডিসিপ্লিন। দ্বিতীয়টিতে জড়িত রয়েছে শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্ম-সংস্থান। সেন্ট্রাল জেলগুলো শুধু জেল নয়, ছোটখাট শিল্পকেন্দ্র, নানা শিল্পের মিলনক্ষেত্র—ঘানি, তাঁত, সতরঞ্চি, দরজি-শালা, বাঁশ, বেত, কাঠ এবং লোহালক্কড়ের জড়াজুড়ি। এখানে টাটানগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে আমেদাবাদ, বৌ-বাজারের সঙ্গে খিদিরপুর। এ ছাড়া জেলপ্রাচীরকে বেষ্টন করে রয়েছে তার বিস্তৃত সবজি-ক্ষেত।

সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ফোরম্যান পরিতোষবাবু খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। গর্বের সঙ্গে বললেন, সব তাঁর নিজের হাতে গড়া। কিন্তু কী লাভ ভূতের বেগার খেটে? ডেপুটি-সুপার হবার পথ খোলা নেই কোনো কালা আদমির। ওটা শ্বেতচর্মের বিশেষ অধিকার, মগজের বর্ণ তার যাই হোক। সব ওয়ার্কশপে পুরোদমে কাজ চলেছে। শুধু একটা দেখলাম বন্ধ।

পরিতোষ বললেন, এটা হচ্ছে পেতল-কাঁসার কারখানা। কদিন আগেও এখানে দাঁড়ালে মাথা ধরে যেত এর ঠনাঠন শব্দে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী তৈরী হত এখানে?

পরিতোষবাবু বললেন, বেশির ভাগ ঘণ্টা—ছোট বড় নানারকমের গঙ। জেলে জেলে যে-সব ঘণ্টা দেখেন, সব আমাদের তৈরি। শুধু জেল কেন, ইস্কুল, কলেজ, থানা, কাছারি, চার্চ এবং আরো কত জায়গা থেকে অর্ডার পাই আমরা। আপনার কলেজে যে ঘণ্টাটা বাজত, হয়তো সেটা আমরাই পাঠিয়েছিলাম একদিন।

—তা হবে। বোধ হয় সেই ঘণ্টার টানেই এখানে এসে পড়েছি।

পরিতোষবাবু হেসে উঠলেন। বললাম, কাজ বন্ধ কেন? অর্ডার নেই বুঝি?

—অর্ডার আছে বৈ কি? কিন্তু যোগেন নেই।

—যোগেন কে?

—যোগেন ছিল এখানকার Instructor. জেলে যাকে বলে ইসপিনদার। সে ব্যাটা খালাস হয়েছে এই মাসখানেক। ওরকম পাকা কারিগর আর পাচ্ছিনে। তাই তো হাঁদাটাকে বললাম, অর্ডারগুলো ফেরত দাও, আর একটা সার্কুলার করে দাও যে, ঘণ্টা আমরা আর দিতে পারবো না। ও কি বলে, জানেন? বললে, Why? Let Jogen come. শুনুন কথা! যোগেন আসুক! আরে, যোগেন যদি আর চুরি না করে, তার যদি জেল না হয়, আমরা জোর করে ধরে আনবো তাকে?

এই "হাঁদা" ব্যক্তিটি যে শ্বেতচর্ম ডেপুটি সুপার সে কথা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আরো কিছুদিন গেল। পেটা ঘণ্টার অর্ডার জমে উঠল। দুচারটা তাগিদও আসতে শুরু করল। ডেপুটি সুপার বিব্রত বোধ করলেন। যোগেনের দোস্ত ছিল মহীউদ্দিন। তাঁতে কাজ করে। তাকে ডেকে পাঠানো হল। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, যোগেনের কি হল? সে আসছে না যে?

মহীউদ্দিন বলল, সে হামি বাহার না গেলে কেমন কোরে বোলবো হুজুর?

—টোমার আর কটোডিন বাকী আছে?

—একুশ রোজ, সাব্।

—টিকেট লেয়াও।

মহীউদ্দিনের টিকেট আনা হল। ডেপুটি সুপার উৎকৃষ্ট কাজের পুরস্কারস্বরূপ তার কুড়ি দিন special remission বা বিশেষ ধরনের জেল মকুফ সুপারিশ করলেন। সুপারের মঞ্জুরি এসে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে। মহীউদ্দিন পরদিনই খালাস হয়ে গেল।

দিনসাতেক পরে যোগেন এসে সেলাম করে দাঁড়াল সাহেবের আফিসে। পকেট-কাটার অপরাধে আড়াই বছর জেল। এইবার নিয়ে আটবার হল তার শুভাগমন। সাহেব দেরাজ থেকে পেটাঘণ্টার অর্ডারগুলো বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, টুমি বড্ড বদমাশ আছে, যোগেন কর্মকার। এখ্না দৌর কাঁহে হুয়া ?

যোগেন জবাব দিল না; মুচকে হাসল শুধু একবার।

পরদিন সকাল থেকেই ঘণ্টাওয়ালাদের ঠনাঠন শব্দে যথারীতি মাথাধরা শুরু হল পরিতোষবাবুর।

যোগেন দুটো একটা নয়। বছরের পর বছর ধরে শত শত যোগেন এমনি ঘুরে ঘুরে আসে, ধরা দেয় এই লৌহ-তোরণের বাহু-বন্ধনে, সূর্যের চারদিকে যেমন করে ঘোরে গ্রহ আর উপগ্রহের দল। কী প্রচণ্ড আকর্ষণ! সারা জীবনেও এ পরিক্রমার বিরাম নেই। পাঁচবার, দশবার তো হামেশাই আসছে, যাচ্ছে, বিয়াল্লিশ বার জেল খেটেছে, এমন এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এই সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে। প্রথম যেদিন আসে, তার বয়স ছিল দশ। চুরাশী বছর বয়সে এইখানেই পড়ল তার শেষ নিশ্বাস।

এদের অনেককেই দেখলাম। ভদ্র, বুদ্ধিমান, চটপটে, কাজের লোক এবং এমন সব কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী, যার কোনো একটা অবলম্বন করে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার অভাব হবে না জেলের বাইরে কোনো জায়গায়। কিন্তু সে পথে এরা যায় না। জেলের ডাক এদের কাছে দুর্নিবার।

রোজই এদের কেউ না কেউ খালাস পাচ্ছে। মাতব্বর গোছের একজনকে একদিন পাকড়াও করা গেল। অফিস থেকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বললাম, কেউ কোথাও নেই। একটা সত্যি কথা বলবি ?

মহেশ দাঁতে জিব কেটে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, বি-কেলাসই হই আর যাই হই, হুজুরের কাছে কি মিথ্যে বলতে পারি ?

—জেলে আসিস কেন ?

মহেশ অসঙ্কোচে জবাব দিল, ইচ্ছে করে কি আর আসি বাবু? দশবার

পকেট মারতে গেলে হঠাৎ ধরাও পড়তে হয় দু-একবার। হাত-সাফাইএর কাজ। সবগুলো কি আর উতরে যায়?

—পকেট মারিস কেন?

—শোনো কথা! পকেট না মারলে খাবো কি?

—কেন? দেশে কত লোক তাঁতের কাজ করে খাচ্ছে। তোর মত একটা পাকা তাঁতীর কাজ জুটবে না?

মহেশ হেসে বললো, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, হুজুর, পুরনো চোর আমি। আমার মত লোককে কাজ দেবে কে? আপনি বলবেন, ব্যবসা কর। কিন্তু ব্যবসার গোড়ার কথা হল বিশ্বাস। পুরনো চোরকে বিশ্বাস করে কেউ? পুঁজি নেই; ধারে মাল পাবো না; তৈরি জিনিস বিক্রী করতে গেলে লোকে বলবে চোরাই মাল। ধরে নিয়ে যাবে থানায়। তারপরে ঘুরে ফিরে আবার সেই জেল।

বললাম, কোনো Mill-এ গিয়ে চাকরি কর।

—চাকরি দেবে কেন? চাকরি দূরের কথা, ভদ্দরলোকের পাড়ায় একটু আশ্রয় পাবারও উপায় নেই আমাদের। গেরস্তের রাত্তিরে ঘুম হবে না। ভলান্টিয়াররা পালা করে পাহারা দেবে। পুলিশ এসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দরজায় ধাক্কা মারবে, সারা রাত হাঁক-ডাক করবে বাড়ি আছি কিনা দেখবার জন্যে। তারপর, যদি কাছাকাছি কোথাও একটা চুরি-ডাকাতি কিছু হল, প্রথম দড়ি পড়বে আমারই হাতে।

আমি রেগে উঠলাম, দড়ি পড়লেই হল? মগের মুলুক নাকি? প্রমাণ করতে হবে তো?

প্রমাণ! বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল মহেশের মুখে, প্রমাণ কত চান? পাড়ায় দশজন ভদ্দরলোক নিজের পকেট থেকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে কোর্টে গিয়ে সাক্ষি দেবেন। হলপ করে বলবেন, এই লোকটাকে সিঁদ কাটতে দেখেছি। কেউ বলবেন, একে দেখেছি বাক্স মাথায় ছুটতে। সাপের সঙ্গে এক ঘরে বাস করা যায় হুজুর, কিন্তু দাগী চোরের সঙ্গে এক পাড়ায় থাকা যায় না।

একথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। অন্য প্রশ্ন পাড়লাম। বললাম, তাই বলে জীবন-ভোর এই জেলের কষ্ট—

মহেশ বাধা দিয়ে বলল, কষ্টটা আপনি কোথায় দেখলেন, স্যর? খাসা দোতলা বাড়ি, তিনবেলা ভরপেট খাবার, ধবধবে জামাকাপড়, শীতের দিনে

তিনটা করে কম্বল, অসুখ করলে তোফা হাসপাতাল। দুপাউন্ড ওজন কমলে মাছ, মাংস, দুধ ঘি'র দেদার ব্যবস্থা। এরকম আরাম আছে নাকি জেলের বাইরে?

অবাক হয়ে গেলাম। বোকার মত প্রশ্ন করলাম, বলিস কি? জেলে তোদের কষ্ট হয় না?

—একটুও না। একটা কষ্ট শুধু ছিল। সেও সেই প্রথম প্রথম। আজকাল তাও নেই।

—কি সেটা?

—হুজুর অপরাধ নেবেন না?

—না। তুই বল্।

—সেটা হচ্ছে নেশা। যতদিন গলার ফোকরটা তৈরি হয়নি, বড্ড কষ্ট গেছে। এখন আর ভাবনা নেই।

ফোকরের কাহিনী যা শুনলাম বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ। একটা সীসার বল গলার ভিতর একপাশে রেখে দিনের পর দিন তিল তিল করে তৈরি হয় এক গহ্বর। যন্ত্রণা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ভবযন্ত্রণা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা। এমনি করে বল গলায় আটকে দু-চারজন যে শেষ হয়ে যায়নি, তা নয়। মহেশের চোখের উপরেই একজন গেল সেবার। ফোকরের ঘা যখন শুকিয়ে যায়, বলটা ফেলে দিয়ে তার মধ্যে ওরা লুকিয়ে রাখে সিকি, আধুলি, গিনি, আংটি কিংবা সোনার চেন। এই গচ্ছিত সম্পত্তির বিনিময়ে আসে তামাক, বিড়ি, গাঁজা, চরস, কোকেন, আফিম, আরো কত কি নেশার উপকরণ। সে উপকরণ যারা জোগায়, আইনের কেতাবে তাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে এই সব নিষিদ্ধ বস্তুর প্রবেশ রোধ করা। বলা বাহুল্য, তাদের কর্তব্যহানির দোষ শুধরে যায় উপযুক্ত কাঞ্চন-মূল্যে এবং সে ভার বহন করে ঐ ফোকর গচ্ছিত ধনের একটা মোটা অংশ।

মহেশ আমার কৌতূহল বুঝতে পেরে তার ফোকর থেকে উগরে বের করল একটি গিনি। তারপর সেটাকে আবার স্বস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আরো অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সারা জীবন জেলে কাটিয়ে দিচ্ছিস, বৌ-ছেলেমেয়ের জন্যেও মনটা একবার কাঁদে না? ইচ্ছে হয় না, অন্য দশজনের মত তাদের নিয়ে ঘরসংসার করতে?

মহেশ বলেছিল, বৌ-ছেলে থাকলে তো মন কাঁদবে? ওসব ঝঞ্ঝাট আমাদের প্রায় কারুরই নেই।

বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম, সে কি! এত যে মেয়েছেলে আসে তোদের সঙ্গে দেখা করতে? দরখাস্তে লেখে অমুক আমার স্বামী, অমুক আমার স্বামীর ভাই।

মহেশ হেসে ফেলল—স্বামী-টামী না বললে আপনারা দেখা করতে দেবেন কেন? আসলে বৌ নয় কোনোটাই।

একটু থেমে অনেকটা যেন আপন মনে বলেছিল, নাই বা হল বৌ, এরাই আমাদের অসময়ের বন্ধু। রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে এরা না টানলে আমাদের উপায় ছিল না। সেবার বসন্ত হল ঐ রামদিন কাহারের। কী সেবাটাই না করলে বিমলি। লুকিয়ে রাখল নিজের ঘরে। কর্পোরেশনের লোক পাছে টের পেয়ে নিয়ে যায় হাসপাতালে। ওরি জন্যে রামদিন বেঁচে গেল। তারপর পড়ল ও নিজে। রামদিনটা হাসপাতালে খবর দিয়ে এল। অ্যাম্বুল্যান্স দেখে কী কান্না বিমলির। কাঁদে আর বলে, আর বাঁচবো না, মহেশদা। নেহাত পরমায়ুর জোর ছিল মেয়েটার। প্রাণে মরল না, কিন্তু চোখ দুটো গেল। এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে। মেয়েগুলো সত্যিই বড় ভালো, হুজুর।

মহেশ চলে গেলে মনে পড়ল, কবে কোথায় যেন পড়েছি—বাইরে থেকে মানুষের ভালো করতে যাবার মত বিড়ম্বনা আর নেই। অথচ, এই বিড়ম্বনাই আমরা কোমর বেঁধে করে যাচ্ছি। এই "বি' ক্লাস" জেলঘুঘু পুরাতন পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে একদল লোকের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি crime-এর বীজাণু নিয়ে মাথা ঘামান এবং সে পোকাগুলোর আসল বাসস্থান রক্তের মধ্যে না মাথার খুলিতে, এই মহাতথ্য গবেষণা করেন, তাঁদের কথা বলছিনে। crime-এর জন্মস্থান যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া—এই পুরানো ধুয়া তুলে Heredity vs. Environment-এর সনাতন ঝগড়া আমদানি করে যাঁরা মাসিকপত্র পাঠকের কান ঝালাপালা করেন, তাঁদের প্রসঙ্গও আলোচনা করছিনে। আমি বলছিলাম তাঁদের কথা, যাঁরা ক্ষেপে উঠেছেন জেল-রিফর্মের ধ্বজা নিয়ে। আহা! বড্ড কষ্ট কয়েদীগুলোর! কম্বলের জামাটা গায় ফোটে; দাও ওর নিচে একটা সুতী লাইনিং। কম্বল-শয্যার উপর বিছিয়ে দাও একখানা

করে চাদর। মাছের টুকরোটা বাড়িয়ে দাও। ধনের বরাদ্দটা হাস্যকর —এক ছটাকের ১২৮ ভাগের এক ভাগ! ঐ হোমিওপ্যাথিক ডোজটা ডবল কর। বেচারীরা বিড়ি খেতে পায় না? ডিস্‌গ্রেসফুল! এক বাণ্ডিল বিড়ি বরাদ্দ হোক প্রত্যেকের জন্যে, কিংবা দাও একটা করে হুঁকো-কলকে। বড্ড একঘেয়ে জীবন ওদের। মাঝে মাঝে ঝাড় একটা করে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের লেকচার। একটা করে রেডিও সেট বসিয়ে দাও ওদের ব্যারাকের মাথায়। গান-বাজনা? অবশ্যই চাই। ম্যান্‌ ডাজ নট লিভ্‌ বাই ব্রেড অ্যালোন। সন্ধ্যার পরে কীর্তন করুক সবাই মিলে। মাঝে মাঝে জারি-গান আর কবির লড়াই। অর্থাৎ জেলকে যেন কেউ জেল বলে বুঝতে না পারে। আহারে-বিহারে যতটা পার আরাম দাও। আহা! কি ভীষণ কষ্ট বেচারাদের।

হতভাগ্য কয়েদীর দুঃখে এই সহৃদয় রিফর্মারদের কোমল হৃদয় অহরহ বিগলিত হচ্ছে। কিন্তু বন্দীর হৃদয়ের খবর এঁরা পাননি কোনদিন। এঁদের একজনকে লক্ষ্য করেই বলেছিল মহেশ—সবচেয়ে অসহ্য আপনা-দের ঐ ভিজিটার বাবুরা। এমন চোখে চাইবে, যেন আমরা সব কেষ্টর জীব। একবার এক বুড়ো এসে ধরল আমাকে—শুনলাম তিনি নাকি রায়বাহাদুর—কেমন আছ? কি খাও? কি অসুবিধা তোমাদের? এমনি সব ন্যাকামি! গা জ্বলে গেল। বললাম, বাবু, জেলের মধ্যে কি খাই, সে খবর না নিয়ে জেলের বাইরে গিয়ে কি খাব, তাই নিয়ে একটু মাথা ঘামান। তাতেই অনেক বেশি উপকার হবে আমাদের। কথাটা বোধ হয় ভাল লাগল না রায় বাহাদুরের। হনহন করে চলে গেল। এরকম কত দেখলাম। ওদের দরদ উথলে ওঠে যতক্ষণ জেল খাটছি। বাইরে গিয়ে যখন ফ্যাফ্যা করে বেড়াই, কেউ পোঁছেও না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, আর সবাই মিলে ফন্দী আঁটে কি করে এই জেল-ঘুঘুটাকে জেলে পুরে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

যোগেন-মহেশ অ্যান্ড কোম্পানির অনেকগুলো মুখ আজ ভিড় করে আসছে মনের কোণে। কেউ বেশ জ্বলজ্বলে; কেউবা ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে স্মৃতির অন্তরালে। এদেরই একজনের হাতে তৈরি আমার এই বেতের চেয়ারখানা। সংসারে যে-কটি আমার প্রিয়বস্তু আছে, তার মধ্যে এর স্থান ছোট নয়। এতকালের পরে আজও কোনো কোনো দিন

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় এই চেয়ারখানা নিয়ে যখন আমার বাগানের কোণটিতে গিয়ে বসি, চোখের উপর ভেসে ওঠে কালো ছিপছিপে মজবুত গড়নের এক জোয়ান ছোকরা; হাসিহাসি মুখে বসন্তের দাগ; মাথায় ঢেউখেলানো বাবরি। নাম জিজ্ঞেস করলে বলত, রহিম শেখ, বেত-কামানের ওস্তাগর। অর্থাৎ তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে সে নিজেও যেমন সচেতন ছিল অপরকেও তেমনি সজাগ করে রাখত।

রহিম গাঁজা, বিড়ি, চরস এসব স্পর্শ করত না। তার চেয়েও বড় নেশা এবং ঐ একটিমাত্র নেশা ছিল তার চুল। কেশ-প্রসাধনের জন্যে তেলের প্রয়োজন। সেটা নানা উপায়ে তাকে সংগ্রহ করতে হত। সে তেলের কতক যেত তার মাথায়, আর বেশীরভাগ যেত জমাদারের পায়ে। তা না হলে কাঁচির মুখে কোন্‌দিন উড়ে যেত তার শখের বাবরি। বলাবাহুল্য, তৈল-সংগ্রহের জন্যে তার ফোকর-ব্যাঙ্কের উপর যে চাপ পড়ত গাঁজা-চরসের ধাক্কার চেয়ে সেটা বেশী বই কম ছিল না।

বি-ক্লাস বন্দীদের একটা সাধারণ ব্যাধি আছে, যাকে ওরা বলে ছোকরা-রোগ—নিপীড়িত, যৌন-জীবনের কুৎসিত বিকৃতি। জেল-ক্রাইমের একটা বড় অংশের মূলে রয়েছে এই ছোকরা, যার জন্যে দায়ী বোধ হয় ওদের স্ত্রী-সঙ্গ-বর্জিত দীর্ঘ কারাবাস এবং সেখানকার কলুষিত আবহাওয়া। এরই তাড়নায় কত কুটিল ষড়যন্ত্র, কত জঘন্য জিঘাংসা, কত আঘাত-প্রতিঘাতের বীভৎস লীলা প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে ঐ লম্বা ব্যারাকগুলোর গহ্বরে, সে ইতিহাস কোনোদিন লেখা হবে না।

হাসপাতাল থেকে রহিম শেখের জন্যে দৈনিক বরাদ্দ ছিল আধ সের দুধ। কিন্তু রহিম তার বাহক মাত্র। যে-ভাগ্যবান্ সে দুধ উদরস্থ করত, তার বয়স ছিল সতের; দেহের রং মোটামুটি ফরসা এবং স্বাস্থ্য নিটোল। একে নিয়েই একদিন ঘনিয়ে উঠল মেঘ, এবং তার শেষ পরিণতি হল ছোরা বর্শা—রহিম আর পটলার মধ্যে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলা। আঘাতের মাত্রার বেশীর ভাগ পড়েছিল রহিমের ভাগে। তাই শাস্তির বেলায় সুপার তার পাওনাটা একটু কমিয়ে দিলেন। রহিমের ধারণা, সেটা সম্ভব হল শুধু আমারই সানুগ্রহ হস্তক্ষেপের ফলে।

খালাস হবার কিছুদিন পর ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এল আমার বাড়িতে। আমি তারই হাতের তৈরি আমার এই প্রিয় চেয়ারখানায় বসে কি একটা করছিলাম। রহিম খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, চেয়ারখানা তাড়া-

তাড়ি নামিয়ে দিলাম। জিনিসটা পছন্দসই হল না। আচ্ছা, তার জন্যে কি? এবার এসে আর একটা করে দিচ্ছি—একেবারে নতুন ডিজাইন্। যতদিন বসবেন, রহিমকে মনে পড়বে।

আমি বললাম, থাক, চেয়ারের দরকার নেই আমার। তোকে আর আসতে হবে না। কটা দিন অপেক্ষা কর। একটা ভাল কাজ জোটাতে পারবো বলে মনে হচ্ছে তোর জন্যে।

রহিম ব্যস্ত হয়ে বলল, না না, ওসব আপনি কখ্খনো করতে যাবেন না।

তার আপত্তির বহর দেখে হেসে ফেললাম, কেন রে? কাজের কথা শুনে ভয় পাচ্ছিস কেন?

রহিম সোজাসুজি বলল, দরকার নেই আপনার কাজ খুঁজে। ওতে আমার তো কোনো উপকার হবেই না, বরং আপনি ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

অবাক হয়ে বললাম, আমি ফ্যাসাদে পড়বো কেন?

রহিম বারান্দার কোণে চেপে বসে বলল, তবে শুনুন একটা গল্প বলি।

সেবার খালাস পেলাম—জেল থেকে। সাহেব চারটাকা বকশিশ দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন দুদিনের খোরাকি বারো আনা আর শেয়ালদ' পর্যন্ত একখানা রেলের পাশ। মাথায় কি বদ্খেয়াল এল! কোলকাতায় না ফিরে, মনে করলাম, ঐখানেই একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে থেকে যাবো। বেতের কাজ তো আগেই জানতাম। এবার একটা পাকা ওস্তাগরের হাতে পড়ে সুতোর মিস্ত্রীর কাজটাও বেশ ভালোরকম রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কাজ খুঁজে বেড়াই, আর রাত্তিরবেলা পড়ে থাকি ইস্টিশনে। দেখতে দেখতে টাকা কটা ফুরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একেবারে গা ঘেঁসে এক মাড়োয়ারী বাবু চলে গেল। পকেটে একতাড়া নোট। হাতটা নিশপিশ করে উঠল। লোকটা এমন হাঁদা, নোটগুলো হাতিয়ে নিতে লাগত ঠিক এক সেকেন্ড। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে, কপালে দুঃখ থাকলে যা হয়। ভোরের দিকে, তখনো ঘুম ভাঙেনি, পিঠে এক জুতোর ঠোক্কর। চোখ মেলে দেখি পুলিশের হাবিলদার। বললাম, মারছেন কেন খালি খালি?

তবে রে শালা—বলে চুল ধরে টেনে তুলল। তারপর থানায়। ১০৯ ধারায় চালান দিয়ে দিল। সেদিন ছিল রবিবার। ওয়ারেন্ট সই করাতে হবে

এস. ডি. ও. সাহেবের বাসায়। আমাকে নিয়ে চলল বেঁধে। শুনলাম হাকিমটা নাকি পাগলা। আসামী না দেখে ওয়ারেন্ট সই করে না।

বাড়ির সামনে টেনিস খেলবার মাঠ। তারি একপাশে বেতের চেয়ারে বসে একজন মেয়েছেলে উল বুনছিলেন। ভাবে বুঝলাম, এস. ডি. ও. সাহেবের পরিবার। অল্প বয়স; মুখ দেখলেই বোঝা যায় প্রাণে দয়া-মায়া আছে। পাশে একখানা ছোট টেবিল। পুলিশ দুজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছিল। সেই ফাঁকে একটু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে বললাম, মেমসাহেব, আপনার ঐ টেবিলটা পালিশ করা দরকার।' মেহের-বানি করে যদি কাজটা আমাকে দেন। দুদিন খেতে পাইনি। প্রথমে উনি খানিকটা চমকে উঠলেন। পুলিশ দুটোও রা-রা করে ছুটে এল। তাদের হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে উনি এগিয়ে এসে বললেন, পালিশের কাজ জান, তুমি?

—জানি, মেমসাহেব।

দেশী হাকিমের পরিবারেরা—মেমসাহেব বললে খুশী হন, এটা আমার জানা ছিল।

উনি বললেন, তুমি চুরি করেছ?

না, হুজুর। চারদিন হল জেল থেকে বেরিয়েছি। কাজ খুঁজছিলাম। ইস্টিশন থেকে খালি খালি ধরে এনেছে।

মেমসাহেব ভিতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সাহেবকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন। তিনি এসে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর কোথায় কোথায় ফোন করে শেষটায় পুলিসদের হুকুম করলেন, আসামী ছেড়ে দাও।

প্রায় দশ-বারো দিন ধরে ওদের সব ফার্নিচার পালিশ করে দিলাম। মশলা কেনবার টাকা আমারই হাতে ধরে দিলেন। আমিই সব কিনে এলাম। হিসাব দিতে গেলাম; নিলেন না। কাজ দেখে মেমসাহেব ভারী খুশী। এ কদিন খেতে তো দিলেনই, তার উপর বকশিশ দিলেন দশ টাকা।

এদিকে সাহেব আমার জন্যে কাজ খুঁজছিলেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কি কাজ জানো?

সব রকম বেতের কাজ জানি, হুজুর। মেমসাহেব যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটা জেলে বসে আমিই তৈরি করেছিলাম।

—বটে।

ওখানকার কাজ শেষ হলে উনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শহরের বাইরে, কোন্ এক জমিদার এক ইস্কুল খুলেছিল, সেইখানে। বড়-লোকের খেয়াল। ভদ্দরলোকের ছেলেদের ধরে হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে—তাঁত, কাঠের কাজ, ছুরি-কাঁচি তৈরি, বেতের কাজ, এইসব।

আমি হলাম বেতের মাস্টার। মাইনে কুড়ি টাকা। এস. ডি. ও. সাহেব বলে দিয়েছিলেন তুমি যে জেল খেটেছ, একথা কাউকে বোলো না। আমি মনে মনে হাসলাম। দাগী চোরের গায়ে জেলের গন্ধ লেগে থাকে,—একথা ওঁর জানা ছিল না। ছোকরা হাকিম কিনা।

মাসখানেকের মধ্যেই পুলিশের চেষ্টায় সব জানাজানি হয়ে গেল। ছাত্ররা বলে বসল, আমরা জেলখাটা চোরের কাছে কাজ শিখবো না। বুঝলাম, আমার চাকরি এবার খতম। মানে মানে সরে পড়ব ভাবছি, এমন সময় জমিদারের মেয়ের গলা থেকে হার চুরি গেল পুকুরঘাটে। পুলিশ এসে ধরল আমাকে। পিঠেও বেশ কিছু পড়ল, সে তো বুঝতেই পারছেন। জমিদার মামলা চালাতে দিলেন না। আমাকে ডেকে নিয়ে এক মাসের মাইনে বেশী দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, জুতো দেখতে পাচ্ছিস?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, পাচ্ছি।

—খবরদার! আমার জমিদারির ত্রিসীমানায় কোনোদিন পা দিয়েছিস তো পিঠের চামড়া তুলে নেবো, বুঝলি?

এবারেও ঘাড় নেড়ে বললাম, বুঝেছি।

জমিদারবাবু হাঁক দিলেন, দারোয়ান!

দারোয়ান এসে আমার কান ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল। যাবার সময় কানে এল, বাবু বলছেন, যেমন জুটেছে একটা পাগলা এস. ডি. ও.। ইস্কুলের মাস্টার চাই. পাঠালো একটা দাগী চোর।

কাজকর্ম করে খাবার শখ অ্যাদ্দিনে মিটে গিয়েছিল। এবার নিজের পথ ধরলাম। ইস্টিশনেই জুটে গেল একটা কেস্। পকেট ভারী করে চলে এলাম কোলকাতায়। কিছুদিন পরেই আবার এই "পুরানা জেল"।

আমি বললাম, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলি; কি বলিস?

'সে কথা আর বলতে', সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রহিম, বাইরে যে-কদিন থাকি, মনে হয় পরের বাড়ি আছি। নিজের বাড়িঘর বলতে যা কিছু আমাদের ঐ জেল। জেলকে লোকে ঠাট্টা করে বলে শ্রীঘর। কথাটা কিন্তু একেবারে খাঁটি, স্যর।

—বেশ, তা যেন হল। কিন্তু আমার কি ফ্যাসাদ হবে বলছিলি যে?

রহিম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ঐ দেখুন, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। কোলকাতায় আসবার কদিন পরেই পটলার সঙ্গে দেখা চিৎপুরে। তার কাছে শুনলাম, এস. ডি. ও. সাহেবের চাকরি নিয়ে টানাটানি। একটা দাগী চোরকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন, ইস্কুলে চাকরি করে দিয়েছেন—সাহেব কালেকটর নাকি বেজায় খাপ্পা। উনি আর এস. ডি. ও. নেই। সাধারণ হাকিম্ করে, কোথায় বদলি করে দিয়েছে। তাই তো বলছিলাম, স্যার, পুরানো চোরের ভেজাল অনেক। আপনি কখ্খনো এসব ঝঞ্ঝাটে জড়াতে যাবেন না। একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

রহিম চলে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কথাগুলো মনের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগল। অনেক কথার মধ্যে একবার সে বলেছিল, আমরা দাগী। আমাদের এ দাগ কি কোনো কালেও মিটবে না?

উত্তর দিতে পারিনি। হয়তো এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, দাগী ওরা নয়, দাগ পড়েছে আমাদের চোখে, দাগ পড়েছে আমাদের মনে—যে চোখ দিয়ে ওদের দেখি, যে মন দিয়ে ওদের বিচার করি, সেইখানে। আমরা ভদ্র মানুষ, সভ্য মানুষ, সৎ মানুষ। কোনোদিন ভুলি না, এই লোকটা একদিন জেলের ঘানি টেনেছিল। সমাজের যে-স্তরে যে-স্থানটুকু সে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এসে দাঁড়াবার সুযোগ তাকে আমরা দিতে পারি না কিছুতেই। একবার যে গেল, সে চিরকালের তরেই গেল। যে-ছাপ পড়ল তার কপালে, আমাদের চোখে সে কোনোদিন মুছবে না।

মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা। তখন কলেজে পড়ি। একটা কি সাহিত্য-সভাটভা উপলক্ষ করে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ জুটে গেল। ঘণ্টাকয়েক ছিলাম তাঁর কাছে; তাঁর সৃষ্ট পতিতা চরিত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে কী একটা মন্তব্য করেছিলাম। তিনি হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নেমে এল হাতে। তীক্ষ্ন চোখ দুটো কেমন উদাস হয়ে উঠল। সহসা যেন কত দূরে চলে গেলেন। কোথাকার কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর দিকে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, পতিতা! হ্যাঁ; ওদের নিয়ে অনেক কথাই উঠেছে, যদিও আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারিনে। আমি যে ওদের অনেকের কথাই জানি। নিজের চোখে দেখেছি, এমন জিনিস ওদের মধ্যে আছে, যা বড় বড় সমাজে নেই।

ত্যাগ বল, ধর্ম বল, দয়া, মায়া, প্রেম,—মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, ওদের মধ্যেও অভাব নেই।

একটু থেকে করুণার্দ্র কণ্ঠে বলেছিলেন, তা ছাড়া, কোনো মানুষ নিছক কালো, তার মধ্যে কোনো redeeming feature নেই, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ও আমি পারি না।

বাইরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। একটি ছোট্ট বারান্দায় তাঁর সামনে পাশাপাশি বসে আমরা দুটি তরুণ ছাত্র। আমাদের দিকে না চেয়ে, অনেকটা যেন আত্মগত ভাবে, থেমে থেমে এই ক'টা কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। আজ এতকাল পরে ঐ হতভাগা দাগী চোর রহিম সেখের দিকে চেয়ে মানব-দরদী কথাশিল্পীর সেই বেদনাসিক্ত কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবছি, এরাও কি নিছক কালো? এদের মধ্যেও কি কোনো redeeming feature নেই?

শতাব্দীর ওপার থেকে টমাস হার্ডির মানসকন্যা টেস্-এর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। একটি রাত্রির মুহূর্তের দুর্বলতা তার জীবনে নিয়ে এসেছিল লজ্জা, কলঙ্ক আর অভিশাপ। সে দাগ যখন সারাজীবনেও মুছে ফেলা গেল না, তার আর্ত কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল এক কঠিন প্রশ্ন—The recuperative power of Nature is denied to maidenhood alone? নিরন্তর ভাঙাগড়াই তো প্রকৃতির লীলা। ছিন্ন শাখার মূল থেকে দেখা দেয় নব পত্রোদ্গম। অতবড় যে পুত্রশোক, তারও ক্ষত একদিন মিলিয়ে যায় মায়ের বুকে। অশ্রুধারা শুকিয়ে যায়, ফিরে আসে হাসির ঝলক। কিন্তু মুহূর্তের তরে খণ্ডিত হল যে কুমারীর কৌমারধর্ম, তার কালিমা রেখা কি কোনোদিন মুছবার নয়? প্রকৃতির অপরাজেয় সঞ্জীবনীশক্তি এইখানেই শুধু ব্যর্থ হবে?

টেস্ তার প্রশ্নের জবাব পেয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু রহিমের প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। লৌহ যবনিকার অন্তরালে শত শত রহিমের চোখে ফুটে আছে ঐ একটি নির্বাক প্রশ্ন—আমাদের এ দাগ কি কোনোদিন মুছবে না?

প্রাণপূর্ণ দরদ নিয়ে যদি ফিরে আসেন কোনো টমাস-হার্ডি কিংবা শরৎ চাটুজ্জে, হয়তো এর জবাব একদিন মিলবে।

পনের বছর পরের কথা। ইতিমধ্যে গোটা সাতেক জেল ঘুরে আবার এসেছি কলকাতায়। আগের বছর বড় বিনুর বিয়ে দিয়েছি। জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব করতে হবে। ই সব আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। গৃহিণীর বিশেষ ফরমাশ—এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম দেওয়া চাই-ই। দুপুর রোদ মাথায় করে বড়বাজার পোস্তায় গিয়েছিলাম আম কিনতে। ভীষণ ভিড়। অনেক দোকান ঘুরে বহু দরদস্তুর করে এক জায়গায় পছন্দ করে দাম দিতে যাচ্ছি—সর্বনাশ! মনিব্যাগ কৈ? এ পকেট ও পকেট বৃথাই হাতড়ে দেখলাম বারবার। আম ঐ পর্যন্তই রইল। ফিরবো যে তার ট্রাম ভাড়াটাও নেই। হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে পূর্বদিকে পা চালিয়ে দিলাম।

সেলাম, হুজুর!

চমকে উঠলাম। গলাটা চেনা-চেনা। তাকিয়ে দেখি, বেঁটে কালো কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা একটা লোক। মাথায় ঢেউখেলানো বাবরি।

—কে, রহিম?

—হ্যাঁ, হুজুর। গরিবকে ভোলেননি, দেখছি।

—কেমন আছিস, রহিম?

—ভালোই আছি, আপনার দোয়ায়।

একটু তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে রহিম বলল, আপনাকে কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, স্যর। শরীর ভালো আছে তো?

গোটা পঞ্চাশেক টাকা ছিল ব্যাগেতে। বড্ড মুষড়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা করেও নিস্তেজ ভাবটা চাপা দিতে পারলাম না। বললাম, ভালোই আছি। তবে—

রহিম সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আমি একটু হাসবার মত মুখ করে বললাম, মনিব্যাগটা চুরি গেল।

রহিম ব্যস্ত হয়ে বলল, কখন চুরি গেল? কোথায়?

বললাম, ঐ আমপট্টীতে, এই আধ ঘণ্টাটাক হবে। সে যাক্, তারপর? তুই আছিস কোথায়? কাজটাজ কিছু—

রহিম সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আপনি দাঁড়ান বাবু, আমি এখুনি আসছি—বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি সেইখানেই অপেক্ষা করে রইলাম। পনের মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা যায়। হঠাৎ মনে হল, এ কি করছি? একটা পুরানো চোর কি বলে গেল, আর তার কথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি—একজন পদস্থ

সরকারী অফিসার! পা বাড়াতে যাচ্ছি, রহিম ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো মনিব্যাগ বের করে বলল, দেখুন কোন্‌টা আপনার?

আমি নিজের ব্যাগটা তুলে নিলাম।

রহিম বলল, খুলে দেখুন সব ঠিক আছে কিনা। দেখলাম, সব যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বললাম, কোথায় পেলি? রহিম হেসে জবাব দিল, সে অনেক কথা, হুজুর। সব আপনি বুঝবেন না। ছোকরাটা নতুন। আপনাকে তো চেনে না। তবে ভারী বিশ্বাসী। সরায়নি কিছুই, গোটাটাই জমা দিয়েছে। সর্দারের কাছে গিয়ে আপনার কথা বলতেই তাড়াতাড়ি বের করে দিল। সর্দার এখন ভারি ব্যস্ত। নৈলে নিজেই আসত। বলে দিল, বাবু যেন আমাদের কসুর মাপ করেন।

আমি একখানা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে রহিমের হাতে দিতে গেলাম। সে দাঁতে জিব কেটে জোড় হাত করে দু-পা পেছনে সরে গেল। তারপর আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে বলল, কসুর আর বাড়াবেন না, হুজুর।

আমি আর পীড়াপীড়ি করতে পারলাম না। রহিম বলল, আম কিনতে এসেছিলেন এন্দুর?

—হ্যাঁ। বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দিতে হবে। ঝুড়িখানেক ল্যাংড়া আম; সবাই বললে পোস্তাতে সুবিধা হবে।

রহিম বলল, এখানে আম কেনা কি আপনার কাজ? চলুন আমি কিনে দিচ্ছি।

আমার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। বললাম, থাক। ওদিক থেকেই না হয় নেবো।

রহিম বলল, আপনাকে বাজারে ঢুকতে হবে না। কষ্ট করে এই মোড়টায় এসে একটু দাঁড়ান। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।—বলে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই কুলীর মাথায় দু ঝুড়ি ল্যাংড়া আম নিয়ে সে ফিরে এল এবং একটা ঘোড়ার গাড়ির ছাদে চাপিয়ে দিয়ে গাড়োয়ানকে বলল, বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

আমি আমের দাম জানতে চাইলাম। রহিম আবার জোড় হাত করল।

বিরক্তির সুরে বললাম, না, না। সে কি হয়? খালি খালি এতগুলো টাকা তুই দিতে যাবি কেন? আর আমিই বা নেবো কেন?

রহিম সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আপনাকে দিইনি হুজুর। আমার বিনু মাকে দিলাম। সেই কবে দেখেছি। আপনার চাকর নিয়ে আসত গেটের সামনে। দু বছরের মেয়ে; যেন বেহেস্তের পরী। সেই আমাদের ছোট্ট বিনু মা আজ বড় হয়েছে। সাদী হয়েছে। গরিব রহিম আর কিই বা দিতে পারে? দুটো আম দিলাম আমার মাকে।

গলাটা আটকে গেল। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

আমের দাম আর দিতে পারলাম না।

বাড়ি পেঁাছে গাড়ির ভাড়া দিতে গেলাম। গাড়োয়ান সেলাম করে বলল, ভাড়া পেয়ে গেছি, বড়বাবু।

—সে কি! কে দিল ভাড়া?

—কেন, রহিম?

—না, না, সে হবে না। ও টাকা ফিরিয়ে দিও। ভাড়া তোমাকে নিতেই হবে।

গাড়োয়ান ভয়ে ভয়ে বলল, বলেন কি বাবু? ঐ রহিমকে আপনি চেনেন না? আস্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে।

[চৌদ্দ]

শুনেছি, প্রাণিবিজ্ঞানমতে চিংড়িমাছ মাছ নয়। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক মৎস্যভোজীর পক্ষে ব্যাপারটা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়েও চমকে যাবার কারণ ঘটল, যেদিন শুনলাম, ভূতনাথ দারোগা দারোগা নয়। এ শুধু খবর নয়, এ একটা আবিষ্কার। রাম শ্যাম যদু থেকে আরম্ভ করে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ পর্যন্ত একটা গোটা মহকুমার মুখে যিনি এক ডাকে 'ভূতনাথ দারোগা', ভাবিনি সেই স্বনামধন্য পুরুষ একজন তুচ্ছ ডি. এস. পি. মাত্র। সরকারী পরিচয় যে আসল মানুষটির ধার দিয়েও যায় না, তারই আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

ভূতনাথের দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়। অর্থাৎ গোরুচোর ফাজ্‌লা শেখ আর বাঘশিকারী দুর্দান্ত জমিদার কালু চৌধুরী একই হাতে কড়া পরে, একই দড়ি কোমরে বেঁধে একসঙ্গে কোর্টে আসে যায়। লঘু গুরু ভেদ নেই ভূতনাথ দারোগার কাছে। তাঁর শুভদৃষ্টি একবার যার উপরে পড়েছে, অর্থ এবং মুরুব্বির জোর তার যতই থাক, জেলের ঘানির সাতপাক তাকে ঘুরতেই হবে। যত বড় বেয়াড়া, খুঁতখুঁতে কিংবা উদারপন্থী হাকিমই আসুন, ভূতনাথের আসামীকে বেকসুর খালাস দেবার মত কোনো ফাঁক পেয়েছেন বলে শোনা যায়নি।

খালাস অমনি দিলেই হল?—ভূতনাথ বুক ফুলিয়ে বলেন তার ভক্ত-মহলে, ফৌজদারী মামলা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক। আইন কানুনের গলিঘুঁজির বালাই নেই। স্রেফ্ ঘটনা সাজিয়ে যাও। Conviction মারে কে? কিন্তু ঘটনা মানে কি?—হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন কোনো জুনিয়রকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যটি নেহাত উপলক্ষ। উত্তর দেন উনি নিজেই —ঘটনা মানে যদি বুঝে থাক—যেটা ঘটে, সুবল মিত্তিরের ডিক্সনারি ঘাড়ে করে ইস্কুল মাস্টারি করে খাওগে। পুলিশের চাকরি তোমার চলবে না। যা ঘটে নয়, ঘটনা মানে তোমার সুবিধের জন্যে যা ঘটা দরকার। এই যেমন ধর, বাঘাডাঙ্গার সতীশ কুণ্ডু হঠাৎ টাকার গরমে তেতে উঠেছে। তোমার এলাকায়

বাস করে তোমারই সামনে ঘাড় উঁচু করে চলে। জব্দ করতে চাও? ফেলে দাও কোনো খুনী মামলায়।

কোনো ছোকরা প্রবেশনার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সার, কাছাকাছি কোথাও খুন তো একটা হওয়া চাই।

—কে বললে খুন হওয়া চাই? খুনের কোনো দরকার নেই; দরকার শুধু একটা লাস। দেশে এত লোক মরছে, আর একটা মড়া জোগাড় করতে পারবে না? আর কোথাও না পাও, হাসপাতালগুলো আছে কি করতে?

প্রবেশনারটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করে, মড়া না হয় একটা জোটানো গেল। কিন্তু সেটা যে কলেরায় মরেনি, খুনের লাস, সেকথা প্রমাণ হবে কি করে?

ভূতনাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, কেন? ডাক্তার বলে একরকম প্রাণী আছে, শোনোনি কোনোদিন? ওরাই প্রমাণ করবে। ভগবান ওদের হাতে স্প্রীং লাগিয়ে দিয়েছেন; যেদিকে ঘোরাতে চাও ঘুরবে। তবে, তার জন্য চাই কিছু তেল।

দু-একজন সিনিয়র গোছের অফিসার মাথা নেড়ে বললেন, ঐ যা বললেন, স্যর। ঐ তেলটাই হল আসল। ঐটি সংগ্রহ করাই একটু মুশকিল।

—কিচ্ছু মুশকিল নেই, সঙ্গে সঙ্গে বলেন ভূতনাথ, তেল আপনিই জুটে যায়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, সতীশ কুণ্ডুর একটা বিপক্ষ দল আছে, নিশ্চয়ই, আর তার কর্ণধার হচ্ছেন জগৎ পাল কিংবা নিরঞ্জন সাহা। ওদের কাউকে শুধু ইঙ্গিতে জানতে দাও তোমার মতলবটা কি। তেলের পিপে মাথায় নিয়ে ছুটে আসবে। যত খুশী ঢাল। ডাক্তার যদি একটু নজর দেন, আদালতে গিয়ে দেখবে কলেরার পচা মড়ার পেট থেকে বেরিয়েছে বন্দুকের গুলি কিংবা তার বুকে রয়েছে মারাত্মক ছোরা জখম।

এর পরে আর কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ থাকে না। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি অর্বাচীন পুলিশ মহলেও থাকে দু-একজন। তাদেরই কেউ এবার বলে বসে, আচ্ছা স্যর, লাস না হয় পেলাম, আর সেটা যে খুন, তারও ডাক্তারি প্রমাণ পাওয়া গেল; কিন্তু খুনের সঙ্গে সতীশ কুণ্ডুকে জড়াবার মত সাক্ষী কোথায়?

ভূতনাথ সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের হাসি মিশিয়ে বলেন, সাক্ষী তো আকাশ থেকে পড়ে না, বাপু, মাঠেও গজায় না। ও জিনিসটা কষ্ট করে

তৈরী করতে হয়, আর তার জন্যে চাই মাথায় কিঞ্চিৎ মগজ আর বুকে খানিকটা সাহস।

বলা বাহুল্য, ভূতনাথের ভাণ্ডারে এ দুটি পদার্থের কোনোটারই অভাব নেই। এদের জোরে সাক্ষী তৈরী আর আসামীর স্বীকারোক্তি আদায়, দুটোই তার কাছে জলভাত। প্রথমে তোয়াজ তোষণ, তারপর শাসন গর্জন,—এইসব প্রচলিত পদ্ধতি তো আছেই, এ ছাড়া আছে তার কয়েকটা নিজস্ব পেটেন্ট কবিরাজি মুষ্টিযোগ।

—সাক্ষী কথা শুনছে না?

সহকারী বলেন, না, স্যর।

—কি বলে?

—কিছু বলে না।

—তোমাদের যা করবার, করেছ?

—সবই তো করলাম।

ভূতনাথ গম্ভীরভাবে ব্যবস্থা দিলেন, বৃহৎ যষ্ঠিমধুচূর্ণ এক পুরিয়া।

পুরিয়া যথারীতি সেবন করানো হল। অর্থাৎ একটি মধুবর্ষী বৃহৎ যষ্টি সাক্ষীর পৃষ্ঠদেশে চূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে নির্বিকার। ভূতনাথের কাছে রিপোর্ট এল।

—কি, সোজা হল না?

সহকারী হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

—দাও ডোজ তিনেক 'গুম্ফোৎপাটন রসায়ন'। যত নষ্টের মূল ব্যাটা-ছেলের ঐ কাইজারী গোঁফ।

একজন কুস্তীগীর হিন্দুস্থানী সিপাহীকে এই মহৎ কার্যে নিয়োগ করা হল। মিনিট পাঁচেক পরেই খবর এল, সাক্ষী তৈরী।

শুধু সাক্ষী-বাগানো নয়, কনফেশন আদায় করতেও ঐ একই ব্যবস্থা। কিন্তু দু-একটা দুর্ধর্ষ আসামী কখনো ক্বচিৎ দেখা যায়, যাদের বেলায় গুম্ফোৎপাটন রসায়ন কিংবা শ্মশ্রুছেদন বটিকা হয়তো তেমন কার্যকরী হয় না। এরকম ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেন তাঁর শেষ এবং মোক্ষম আবিষ্কার—মহানিমজ্জনী সুধা, চপেটাঘাত সহ সেব্য। শীতকালের গভীর রাতই হচ্ছে এই মহৌষধি প্রয়োগের প্রশস্ত সময়। তার উপর স্থানটা যদি পানা-পুকুর হয়, ফল অব্যর্থ।

ভূতনাথ ঘোষালের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, দেখা হয়ে গেল কার্যসূত্রে।

অফিসে বসে কাজ করছি। ভারী জুতোর শব্দে মুখ তুললাম। যে ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপাশে চেয়ারখানা দখল করলেন, তাঁর দৈর্ঘ্য ছ' ফুট এবং পরিধি তিন ফুটের কম নয়। আমি জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারটি পরিচয় দিলেন—সদর ডি. এস. পি. ভদ্রলোক টুপিটা খুলতেই মাথাজোড়া বিশাল টাক চকচক করে উঠল। আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে বললাম, ও আপনিই মিস্টার ঘোষাল? ভারী আনন্দ হ'ল।

—আনন্দ হ'ল!—ছাদ-ফাটানো হাসি হাসলেন ভূতনাথ; আমাকে দেখে কারো আনন্দ হয়, এই প্রথম শুনলাম মশাই আপনার কাছে। অ্যাদ্দিন তো জানতাম, এ রূপ দেখলে লোকে আঁতকে ওঠে।—বলে পকেট থেকে একটা আধপোড়া মোটা সিগার বের করে ধরিয়ে কড়া ধোঁয়া ছাড়লেন।

ভূতনাথ অত্যুক্তি করেন নি। প্রকাণ্ড একটা খাঁড়ার মত নাক, তার নীচে জমকালো পাকানো গোঁফ, সুগোল রক্তাভ চোখ, পানের রস আর সিগারের ধোঁয়ায় জারিত মোটা মোটা ঠোঁট, গোটা কয়েক গজদন্ত এবং তার তলায় একখানা চওড়া চোয়াল।। এ হেন আকৃতি আনন্দদায়ক তো নয়ই, ঘোর আতঙ্কদায়ক। কিন্তু আপনাকে দেখে ভারী আতঙ্ক হ'ল—একথা তো বলা যায় না কোনো সদ্যপরিচিত আগন্তুককে।

সিগারটায় আরো গোটা কয়েক টান দিয়ে সহকারীকে বললেন, কই তোমার কাগজপত্তর বের কর।

সহকারী একখানা কাগজ আমার সামনে রাখলেন—একজন হাজতি আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আবেদন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। ভূতনাথ মাথা দুলিয়ে বললেন, আছে মশাই, আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সই না নিয়ে আসিনি। সে-সব চলত আগেকার দিনে। যখন খুশি দেখা করেছি আসামীর সঙ্গে, দরকারমত বের করে নিয়ে গেছি থানায়, আবার পোঁছে দিয়ে গেছি, যখন সুবিধা। পারমিশন তো দূরের কথা, একটা রসিদ-টসিদও চাননি জেলর বাবুরা। সেসব দিন আর নেই। আপনারা হলেন নব্যতন্ত্রের অফিসার। আমরাও তাই আটঘাট বেঁধেই কাজ করি। কই, আপনার মেট গেল কোথায়? একবার হুকুম করুন; নিয়ে আসুক বদমাশটাকে। এখানকার কাজ সেরে আবার কোর্টে যেতে হবে একবার।

বলে, চেয়ারের উপর বিশাল দেহটা যতখানি সম্ভব এলিয়ে দিয়ে লম্বা হাই তুলে হাতে তুড়ি দিলেন।

আসামীকে আনানো হল। মাথায় ব্যান্ডেজ, সর্বাঙ্গে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন। দেড়মাস হাসপাতালে থাকবার পর কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে কদিন হল। মেট এবং আর একজন কয়েদির কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে বসে পড়ল। ভূতনাথ তার মুখের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে বললেন, তুমিই বদরউদ্দীন মুন্সী ?

—হ্যাঁ হুজুর। চিনতে পারছেন না ?

—চিনবো কেমন করে বল ? তোমার কীর্তিকলাপ অবিশ্যি জানতে বাকী নেই। কিন্তু চাক্ষুষ দেখা তো হয়নি কোনোদিন।

হয়েছে বৈকি ? দেখা আমাদের হয়েছে, বড়বাবু। একবার নয়, দুবার।

দুবার! বল কি ? আমার তো মনে পড়ছে না। কোথায় দেখলাম তোমাকে ?

—প্রথম দেখা আমাদের ছত্রিশ সালে কুড়ুলগঞ্জে ভুবন সার গদীতে। ডাকাতি করে পালাচ্ছিলাম। একেবারে পড়ে গেলাম হুজুরের পিস্তলের মুখে। গুলিও আপনি ছুঁড়েছিলেন। মাথা তাক করেই ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু মাথাটা নিতে পারেননি, নিলেন এই কানের পাশ থেকে এক টুকরো মাংস। ভারী আপসোস হল; কানের জন্যে নয়, হুজুরের জন্যে। এমন পাকা হাতের গুলিটা ফসকে গেল।

ভূতনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন, ফসকে গিয়ে ভালোই হয়েছিল, বলতে হবে। তা না হলে আজ আমাদের দেখা হত কেমন করে ? খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন, কি বল ?

ভূতনাথের সুর হালকা। কিন্তু মুন্সী জবাব দিল গম্ভীর গাঢ় সুরে, আলবত। খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

ঘরের হাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গেল, এবং মিনিট কয়েক কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর ভূতনাথ আবার পূর্বসূত্রে ফিরে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, এ তো গেল একবার। আর কোথায় দেখা হল তোমার সঙ্গে ?

—ওরই ঠিক এক বছর পরে সোনাডাঙ্গার রমেশ ডাক্তারের বাড়িতে। নোটিশ দিয়ে ডাকাতি। একদল পুলিশ নিয়ে আপনি একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছিলেন। মতলব ছিল বদর মুন্সীকে ঝাঁকসুদ্ধ ডাঙ্গায় তোলা। কিন্তু দু-চারখানা ল্যাজা চালাতেই ফোর্স আপনার পালিয়ে গেল। হুজুর আশ্রয় নিলেন ডাক্তারের খিড়কির পুকুরে কচুরিপানার তলায়। আমার

দলের লোকগুলো জানত, আপনিও সরে পড়েছেন। আমি কিন্তু জলের উপর হুজুরের ঐ গোঁফজোড়া ভাসতে দেখেছিলাম। হাতে ল্যাজাও ছিল। কাজে লাগাইনি।

একটু থেমে খানিকটা যেন শ্লেষজড়িত সুরে বলল মুন্সী, তাহলেই দেখুন, হুজুর, খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

ভূতনাথবাবুর মুখ দেখে মনে হল, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। মুন্সীও সেটা লক্ষ্য করল এবং চোখে মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, যাক, ওসব পুরনো কথা। বাজে বকে খালি খালি আপনার সময় নষ্ট করবো না। এবার হুকুম করুন, গরিবকে হঠাৎ তলব করেছেন কেন?

ভূতনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার টানছিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আড়ালে তাঁর মুখখানায় মনে হল আষাঢ়ের মেঘ থমথম করছে। আরও কিছুক্ষণ কালো ধোঁয়ার কড়া গন্ধ ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, দ্যাখ বদরুদ্দিন, দেখা আমাদের হোক আর নাই হোক, দুজন দুজনকে যে আমরা ভালোভাবেই চিনি, সেকথা তুমিও জান, আমিও জানি। কথার মারপ্যাঁচ আর বুদ্ধির লড়াই দেখিয়ে লাভ নেই। তোমাকে যা বলবো একেবারে খোলাখুলিভাবেই বলবো। তোমার কাছ থেকেও সেই জিনিসটাই আশা করি।

—মারপ্যাঁচ আমার মধ্যেও নেই, হুজুর। খুনীই হোক আর ডাকাতই হোক, বদর মুন্সীর দিল সাদা। একথা তার দুশমনরাও অস্বীকার করবে না।

—আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, মুন্সী; আর সেই বিশ্বাস আছে বলেই তোমার কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি।

মুন্সী বিস্ময়ের সুরে বলল, সাহায্য! আমার কাছে?

—হ্যাঁ, তোমারই কাছে। আজ চৌদ্দ বছর ধরে পুলিশ তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে; ধরতে পারেনি। শুধু পুলিশ নয়, বেসরকারী লোকেরাও কম চেষ্টা করেনি। তোমার দলের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত তিনজন লোক প্রাণ হারিয়েছে, জখমও হয়েছে অনেক। কদমতলীর মাঠে তিন শ লোকে ঘেরাও করেও শেষ পর্যন্ত তোমাকে আটকাতে পারেনি। সেই বদর মুন্সী কিনা ধরা পড়ল জনকতক কোঁচা-ঝোলানো বরযাত্রীর হাতে, তার একটা ঘুষির মুখে যাদের গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবার কথা। তোমাকে

এখানে না দেখলে কথাটা বোধ হয় আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এমনিই হয়ে থাকে। এই দুনিয়ার নিয়ম। মহাভারতে আছে, অত বড় যে সব্যসাচী অর্জুন, তিনিও একদিন তাঁর গাণ্ডীবখানা তুলতে পর্যন্ত পারেননি।

বুড়ো মুন্সীর ভারী গলায় উত্তর এল, জানি।

—তাহলে দ্যাখ। সব নিয়তির খেলা। যা কিছু লম্ফঝম্ফ, সব দুদিনের। হঠাৎ একদিন এমনি করেই তার শেষ হয়।

একটু থেমে ভূতনাথবাবু তেমনিই ধীরে ধীরে বললেন, তুমি সেরে উঠেছ, সুখের কথা। একরকম পুনর্জন্মই বলা চলে। ধড়ে যে তোমার প্রাণ ছিল সেদিন, তাই তো কেউ বুঝতে পারেনি।

মুন্সী রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ছিল না হুজুর। প্রাণ ফিরে পেয়েছি জেলর সাহেবের দয়ায়। উনিই আমার বাপ, আমার জন্মদাতা—বলে সে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

ভূতনাথ বললেন, সে সবই আমরা শুনেছি। কিন্তু যে-জীবন তুমি ফিরে পেলে ও'দের দয়ায়, তার বাকী কটা দিনও বোধ হয় ও'দের আশ্রয়েই কাটিয়ে দিতে হবে—শুনতে ভালো না লাগলেও এ সত্যি কথাটা জেনে রাখা ভালো।

মুন্সী হেসে বলল, সেটাও কি আপনি আমাকে মনে করিয়ে দেবেন বড়-বাবু? এই জেলের মাটিতেই যে একদিন আমার শেষ ঘুম আসবে, সেকথা আমি জানি। তার জন্যে তৈরিও হয়ে আছি।

ভূতনাথ উদাস কণ্ঠে বললেন, এই যখন পরিণাম, আর সে সম্বন্ধে তোমার মনে যখন কোনো মিথ্যা আশাই নেই, তখন আর মায়া কিসের? যাদের সঙ্গে হাতে হাত ধরে একদিন এই পথে পা বাড়িয়েছিলে, তাদের পেছনে ফেলে এলে চলবে কেন? তাদেরও ডাক। সবাই এসে নিজের ভাগ বুঝে নিক।

মুন্সীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ল ভূতনাথের মুখের উপর। আস্তে আস্তে তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিল আগেকার সেই শ্লেষ-কুঞ্চিত হাসি। বলল, এই সাহায্যই কি আমার কাছে চাইতে এসেছেন, হুজুর?

—শুধু চাইতে আসিনি, মুন্সী, সাগ্রহে বললেন ভূতনাথ, সে সাহায্য পাব বলেই ভরসা করি।

—তাহলে বুঝবো, বদর মুন্সীকে চিনতে ভুল করেছেন বড়বাবু। আপনার এতখানি দামী সময় অনর্থক নষ্ট হল দেখে আমার আপসোস হচ্ছে।

ভূতনাথের রূপ হঠাৎ বদলে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তার মানে তুমি দলের কারো নাম করবে না?

উত্তরে মুন্সী শুধু হাসল একটুখানি। তারপর উঠবার উদ্যোগ করে বলল, হুকুম হলে এবার উঠতে পারি, বড়বাবু। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। সে লোকসান আর বাড়াতে চাই না।......সেলাম, হুজুর।

ভূতনাথ তীব্র শ্লেষের সুরে বললেন, ভূতনাথ দারোগার মুষ্টিযোগগুলো আজও একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি, একথা বোধ হয় মুন্সী সাহেবের স্মরণ আছে

—নিশ্চয়ই আছে। তবে মুষ্টিযোগের ফল কি সকলের বেলায় সমান হয়, বড়বাবু?—বলে, আর একবার সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

মুন্সী চলে যাবার পরেও খানিকক্ষণ ভূতনাথবাবুর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সহকারীটি বললেন, আমি আগেই বলেছি. স্যার, ভালকথার পাত্তর ও নয়। রীতিমত ওষুধ চাই। সেই ব্যবস্থাই আমাদের এবার করতে হবে। আপনার 'নিমজ্জনী সুধা' কয়েক ডোজ পড়লেই বাপ বাপ করে পথে আসবে বাছাধন।

ভূতনাথ কটমট করে তাকালেন তাঁর সহকারীর দিকে, অতো সোজা মনে কোরো না। যে লোকটা কনফেশন করে, অথচ জড়ায় না কাউকে সে বড় কঠিন চীজ।

আমি বললাম, আপনার কথায় যদ্দুর বুঝলাম, লোকটা মহাপুরুষ। ধরা পড়ল কেমন করে?

—একেবারে মহাপুরুষের মত, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ভূতনাথ, ধরা পড়ল, মার খেল ঠায় দাঁড়িয়ে, আর ঐ রকমের মার; তারপর করে বসল এক কনফেশন। শুধু ডাকাতি নয়, তার সঙ্গে মার্ডার এবং রেপ। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যাকে বলে রহস্যময়। যাই হোক, আপনি ঠিকই বলেছেন, লোকটা মহাপুরুষ। কাজেই বেশ একটু কড়া নজরে রাখতে হবে। ডানায় যখন একবার জোর পেয়েছে, হঠাৎ কোন্‌দিন বনের পাখি বনে চলে যাবে, টেরও পাবেন না।

সে বিষয়ে জেলের তরফ থেকে হুঁশিয়ারি এবং কড়াকড়ির ত্রুটি ছিল না। ভূতনাথের উপদেশে সেই ব্যবস্থা আর একটু দৃঢ়তর হল।

এই ঘটনার পর মাসখানেক চলে গেছে। মুন্সীকে বিশেষভাবে মনে করবার মত নতুন কিছু ঘটেনি। তারপর একদিন বিকালের দিকে সেল-ব্লকের মেট এসে জানাল মুন্সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কেন?

—সে কথা হুজুরের দরবারে নিজেই নিবেদন করতে চায়।

আমার মেটটি কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানে এবং সাধুভাষার উপর তার গভীর অনুরাগ।

বললাম, আচ্ছা নিয়ে এসো।

মুন্সী এসে বসল আমার পায়ের কাছটিতে। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। সে কিছু বলল না, এদিক ওদিক চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। জন দুই কর্মী কার্যসূত্রে আমার অফিসে অপেক্ষা করছিল। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বললাম, বল, এবার।

মুন্সী আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, বদর মুন্সীর মনের কথা এমন করে কেউ কোনোদিন বোঝেনি, হুজুর। আজ আবার এলাম এক নতুন আরজি নিয়ে।

—কি তোমার আরজি?

মুন্সী খানিকটা কি ভাবল। তারপর নিজের দুখানা হাতের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, গোস্তাকি মাপ করবেন, বড়বাবু। টাকাকড়ি সোনাদানা লোকে যতখানি চায়, যতখানি পেলে মনে করে সে বড়লোক, তার চেয়েও অনেক বেশী এই দুটো হাত দিয়েই তো লুটেছি জীবনভোর। কিন্তু কেড়ে যেমন নিয়েছি, ছড়িয়েও দিয়েছি তেমনি। পড়ে নেই কিছুই। যাদের কলজের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম তাদের নিশ্বাসেই সব উড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। আজ তাই মন আমার একেবারে হালকা। একটুখানি বোঝা শুধু রয়ে গেছে; উঠতে বসতে বুক চেপে ধরে। সেইটেই আজ হুজুরের পায়ের উপর ফেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

কথাটা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইলাম।

মুন্সী আরো একটু কাছে সরে এসে হাত জোড় করে বলল, বলতে সাহস হয় না। কিন্তু না বলেও আমার উপায় নেই। হাজার পাঁচেক টাকা

আমার লুকানো আছে এক জায়গায়। সেটা আমি হুজুরের হাতে দিয়ে যেতে চাই।

সবিস্ময়ে বললাম, আমার হাতে! আমি এ টাকা নিয়ে কি করবো?

—বিলিয়ে দেবেন, যেখানে খুশি। ইচ্ছা হয় কোনো ভাল কাজে খরচ করবেন। তবু মরবার সময় এইটুকু জেনে যেতে পারবো, বদরুদ্দিন ডাকাতের গোটা জীবনটাই বিফলে যায়নি। অনেক দয়াই তো হুজুর করেছেন এই খুনীটাকে। তার শেষ আব্দারটুকু পায়ে ঠেলবেন না।

সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। তার সংগে আমার যে সম্পর্ক, তার গুপ্তধনের ভার গ্রহণ আমার পক্ষে আইনসঙ্গত নয়, নৈতিক দিক দিয়েও অসঙ্গত। এই জাতীয় অবাঞ্ছনীয় প্রস্তাব তার পক্ষে অন্যায় স্পর্ধা বলেই মনে হল। কিন্তু কি দেখেছিলাম, জানি না, সেই পরস্বাপহারী নরহন্তার মুখের উপর, কি শুনেছিলাম তার বেদনার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে, রূঢ় উত্তর আমার মুখে এসেও আটকে গেল। সোজা জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, নিজের লোক কি তোমার কেউ নেই যে, অতগুলো টাকা বিলিয়ে দিতে চাইছ?

মুন্সী একটু হেসে বলল, নিজের লোক! নিজের লোকের অভাব কি, বড়বাবু? সবাই আছে। তিন-তিনটা বিবি, ছেলেমেয়ে, নাতী, নাতনী, তাদের আবার ছেলেমেয়ে। না আছে কে? আপনি বলবেন, কেউ তো আসে না একটু খোঁজখবর নিতে। তবু তারা আছে। আরো কিছু টাকা আমার রয়ে গেছে, এ খবরটা জানাজানি হলেই আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে ধন্না দেবে আপনার ঐ জেলের মাঠে। এমন মড়াকান্না কাঁদবে হয়তো আমার চোখেই জল এসে পড়বে। এই বুড়ো বয়সে অতোটা দরদ তো সইতে পারবো না। আপনার লোক মাথা খুঁড়ে মরবে, তাও চোখের ওপর দেখতে চাই না। কাজেই আমার এ টাকার কথা তারা কোনোদিন জানবে না।

—বেশ, তাদের না হয় না দিলে। কিন্তু টাকার দরকার তোমার নিজেরও তো কম নয়। অত বড় মামলা তোমার মাথার ওপর!

মুন্সীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, মামলার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টাই যদি করবো, তাহলে আজ এখানে আসবার কি দরকার ছিল, বড়বাবু?

তা বটে। ভূতনাথবাবুর কথা মনে পড়ল। মুন্সীর এই ধরা-পড়া এবং স্বীকারোক্তির মধ্যে কী একটা রহস্য আছে। সে রহস্য উদ্ঘাটনের কৌতূহল

যতই থাক, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না বলে চুপ করে রইলাম। মুন্সী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, আরজি আমার মঞ্জুর হল তো, হুজুর?

বললাম, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি, মুন্সী। তেমনি তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু একটা কথা জানতে চাই। বল তো, তোমার ইচ্ছাটা কি? কাকে তুমি দিয়ে যেতে চাও তোমার এই শেষ সম্বল? কিভাবে, কার হাতে দিলে তুমি শান্তি পাও?

মুন্সী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শূন্য দেয়ালের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আপনি আমার বাপ, আমার জীবনদাতা। আপনার কাছে লুকোবার আমার কিছুই নেই। এ সংসারে একটা মানুষ আছে, যার হাতে এই সামান্য টাকাটা তুলে দিতে পারলে আমার মনের বোঝা নেমে যায়। আমি মহানন্দে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারি। কিন্তু একথাও জানি, সে আমার টাকা পা দিয়েও ছোঁবে না। যে চরম সর্বনাশ আমি তার করেছি, দুনিয়ার সমস্ত টাকা ঢেলে দিলেও তার কোনোদিন পূরণ হবে না।

টেবিলের উপর টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—হ্যালো!

কোর্ট থেকে খবর দিচ্ছে, জজসাহেব একটা জটিল মামলার এইমাত্র চার্জ বোঝানো শেষ করেছেন। জুরী মহোদয়গণ দরজা বন্ধ করলেন। কখন খুলবেন, নিশ্চয় করে বলা যায় না। অতএব আসামীদের ফিরতে অনেক রাত হবার সম্ভাবনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। জানালা দিয়ে দেখা গেল দূরে আকাশের গায়ে অস্তমান সূর্যের বর্ণচ্ছটা। সেই দিকে চেয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল মুন্সী। আমিও উঠলাম। লক-আপ পর্বের আয়োজনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। যেতে যেতে বললাম, আবার কবে আসছ?

আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, যেদিন আবার হুকুম পাবো।

কয়েকদিন পরে তেমনি সময়ে সেই জায়গাটিতে বসেই শুনলাম তার অসমাপ্ত আত্মকাহিনী, নরঘাতক দস্যুর বিচিত্র জীবনের এক অপূর্ব অধ্যায়। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সেদিন বিপুল ঘনঘটা। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ। মনে হচ্ছিল, প্রলয় আসন্ন। সেই-

দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে বসে রইল মুন্সী। তারপর ধীরে ধীরে অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেল তার শত দুষ্কর্মের সুদীর্ঘ বিবরণ।

আজ এতদিন পরে আমার কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এর চেয়ে হাস্যকর ব্যর্থতা আর হতে পারে না। তবু এইটুকু আমার সান্ত্বনা —নিজের ভাষা ও ভাষ্য দিয়ে তাকে আমি বিকৃত করিনি, ব্যাহত করিনি তার স্বচ্ছন্দ সারল্য। এ কাহিনীর কথা মুন্সীর, সুরও তারই। আমি অক্ষম লিপিকার মাত্র।

মুন্সীর কাহিনী শুরু হল ঃ—

কালীগঞ্জের সীতানাথ দত্তের বাড়িতে ডাকাতি করবো—এটা আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা। লোকটা টাকার কুমির, কিন্তু ভয়ানক ধড়িবাজ। টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি বাড়িতে বিশেষ কিছুই রাখে না, সব থাকে ব্যাঙ্কে। মস্ত বড় কারবার। চারখানা গোরুর গাড়ি। সবগুলো তার নিজের কাজেই খাটছে দিনরাত। তার একখানার গাড়োয়ান করে ঢুকিয়ে দিলাম আমার দলের এক ছোকরাকে। সেই একদিন খবর নিয়ে এল, দত্তমশায়ের মেয়ের বিয়ে। ঐ একটিই মেয়ে। জামাইও আসছে বড় ঘর থেকে। বিয়েতে মস্ত ধুমধাম হবে। বড়লোক কুটুম্বও আসবে অনেক। বিয়ের রাতে হানা দিতে পারলে নগদে গয়নাতে হাজার পঞ্চাশের বুঝি যে পাওয়া যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে দত্তমশায়ের দুটো বন্দুক আছে, হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। বাড়িতে লোকজনও থাকবে কম নয়। কাজেই আয়োজনটা বেশ বড় রকমের হওয়া দরকার। সেদিক থেকে অসুবিধা কিছু নেই। দল ঠিক করে ফেললাম। তা ছাড়া—

এই পর্যন্ত বলে মুন্সী হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল ভাবছে, যেটা মুখে এসেছিল, তাকে মুখের বাইরে আনা ঠিক হবে কিনা। একবার আমার দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই যেন সব সঙ্কোচের বাধা ঠেলে দিয়ে বলল, নাঃ লজ্জা করলে তো চলবে না। এ পাপমুখে সবই যখন কবুল করেছি হুজুরের কাছে, এটাও লুকোবো না।

হুজুর জানেন, এক একটা ডাকাতিতে কত বড় বড় গেরস্তকে আমরা পথের ফকির করে ছেড়ে দিই। দশজনে বলাবলি করে, লোকটার কি সর্বনাশ হয়ে গেল! বাইরে থেকে ঐটুকু দেখা যায়, কিন্তু আসল সর্বনাশ যে কন্দুর গিয়ে পৌঁছোয় তার খবর আপনারা রাখেন না। লোকের ধনপ্রাণ কেড়ে নিয়েই আমরা ক্ষান্ত হই না, কেড়ে আনি মান, আর তার চেয়েও বড় জিনিস—

মেয়েদের ইজ্জত। বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, আর বৌ-ঝিদের ধর্ম নষ্ট হয়নি, এ রকম ঘটনা আমি অন্তত একটাও জানি না। শিকারীর দলে যেমন কতক-গুলো লোক থাকে, যারা বনবাদাড় ভেঙে পিটিয়ে হৈ হল্লা করে শিকার ধরবার সুবিধে করে দেয়, আমরাও তেমনি একদল গুণ্ডা নিয়ে যাই, যাদের কাজ হল, মার-ধোর, খুন-জখম আর চেঁচামেচি। এদের নজর রুপোর দিকে যতটা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে রূপের দিকে। আমরাও তাই চাই। এগুলোকে দিয়ে আমাদের ডবল লাভ। গোটাকয়েক মেয়েমানুষের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আসল কাজ হাসিল করে নিই; আর ভাগ-বাঁটোয়ারার বেলায় যা হোক কিছু দিলেই চলে যায়। দেখতে ভাল বলে দত্তবাড়ির মেয়েদের নাম-ডাক ছিল। তার ওপর এই বিয়ে উপলক্ষ্যে শহর থেকে যারা আসবে, তারা তো আর এক কাঠি সরেশ। কাজেই গুণ্ডা আসতে লাগল দলে দলে। ওরি মধ্য থেকে বেছে বেছে একদল জোয়ান ছোকরা ঠিক করে ফেললাম।

শীতের রাত। বারোটার মধ্যেই বিয়ের গোলমাল মিটে গেল। যারা খেতে এসেছিল, সব চলে গেল। বরযাত্রী আর দূরের কুটুম্বরাও শুয়ে পড়েছে। এমনি সময়ে আমরা মার মার শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাড়িটা ঘিরে ফেলা হল প্রথম চোটেই। খোট্টা দারোয়ানগুলোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। বরযাত্রীদের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে, ঢুকে পড়লাম বাড়ির মধ্যে। মেয়ে-মহলে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল। বাছা বাছা লোক নিয়ে উঠলাম গিয়ে দোতলায়। বাহাদুর লোক বটে সীতানাথ দত্ত। যেন কিছুই হয়নি, এমনি-ভাবে বেরিয়ে এসে বলল, তোমাদের সর্দার কে? মুখে রং-টং মাখা ছিল। এগিয়ে গেলাম। দত্তমশাই বলল, এই নাও চাবি। ঐ ঘরে সিন্দুকে টাকা আছে। গয়নাও বেশ কিছু আছে। নিয়ে যাও। কাপড়-চোপড় আছে, তাও নিতে পার। মেয়েদের গায়ে যে সব গয়না আছে, তাও খুলে দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

—কি কথা?

—যদি হিন্দু হও, নারায়ণের দিব্যি, যদি মোছলমান হও, আল্লার দিব্যি, মেয়েদের গায়ে যেন হাত দেয় না কেউ।—বলে এগিয়ে এসে এই হাত দুটো জড়িয়ে ধরে দত্তমশাই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ধরা গলায় বলল, ডাকাতের সর্দার হলেও তুমি মানুষ। আমারই দেশের মানুষ। তোমার ঘরেও মা-বোন বৌ-ঝি আছে। এইটুকু শুধু তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

ডাকাতি অনেক করেছি, বড়বাবু। কান্নাকাটিও কম শুনিনি। ও সব

আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু দত্তমশায়ের চোখের জলে. মনের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কথা দিলাম। বললাম, গয়নাগাটি খুলে দিয়ে মেয়েদের সব একটা ঘরে চলে যেতে বলুন। ও'দের কোনো বিপদ নেই।

দত্তমশাই চলে গেল। আমি আমার দলবল জড়ো করে কড়া হুকুম দিলাম, টাকাকড়ি, জিনিসপত্তর যা পাও লুঠ কর। কিন্তু সাবধান, জেনানা হারাম।

কাজ শেষ হতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল না। সবাইকে নিচে যাবার হুকুম দিয়ে ভাবলাম, তেতলাটা একবার নিজের চোখে দেখে আসি। সীতানাথ দত্ত ঘড়েল লোক। কিছু আবার লুকিয়ে টুকিয়ে রাখেনি তো ওখানে?

তেতলায় একখানা ঘর। অন্ধকার। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে টর্চ ফেলতেই আলো পড়ল একটি মেয়ের মুখের ওপর। চমকে উঠলাম। এ কে? কোত্থেকে এল ও? একেবারে অবিকল সেই। সেই নাক, সেই চোখ, তেমনি জোড়া ভুরুর উপর ছোট্ট একখানি কপাল। আমার কত আদরের নুরু। পরীর মত মেয়ে। আমার ছেলেবেলার দোস্ত ছিল মতীশ; কলেজে পড়ত তখন। সাধ করে নাম দিয়েছিল নুরজাহান। আট বছর আগে এমনি দামী বেনারসী পরিয়ে গা-ভরা জড়োয়া গয়নায় সাজিয়ে মাকে আমার শ্বশুরের ঘরে পাঠিয়েছিলাম। আর ফিরে আসেনি।

মেয়েটা চীৎকার করে কাকে জড়িয়ে ধরল। টর্চ নিবিয়ে দিলাম। বেশ করে রগড়ে নিলাম চোখ দুটো। এ আমার কী হল? কি ভাবছি ছাই-ভস্ম? কে ঐ মেয়েটা? সীতানাথ দত্তের মেয়ে। ওরি হয়তো বিয়ে হল খানিকক্ষণ আগে। আবার টর্চ জ্বাললাম। ভারী ভারী গয়নার উপর জড়োয়ার পাথরগুলো ঝলমল করে উঠল। হাজার দশেক টাকার মাল। ভাগ্যিস ওপরে এসেছিলাম। দত্তটা এক নম্বর জোচ্চোর। ধমক দিয়ে বললাম, খুলে দাও গয়না। কে যেন মুখ চেপে ধরল। স্বর ফুটল না। নুরুর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের ওপর। সেই আট বছর আগে শেষবারের মত দেখা বিয়ের-সাজ-পরা নুরজাহান। ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে উঠল একবার। কি বলতে চায় সে? এ গয়না আমার নেওয়া হবে না—এই কথাই যেন শুনতে পেলাম তার মুখে।

ফিরে এলাম। সোজা নীচে নেমে গেট পার হয়ে, ছুটলাম মাঠের দিকে।

দলের লোকগুলো ঐখানেই কোথাও অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। মনে হল, কে যেন আমার ঘাড় ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। খানিকক্ষণ ছুটবার পর হঠাৎ থমকে গেলাম। এ কী করছি! মাথাটা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল? এরকম তো কোনোদিন হয়নি। সীতানাথ দত্তের দুটো মিষ্টি কথা শুনে বদরুদ্দিন ডাকাতের মন ভিজে গেল! কথার খেলাপ করে বসলাম নিজের দলের সঙ্গে। যে লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলাম ঐ ছোঁড়াগুলোকে, তার ধারেও তারা ঘেঁষতে পেল না, আর সেটা আমারই জন্যে। এলাম ডাকাতি করতে। ফিরে যাচ্ছি দশ হাজার টাকার গয়না ফেলে রেখে। ভীমরতি আর কাকে বলে?

মাথাটায় বেশ কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়ে মনে হল যেন নেশার ঘোর কেটে গেছে। ঢুকলাম আবার দত্তবাড়ির ফটকে। সোজা তেতলায় উঠে গেলাম। ঘর খোলা। টর্চ জেবলে যা দেখলাম—

হঠাৎ আবার থেমে গেল মুন্সী। দুটো বড় বড় চোখ শূন্য, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঐ ফাঁকা দেয়ালটার দিকে। ঐখানেই যেন ফুটে উঠেছে সেদিনের দেখা কোনো বীভৎস দৃশ্য। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি আবার সহজ হয়ে এল। দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, যা দেখলাম আমার কাছে নতুন কিছু নয়, বড়বাবু। সারা জীবন কত দেখেছি। খুন আর বলাৎকার—এই তো আমার পেশা। এই হাতে কত লোক গলা টিপে মেরেছি, ছোরা বসিয়েছি বুকে, ল্যাজার এক ঘায়ে খতম করেছি, রামদার এক কোপে নাবিয়ে দিয়েছি ধড় থেকে মুণ্ডু। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। এতটুকু বুক কাঁপেনি। মাথাও ঘোরেনি একবার। মেয়েমানুষের সর্বনাশ? তাও কম করিনি। কত মেয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তবু রেহাই পায়নি। কত বড় বড় ঘরের ঝি-বৌ এই পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে বলেছে, তুমি আমার ধর্মের বাপ, আমি তোমার মেয়ে। হাসি পেয়েছে সে-সব মড়াকান্নার বহর দেখে। কিন্তু আজ আমার এ কী হল? ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, মাথাটা ঘুরে গেল। দেয়াল ধরে সামলে নিলাম। দেখলাম দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে একটি জোয়ান ছেলে। রাজাবাদশার মত রূপ; পরনে বরের পোশাক। বুকের বাঁ দিকটায় বিঁধে রয়েছে একখানা ছোরা। সবটাই বসে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু বাঁট। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাসরঘর আর তার মাঝখান জুড়ে ভেলভেটের জাজিম। রক্তে-ভেজা বিছানার একপাশে অসাড় হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে মেয়েটা, আর আমারই একটা

জানোয়ার—। চুল ধরে টেনে তুললাম শুয়োরটাকে। মুখটা তার ঠুকে দিলাম দেয়ালের গায়ে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ছুটল। চার-পাঁচটা দাঁত ভেঙে বেরিয়ে গেল। আর দু-এক ঘা খেলেই সাবাড় হয়ে যেত শালা। কিন্তু ছেড়ে দিলাম। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে কী লাভ? লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বারান্দায়।

ছেলেটির নাড়ী ধরলাম। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম। নেই। তারপর এগিয়ে গেলাম তার দিকে। মেয়ে তো নয়, যেন একরাশ কাঞ্চন ফুল। কে বলে নুরু নয়? এই তো আমার নুরজাহান। এত রূপ কি মানুষের হয়? বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে সীতানাথ দত্তের ঘরে। আমারি মেয়ে সে। আজ বিয়ের রাত না পোহাতে আমারি হাত দিয়ে এল তার সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে চরম সর্বনাশ।......

কিছুক্ষণ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্ষণ-মুখর বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ঘনায়মান অন্ধকারে মুন্সীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। উঠে গিয়ে আলোটা জেলে দিলাম। চমকে উঠলাম। বদর মুন্সীর চোখে জল। না; ভুল করিনি। দুটি রোগপাণ্ডুর গণ্ডের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নির্বাক অশ্রুধারা। বললাম, থাক, মুন্সী, এসব কথা বলে আর কি হবে? এতে আজ কারোই কোনো লাভ নেই। মুন্সী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, না হুজুর, মেহেরবানি করে আর একটু শুনুন। লাভ থাক, আর নাই থাক, সব কথা আজ আমাকে বলতেই হবে। আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবো?

আমি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে গুছিয়ে বসলাম। মুন্সী শুরু করল।

ঘরের কোণে একটা সোরাই ছিল। কয়েকবার চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে ও চোখ মেলে তাকাল। অনেক বছর আগে আমার নুরুও এমনি করে চাইত। কিন্তু কত তফাত। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ডাক্তার! একজন ডাক্তার চাই। ভুলে গেলাম আমি কে, কোথায় যাচ্ছি, ডাক্তার ডাকবার আমার কি অধিকার। শুধু মনে হল ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। সিঁড়ির মুখেই আটকা পড়ে গেলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আমার কেউ নয়। আমি তাদের বাড়ি এসেছি

ডাকাতি করতে। আমারি জন্যে আজ একফোটা কচি মেয়ে দুনিয়ার সব কিছু হারিয়ে সংসারের বাইরে চলে গেল।

ভূতনাথবাবু মিথ্যা বলেননি, হুজুর। যারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল ইচ্ছে করলে তাদের সবগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু হাত আমার উঠল না। কেবলি মনে হতে লাগল, এই শেষ। বদর মুন্সীর কবর খোঁড়া হচ্ছে। গিয়ে শুধু ঘুমিয়ে পড়া। লাঠি, সড়কি, লোহার ডাণ্ডা—অনেক কিছুই চারদিক থেকে এসে পড়ছিল আমার মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে। যতক্ষণ পেরেছি দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর কখন পড়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন হল, চোখ মেলে প্রথমেই দেখলাম পাশে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়ি। একজন মাথায়-রুমাল-বাঁধা দেশী মেমসাহেব ছুটে এল। বুঝলাম, নার্স। কাছে এসে আমার নাড়ী দেখল, তারপর একটা শিশি থেকে খানিকটা ওষুধ গেলাসে ঢেলে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে একটু যেন বল পেলাম। অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় ?

—এটা সরকারী হাসপাতাল। ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেবো ?

হাত নেড়ে বললাম, চাই না। হাকিম—হাকিম চাই একজন।

একজন পুলিশের দারোগা এলেন। আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হাকিম কেন ?

—একরার করবো।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তখনো আমার জ্ঞান ছিল, কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল খুব। একরারী আসামীর জবানবন্দী—কত ঝঞ্ঝাট, সে তো আপনি জানেন। লিখবার আগে তাকে সাবধান করে দিতে হবে, সময় দিতে হবে ভেবে দেখবার। হাকিমদের কত কি সব নিয়ম আছে। আমি বললাম, ওসব আইনকানুন চটপট সেরে ফেলুন, হুজুর। সময় বেশী দিলে এ জীবনে আর সময় হবে না।

বলবার কথা সামান্য। কোনোরকমে থেমে থেমে বলে গেলাম। সবটুকু বোধ হয় বলতে পারিনি। তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তারপর কখন কি করে ওরা আমাকে হুজুরের আশ্রয়ে নিয়ে এল, কিছুই জানি না। সরকারী হাসপাতালের কর্তারা বোধ হয় মনে করেছিলেন, মড়াটা আর তাদের ওপর চাপে কেন ? ফেলে দাও জেলের ঘাড়ে। কিন্তু তারা

জানত না, এখানে আমার বাবা আছেন। তাঁর দয়ায় আমার মরা ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

মুন্সীর কাহিনী শেষ হল। আমি তার শেষ প্রসঙ্গের জবাব দিলাম। বললাম, এর মধ্যে আমার দয়া তো কোথাও কিছু নেই, মুন্সী। যেটুকু কর্তব্য, তাই শুধু করেছি। বরং কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে, সেটা ডাক্তারের। সে যাক। একটা কথা শুধু বুঝতে পারছিনে। অপরাধী তার কৃত-অপরাধ স্বীকার করেছে, এটা নতুন নয়, অদ্ভুত কিছুও নয়। কিন্তু যে-অপরাধ সে করেনি, তারই বোঝা স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে হাকিম ডেকে হলপ করে বলেছে, এটা আমি করেছি—এরকম তো কখনো শুনিনি। এর মধ্যে বাহাদুরি থাকতে পারে, কিন্তু একে সৎসাহস বলে না। ডাকাতি তুমি করেছ। তার সমস্ত দায়িত্ব তোমার। কিন্তু ঐ মেয়েটি আর তার স্বামীর উপর যে জঘন্য অত্যাচার ঘটল সেদিন, তার দায়িত্ব তো তোমার নয়। সাধ করে দুটো মারাত্মক মিথ্যা অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফাঁসির দড়ির সামনে গলা বাড়িয়ে দেবার সার্থকতা কোথায়, আমি দেখনে পাইনে।

মুন্সী বিনীত কণ্ঠে বলল, হুজুর জ্ঞানী লোক, আমি মুখ্যু ডাকাত। হুজুরের সঙ্গে তর্ক করা আমার গোস্তাকি। তর্ক আমি করছিনে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করতে পারিনে, মেয়েটার কপালে যা কিছু ঘটল, তার সবটুকুর মূলেই তো আমি। ঐ জন্তুটাকে আমিই তো জুটিয়েছিলাম। যে জন্যে জুটিয়েছিলাম, ঠিক তাই সে করেছে। চুক্তির বাইরে সে যায়নি। কথার খেলাপ যদি কেউ করে থাকে, সে আমি। সীতানাথ দত্তের কথায় ভুলে যে হুকুম আমি জারী করেছিলাম, সে অন্যায় হুকুম। ঐ গুণ্ডাটা যদি সে মানা না মেনে থাকে, তার জন্যে তাকে দোষ দিই কেমন করে?

বুঝলাম, মন তার যে পথ ধরে ছুটে চলেছে, আমার ন্যায়-অন্যায়ের শুষ্ক লজিক সেখানে অচল। হয়তো ওর কথাই ঠিক। আর একথাও সত্যি যে, দৈবক্রমে ঐ মেয়েটার মুখে যদি ওর নুরুর মুখের আদল সেদিন চোখে না পড়ত, আজ আমার কাছে বসে বদর মুন্সীর এ কাহিনী শোনাবার কোনো উপলক্ষ্য ঘটত না। এ সংসারে ঐ নুরুই ছিল তার একমাত্র বন্ধন। সে বন্ধন একদিন অকালে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ক্ষত রেখে গিয়েছিল ঐ দানব-প্রকৃতি দস্যুর বুকের কোণে, সেটা হয়তো চিরদিন তার অগোচরে থেকে যেত। হয়তো চিরদিনই এমনি

কত শত সীতানাথ দত্তের মেয়ে তার লোভ আর লালসার আগুনে আহুতি দিয়ে যেত তাদের অনিন্দ্য রূপ, অমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, আর অত্যাজ্য সতীধর্ম। কিন্তু তা হল না। বদর মুন্সীর বিচিত্র জীবন-নাট্যে দেখা দিল এক প্রলয়-রাত্রি। আট বছরের ওপার থেকে নববধূ বেশে ফিরে এল তার নূরজাহান। ফিরে এল, কিন্তু বদর মুন্সী তাকে ফিরে পেল না। তার নিজের হাত দিয়েই এল নির্দয় আঘাত। নির্মূল হয়ে গেল ঐ মেয়েটার স্বামী, সম্ভ্রম, তার নারী-জীবনের সমস্ত শোভা ও সম্পদ্। নতুন করে মৃত্যু হল নূরজাহানের। আট বছরের পুরানো ক্ষত-মুখ থেকে আজ শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ। নিজেকে নিঃশেষ না করে এ বেদনার উপশম নেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে মেঘাড়ম্বর স্তব্ধপ্রায়। বদর মুন্সীর সেলের লোহতোরণ অনেকক্ষণ আগে থেকেই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার নিশ্চয়ই মনে নেই; আমিও মনে করিয়ে দিইনি। জমাদার কয়েকবার নিঃশব্দে পায়চারি করে গেছে জানালার সুমুখ দিয়ে। এই দুর্দান্ত ডাকাতের জন্যে তাদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। তবু উঠব উঠব করেও যেন উঠতে পারছিনে।

মুন্সী আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়ে ধীরে ধীরে বলল, হুজুর ফাঁসির দড়ির কথা বলছিলেন। ও জিনিসটাকে আর ভয় নেই। ফাঁসিতে যাওয়াই আজ সবচেয়ে ভালো যাওয়া। এক নিমেষে সব শেষ। কিন্তু এই তিলে তিলে মরা, এ মরণ তো আর সহ্য হয় না! না, এ আমার আপসোস নয়। জীবনে যা কিছু করেছি, যত পাপ, যত অন্যায়, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। মৌলবী সাহেবরা যাই বলুন, তার জন্যে তওবা করবারও কোনো চাড় নেই আমার মনে। বুকের ভেতরটা শুধু জ্বলতে থাকে, যখন ঐ মেয়েটার মুখ মনে পড়ে। রাতে ঘুম নেই, দিনে স্বস্তি নেই। সমস্ত শরীরে শুধু জ্বালা। হতভাগীর যা হবার, তা তো হল। তারপর? সারাটা জীবন কেমন করে কাটবে ওর? যে শ্বশুরঘর ও দেখতেও পেল না, সেখানে জায়গা হবে না। বাপের বাড়ির আশ্রয়, তাও হয়তো ছাড়তে হবে। আজ না হলেও কাল। বিয়ের রাতে বিধর্মী ডাকাত এসে যার ধর্মনাশ করে গেল, হিন্দুর ঘরে সে মেয়েকে কি চোখে দেখেন আপনারা, সে তো আমি জানি। ঐ রকম সব মেয়ের যা গতি, ওকেও কি সেই পথে যেতে হবে? সন্ধ্যার পর সেজেগুজে দাঁড়াতে হবে ঐ বাজারের গলিতে? ওখানে

যারা থাকে, তাদের কতজনকে তো আমি জানি। এই রাস্তা ধরেই তারা একদিন ভেসে এসেছিল। ঐ ফুলের মত মেয়ে, কোনো দোষ যে করেনি, দুনিয়ার কোনো পাপের ছোঁয়াচ যার গায়ে লাগেনি, তাকেও গিয়ে পচে মরতে হবে ঐ দোজকের পাঁকের মধ্যে? আমার সর্বস্ব দিয়েও কি তাকে বাঁচাবার উপায় নেই?

এই নিষ্ফল প্রশ্নমালার আমি কি উত্তর দেবো? আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অগ্নিগোলকের মত তার দুটো চোখের পানে। সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম তার দাহ। প্রশ্নবাণ নিরস্ত হল। কিন্তু তার উত্তেজিত ভগ্নকণ্ঠের দুঃসহ বেদনা সমস্ত ঘরময় অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল।

মেয়েটার যে বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ আজ ওর কল্পনায় ভেসে উঠেছে, একদিন যে সে বাস্তবের রূঢ় রূপ ধরে দেখা দেবে না, কেমন করে বলি? কিন্তু সে পরিণাম যদি সত্যি দেখা দেয়, মুন্সী তাকে রোধ করবে কি দিয়ে? কি কাজে লাগবে ওর সযত্ন-সঞ্চিত গুপ্তধন?

একথাটা আমি যেমন করে বুঝেছি, এই বহুদর্শী অভিজ্ঞ দস্যু তার তীক্ষ্ন বুদ্ধি দিয়ে তার চেয়ে কম বোঝেনি। কিন্তু মানুষের জীবনে বুদ্ধির স্থান কতটুকু? কটা প্রশ্নের জবাব সে দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত? কটা সমস্যার সমাধান? Raitonal animal বলে মানবজাতির পরিচয় আছে দর্শনের পাতায়। শুনতে পাই, এইটাই নাকি তার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র জীব-জগতে মানুষ যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, তার মূলেও শুনি তার ঐ Raitonalism. সেজন্যে গর্ববোধ করতে চান করুন। কিন্তু একথা অস্বীকার করি কেমন করে যে, আমার মধ্যে যতটুকু Raitonal তার অনেক বেশি animal?

জ্ঞানগর্বী মানুষ এই সহজ সত্যটা মেনে নিতে লজ্জাবোধ করে। বুদ্ধিজীবী বলে তার অহঙ্কারের অন্ত নেই। ন্যায়শাস্ত্রের ধরাবাঁধা ফরমুলা দিয়ে সে বাঁধতে চায় তার দৈনন্দিন কর্মধারা। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে, কোথায় থাকে তার Logical Syllogism? শতছিন্ন হয়ে যায় তার হিসাবনিকাশের জটিল সূত্র। সেদিন যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সে তার মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়; হেড নয়, হার্ট—যার রহস্যময় ভাষার নেই কোনো আভিধানিক অর্থ, কোনো থিওরির কাঠামোতেও যাকে বাঁধা যায় না।

মুন্সীর জীবনে ঝড় উঠেছিল। তাই যে প্রশ্ন নির্গত হল তার বিক্ষত বক্ষ আলোড়িত করে, সেও এমনি অর্থহীন। নির্বিকার নৈঃশব্দ্যে আমি শুধু তার শ্রোতাই রয়ে গেলাম। তার ব্যাকুল দৃষ্টি তখনো আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, সাগ্রহ উত্তর-প্রতীক্ষায় উন্মুখ। আমি দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালাম। রাত আটটা বেজে পনের। চোখ নামিয়ে তার দিকে ফিরে বললাম, জমাদার দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে এবার বন্ধ হতে হবে, মুন্সী।

দিনকয়েক পরে ভূতনাথবাবু আবার এসে উপস্থিত। তেমনি হঠাৎ এবং হন্তদন্ত।

—কি ব্যাপার?

—মুন্সীটাকে একবার আনতে পাঠান তো?

—নতুন করে বাজিয়ে দেখবার মত পেলেন নাকি কিছু?

—একটা দাঁতভাঙ্গা গুণ্ডা ধরা পড়েছে। সন্দেহ হচ্ছে ওরই দলের লোক। দেখি, কিছু বলে কিনা। ব্যাটাকে একটু একলা পেলে সুবিধে হয়।

—বেশ তো, তাই হবে।

পাশের ঘরে ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ভূতনাথবাবু যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ দেখে আশান্বিত হওয়া গেল না।

—সুবিধে হল দাদা?

উনি মুখ বিকৃত করে বললেন, কিছু না, কিছু না। very hard nut মশাই। আমার দাঁত ভাঙ্গল, দাঁতভাঙ্গাটার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

দাঁতভাঙ্গা লোকটা জেলে এসে গেল তার পরদিন। মুন্সীকে এক সময় ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি সেই?

মুন্সী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হুজুরের কাছে লুকোবো না। কিন্তু আর কাউকে তো একথা বলতে পারি না।

মাসখানেকের মধ্যেই মামলা শুরু হয়ে গেল। পুলিশের তৎপরতার ত্রুটি ছিল না। বদরুদ্দিন মুন্সীর সহ-আসামী বলে একদল লোককে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হল। তাদের দেখে ওর হাসি আর ধরে না—এরা ছিল

নাকি আমার সঙ্গে? কি জানি? ছিল হয়তো আগের জন্মে। এ জন্মে তো এর কোনোটাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে মুন্সী কোনো উকিল দেয়নি। খুনী আসামী বলে সরকারী ব্যয়ে উকিল নিযুক্ত হল। স্থানীয় বারের একজন উদীয়মান ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার। তিনি এসে পরামর্শ দিলেন কনফেশনটা retract কর। বল, পুলিশের ভয়ে কি বলেছি, মনে নেই। মারের চোটে মাথা ঠিক ছিল না। এ মামলার কিছুই জানি না আমি। ব্যস্। বাকীটা রইল আমার হাতে। নির্ঘাত খালাস করে দেবো।

মুন্সী হেসে বলল, ভয় নেই, বাবু। কনফেশন করলেও মামলাটা যাতে অনেকদিন চলে, সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। ফী আপনার মারা যাবে না।

মামলার প্রথম দিন পাঁচটার সময় কোর্ট যখন উঠতে যাবেন, মুন্সী জোড় হাত করে বলল, ধর্মাবতার, আপনার এজলাসে আমাকে যে বসবার অনুমতি দিয়েছেন, তার জন্যে খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আর একটা বেয়াদপি মাপ করবেন। বসে বসে আর ঐ একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে বড্ড ঘুম পেয়ে যায়। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, কসুর নেবেন না।

হাকিম প্রবীণ ব্যক্তি। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রধান আসামীর দিকে। যে-মামলাকে বলা যেতে পারে তার ফাঁসি-মঞ্চের প্রবেশ-দ্বার, তার কথা শুনতে গিয়ে ঘুম পেয়ে যায়, এরকম ঘুম বোধ হয় তাঁর দীর্ঘজীবনে আর কখনো দেখেননি।

এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন বেলা এগারটার সময় ভূতনাথবাবুর আবির্ভাব।

—সর্বনাশ হয়ে গেল, মশাই।

—কী হল?

—মুন্সীকে একবার কোর্টে পাঠাতে হবে।

—কোর্টে যায়নি সে?

—না। এই দেখুন না?

মুন্সীর ওয়ারেন্টখানা দেখালেন। জেল ডাক্তার লিখে দিয়েছেন তার উপর—unfit to attend Court.

বললাম, অসুস্থ হয়ে পড়লে আর কোর্টে যায় কেমন করে, বলুন?

—অসুস্থ মোটেই নয়। আপনি নিজে একবার খবর নিয়ে দেখুন

নিশ্চয়ই এটা ঐ কালকার ঘটনার জের।

ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ভূতনাথবাবু, সেটা এই ঃ—

মোকদ্দমার উদ্বোধনী বক্তৃতার পর দুদিন হল সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। মুন্সী তো প্রথম থেকেই মামলা সম্বন্ধে উদাসীন। যতক্ষণ আদালতের কাজ চলে, কাঠগড়ার রেলিং-এ হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কাল যে সব সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হল, তাদের মধ্যে একজন ছিল সীতানাথ দত্তের মেয়ে। তাকে যখন নিয়ে আসা হল তখনো ওর যথারীতি নাক ডাকছিল। দু-চারটা প্রশ্ন করবার পর কখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ডকের দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠল মুন্সী। জবানবন্দীর মাঝখানেই কোর্টের দিকে চেয়ে জোড় হাত করে বলল, গোস্তাকি মাপ করবেন, ধর্মাবতার। আমার একরার-নামাটা একবার পড়ে দেখুন। আমি তো সবই কবুল করেছি। সরকার পক্ষের যা কিছু চার্জ, এক কথায় মেনে নিয়েছি সব। তবে আর একে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কেন? রেহাই দিন ওকে। আমি আবার বলছি, এই মেয়েটার চরম সর্বনাশের জন্যে দায়ী আমি। ওর স্বামীকে খুন করেছি আমি, ওদের সর্বস্ব লুট করেছি আমি। আর বলাৎকার? হ্যাঁ, আমি—আমি—উঃ—বলে হঠাৎ বুক চেপে ধরে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

আদালত বন্ধ হয়ে গেল। মুন্সীকে তারপর ধরাধরি করে কয়েদির গাড়িতে করে পাঠানো হল জেলখানায়। মেয়েটাকে নিয়ে গেল হাসপাতাল। তার জ্ঞান ফিরে আসতে লেগে গেল দু ঘণ্টা।

ভূতনাথবাবু বললেন, মেয়েটার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তবু ডাক্তারের মত করিয়ে কোনো রকমে স্ট্রেচারে করে কোর্টে নিয়ে এসেছি। যেমন করে হোক, তার এভিডেন্সটা আজকার মধ্যে শেষ করতেই হবে। এদিকে আসল আসামীই গরহাজির। ওর absence-এ তো trial চলতে পারে না। যেমন করে হোক ওটাকে নিয়ে যেতেই হবে। সবাই অপেক্ষা করছে। কোর্ট বসে আছেন। ট্যাক্সি আমার সঙ্গেই আছে। বলেন তো অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও করতে পারি।

ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মুন্সীর আবার কি হল?

ডাক্তার চিন্তান্বিত মুখে কিছুই না। কাল কোর্ট থেকে ফিরে অবধি খাচ্ছে না, কথা বলছে না। সটান চোখ বুজে পড়ে আছে।

ভূতনাথ গর্জে উঠলেন, বদমাইশি, স্রেফ বদমাইশি, বুঝতে পাচ্ছেন না? মামলাটাকে মাটি করতে চায় শালা। ও জানে, মেয়েটা আজ ফিরে গেলে আর তাকে পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম, ওর কনফেশনের পরেও কি মেয়েটির evidence একান্তই দরকার?

—দরকার বৈ কি? কনফেশনের support-এ যদি অন্য evidence না থাকে, ওর মূল্য কতটুকু? এখানে যদি বা সাজা হয়, হাইকোর্টে গিয়ে টিঁকবে না।

ডাক্তারকে বললাম, কোনো রকমে পাঠানো যাবে না?

পাল্‌সের যা অবস্থা, ভরসা করি না, স্যর।

ভূতনাথবাবুকে নিরাশ হয়েই ফিরতে হল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা। জেলের ভিতরকার জনবহুল রাস্তাগুলো শূন্যপ্রায়। কয়েদিরা সব চলে গেছে যে-যার ওয়ার্ডে। রন্ধনশালার অহোরাত্র "মচ্ছব" আগলে থাকে যারা, তারাও তাদের কালিঝুলি-মাখা জাঙ্গিয়া কুর্তা ছেড়ে, হাতাখুন্তি আর ডাল-মন্থনের ডাণ্ডা সামলে ক্ষিপ্র হস্তে তৈরি হচ্ছে। জমাদারের দল "গিন্‌তি" মেলাতে ব্যস্ত। ডেপুটি বাবুরা নিজ নিজ এলাকায় টহল দিচ্ছেন। লক্‌-আপ্‌ পর্বের সুশৃঙ্খল সমাপ্তির জন্যে সকলের মনেই উৎকণ্ঠা। আমিও চলেছি সদলবলে। প্রাচীর পরিক্রমা শেষ করে পুকুর ধারে এসে পৌঁছেছি, এমন সময় এক ভগ্নদূত এসে 'রিপোর্ট' দিল, টোটাল নেহি মিলতা হ্যায়। অজ্ঞাতসারেই কপালটা ঘেমে উঠল। জেলের চাপরাশ যার স্কন্ধে, তার কাছে এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর নেই। রুক্ষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম হতভাগ্য দূর্মুখের দিকে। সে সকুণ্ঠ বিনয়ের সঙ্গে জানাল, একঠো কমতি হুয়া।

লক্‌-আপ্‌ ইয়ার্ডে এসে দেখলাম, কারো মুখে সাড়া নেই। সমস্ত ওয়ার্ডগুলো দুবার করে গোনা হয়ে গেছে। ফল এক; অর্থাৎ একঠো কমতি হুয়া। হিসাবমত হবে ১৩৪৩, হচ্ছে ১৩৪২। সকলেই নিঃশব্দে অপেক্ষমাণ—এবার কি হুকুম হবে। হুকুম হল—Count again. ব্যারাকে ব্যারাকে আবার সাড়া পড়ে গেল। দুলাইন করে বসল কয়েদীরা। এবার শুধু জমাদার নয়, ডেপুটিবাবুরাও যোগ দিলেন গণনায়। দু, চার, ছয়, আট।......একে একে সবাই আবার ফিরে এল লক্‌-আপ্‌ ইয়ার্ডে। মুখ অন্ধকার।

এবার বাকী রইল শুধু একটিমাত্র পথ—চরম এবং শেষ পন্থা, পাগলা ঘণ্টি। একটা টনা হুইসিল্‌। তারপরেই শুরু হবে সর্বব্যাপী তাণ্ডব। লাঠি আর বন্দুক কাঁধে অহেতুক উল্লম্ফন, গোটা পঞ্চাশেক মশাল জেলে সম্ভব এবং অসম্ভব স্থানে নিষ্ফল অনুসন্ধান, প্রাচীর বেষ্টন করে পুলিশবাহিনীর ব্যর্থ আস্ফালন। অতঃপর দীর্ঘ লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তি। শুষ্ক মুখে নতশিরে ভগ্নদূতের পুনঃপ্রবেশ।

—কি বার্তা?

—একঠো কমতি হ্যায়।

বড় জমাদারের দিকে ফিরে বললাম, সবই তো হল। আর কি? এবার শিঙে ফুঁকে দাও—

—মিল গিয়া মিল গিয়া—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল এক ওয়ার্ডার।

—কোথায়, কাঁহা মিল গিয়া?—এক সঙ্গে আঠারোটা প্রশ্ন।

—ঐ গাছপর—

গাছপর! সদলবলে ছুটলাম সেই দিকে।

হাসপাতালের পিছনে কম্পাউন্ড পাঁচিলের ধার ঘেঁসে একটা অনেক-কালের অশ্বত্থ গাছ। তারই ডালপালার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে দুখানা পা। এগিয়ে গিয়ে সমস্ত দেহটাই দেখা গেল। ধুতি পাকিয়ে তৈরি হয়েছে লম্বা দড়ি। তার একটা দিক ডালে বাঁধা, বাকি দিকটায় ফাঁস দিয়ে গলায় জড়ানো।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঝুলন্ত দেহটাকে নামিয়ে আনা হল। ডাক্তার এসে নাড়ি ধরে মুখ বিকৃত করলেন। জিভ বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো ঠিকরে পড়বে। বীভৎস দৃশ্য। তবু প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারলাম।

জমাদারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ঘণ্টি।......

সেন্ট্রাল টাওয়ারের উপর থেকে 'তিন ঘণ্টি' জানিয়ে দিল, সব ঠিক হ্যায়।

[পনেরো]

রবিবার। বিকেল চারটা বেজে প'য়ত্রিশ। সদলবলে ফাইল দেখছি। লাল-ফিতে-বাঁধা কাগজের ফাইল নয়; আইনের শিকলে বাঁধা মানুষের ফাইল। মানুষ; কিন্তু মানুষের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সজ্জন-সমাজ তাকে বর্জন করেছে, তার মানবতার দাবিকে করেছে প্রত্যাখ্যান। সংসারের সহজ এবং প্রকাশ্য পথ থেকে স্খলিত হয়ে তারা এসেছে দলে দলে অন্ধকার পিচ্ছিল পথ ধরে। ললাটে মুদ্রিত অপরাধীর পঙ্ক-তিলক। সেই সব মানুষের ফাইল দেখছি।

একপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ লাইনটা একবার দেখে নিলাম। পরনে জাঙ্গিয়া কুর্তা, কোমরে বাঁধা গামছা, মাথায় টুপি, বাঁ হাতে টিকিট, ডান হাতটা ঝুলে আছে দেহের পাশ দিয়ে। বুকের উপর আঁটা অ্যালুমিনিয়মের চাকতি। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের এক-একটি জীবন্ত ধারা। ৩৭৯, তার পাশে ৩০২ তারি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ৪২০ কিংবা ৩৯৫—খুনী, তস্কর, নারীমেধভুক, দস্যু, প্রতারক, পকেট-কর্তকের বিচিত্র সমাবেশ। কিন্তু আমার চোখে সে বৈচিত্র্য অর্থহীন। 'এখানে আসিলে সকলেই সমান।' আমার কাছে রামের সঙ্গে শ্যামের যে তফাত সে শুধু নম্বরের। রাম ৭৫৭, শ্যাম ১১০৪। তাদের অপরাধের বিবরণ আমি জানি; জানি না তাদের প্রাক-কারা-জীবনের কোন ইতিবৃত্ত। একথা আমার জানা নেই, রাম বলে যে লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সে তার প্রতিবেশীর হাঁড়ি থেকে চুরি করেছিল একবাটি পান্তা ভাত, আর তার পাশে যে শ্যাম, সে তার প্রতিবেশীর আট বছরের মেয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে দেড়ভরি ওজনের সোনার হার। আমার কাছে তাদের একমাত্র পরিচয়—কয়েদী। এইটুকু মাত্র জেনেই আমি তাদের রিফর্ম করবার ভার নিয়েছি।

আমার কয়েদী বাহিনীর মনের খবর আমি রাখি না। তাই সবার উপরে আমার সমদৃষ্টি, সকলের প্রতি আমার সম আচরণ। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের যে দুস্তর ব্যবধান, আমাদের শাস্ত্র একথা মানে না। তার

মতে রাম ও শ্যাম এক ও অভিন্ন। আহারে, বিহারে, কর্মে, অবসরে, শাসন ও শৃঙ্খলায় একই সূত্রে গাঁথা। মুড়ি এবং মিছরি একই পাত্রে রেখে একই ডিসিপ্লিনের পেষণ-যন্ত্রে আমি তাদের গুঁড়িয়ে চলেছি। যে-বস্তু তৈরি হচ্ছে, তার স্বাদ, গন্ধ, অথবা বর্ণ সম্বন্ধে আমি নির্বিকার।

বর্তমানে আমি যে কার্যে রত, তার নাম সাপ্তাহিক 'ফাইল' পরিদর্শন। জানতে এসেছি কার কি অভিযোগ, কার কি নিবেদন। যদিও জানি সত্যিকার অভিযোগ যদি কিছু থাকে, আমার কাছে তা অনুক্তই থেকে যাবে। কেন না, যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ, আমারি পেছনে চলেছে তাদের দীর্ঘ প্রসেশন।

নালিশ আছে বাবু—

প্রসেশন থেমে গেল।

—কি নালিশ?

বক্তা বোধ হয় সত্তরের গণ্ডি পার হয়ে গেছে। ঝুঁকে, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে কোন রকমে ফাইলের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। টিকেটখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখ তো বাবু, বয়স কত লিখেছে? তার পাশে যে কয়েদীটি দাঁড়িয়ে, দেখে মনে হয়, প্রায় একই বয়সী, তার টিকিটখানাও টেনে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, আর এটাও দ্যাখ।

কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস।

বললাম, ব্যাপার কি, বল দিকিন?

—বলছি। বয়সটা আগে দ্যাখ।

সঙ্গে সঙ্গে অধীর প্রশ্ন—কি লেখা আছে?

এসব বেয়াদপি অসহ্য হল চীফ জমাদারের। খেঁকিয়ে উঠে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম বুড়োর দিকে তাকিয়ে, তোমার বয়স তো দেখছি ৭২ আর ওর ৬৫।

তাহলে তো 'আইটার বাবু'* ঠিকই বলেছে। কিন্তু এ তোমাদের কি রকম বিচার বাবু? আমার ছেলের চেয়ে আমি মোটে সাত বছরের বড়?

—এ লোকটি তোমার ছেলে?

—আমার ছেলে না তো পাড়ার লোকের ছেলে?

এবার আর উত্তেজনা চাপা রইল না। পাশের লোকটি বিনীত কণ্ঠে

* কথাটা "রাইটার" (Writer) অর্থাৎ যে সব লেখাপড়া জানা কয়েদি এদের চিঠিপত্র দরখাস্ত ইত্যাদি লিখবার জন্য নিযুক্ত।

বলল, হ্যাঁ, হুজুর, উনি আমার বাপ। বয়স হয়েছে কিনা; মেজাজটা তাই একটু—

—তুই থাম—গর্জে উঠল বুড়ো। জেল খাটতে এসেছি বলে, যাকে জন্ম দিলাম, তাকে ছেলে বলতে পারব না?

নরম সুরে বললাম, না, না। কে বললে, পারবে না? ওটা আমাদেরই ভুল হয়েছে।

ডাক্তারের দিকে তাকালাম। বেচারার বিশেষ দোষ নেই। বয়স নির্ধারণের ডাক্তারি প্রক্রিয়া কি আছে, জানি না। তবে এরা যে পিতাপুত্র, কেবলমাত্র চোখে দেখে একথা বলতে হলে রীতিমত দিব্যজ্ঞান থাকা দরকার। টিকেট দুখানা ডাক্তারের হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, ডাক্তার চাপা গলায় বলছে, তুমি যে এই কচি খোকাটির বাপ, আগে বললেই পারতে।

বৃদ্ধের সুর চড়া—আমি আবার কি বলবো? তোমার আক্কেল নেই?

'নালিশের' বিষয়বস্তু বেশির ভাগই চিঠি। সাধারণ কয়েদী চিঠি লিখতে পারে দু মাস অন্তর একখানা। বাইরে থেকে যে চিঠি আসে তাদের নামে, তারও একটার থেকে আর একটার ব্যবধান—দু মাস। ডেপুটিবাবুরা টিকেট দেখে তারিখ গুনে গুনে চিঠি মঞ্জুর করে চলেছেন।

—একটা পিটিশন চাই, হুজুর, আবেদন জানাল এক ছোকরা। নাম পানাউল্লা।

—তোর আবার কিসের পিটিশন?

আশপাশে ছোকরা-মত যারা দাঁড়িয়েছিল, সবারই মুখে দেখলাম চাপা হাসি। পানাউল্লা একটু ইতস্তত করে বলল, চাচা লিখেছে, বৌ নাকি নিকা বসতে চায়।

আমি কিছু বলবার আগেই জবাব দিলেন আমার ডেপুটি খালেক সাহেব, নিকা বসবে না তো কি করবে? তুমি মেহেরবানি করে সাত বছর জেলে পচবে, আর কচি বৌটা তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে, না?

পানাউল্লা কিছুমাত্র দমে গেল না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, নিকা বসতে চায়, বসুক। কিন্তু ঐ গয়জদ্দি ছাড়া কি মানুষ নেই দেশে? আমি যদ্দিন ছিলাম, তখন তো ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেখিনি। নেড়িকুত্তার মত ন্যাজ গুটিয়ে বেড়াত। আজ আমি নেই বলে—

তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল হিংস্র পশুর চোখের মত। বুঝলাম,

পানাউল্লাকে যে-বস্তু বিচলিত করেছে, সেটা আসন্ন পত্নী-বিচ্ছেদের আশঙ্কা নয়, তার চেয়েও গভীর এবং জটিলতর। দরখাস্ত মঞ্জুর করতে হল। তবু একবার জিজ্ঞেস করলাম, পিটিশন করে এ-নিকা তুই ঠেকাবি কি করে?

—নিকা ঠেকাতে চাই না, বললে পানাউল্লা, বছির দারোগাকে খালি জানিয়ে দেবো, পানাউল্লা সারা জীবন জেলে থাকবে না। ছাড়া একদিন সে পাবেই।

এর পরে যেসব পিটিশনের আবেদন পেলাম, তার মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরছে; শত্রুপক্ষীয় লোকেরা অত্যাচার করছে, জমিদার খাজনার দাবিতে বাড়িঘর নিলামে চড়িয়েছে, প্রতিকার চাই। এই একই ক্লান্তিকর কাহিনী শুনে আসছি বছরের পর বছর, যেদিন থেকে এই চাপরাশ কাঁধে নিয়েছিলাম। প্রথম জীবনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠত। নির্বিচারে দরখাস্ত মঞ্জুর করতাম; গরম গরম নোট লিখতাম তার উল্টো পিঠে, জাগাতে চেষ্টা করতাম নিষ্প্রাণ কর্তৃপক্ষের নিদ্রাগত কর্তব্যবোধ। মনকে বোঝাতে চাইতাম, প্রতিকার একটা হবেই, যদিও কী সেই প্রতিকার, তার সঠিক চেহারাটা নিজের কাছেও কোনদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আজ আর এই দুঃখের কাহিনী মনকে স্পর্শ করে না। তবু যন্ত্রের মত দরখাস্ত মঞ্জুর করি। কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে আর কোন মিথ্যা ধারণা পোষণ করি না।

বড় বড় মামলার সুদীর্ঘ শুনানির পর সুবিজ্ঞ বিচারক যখন অপরাধীকে সাত, আট, দশ কিংবা বিশ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দেন, আমরা অর্থাৎ সৎ, শিষ্ট এবং ভদ্র ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত হই, জজ সাহেব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর ন্যায়বিচারের গুণকীর্তন ধ্বনিত হয়। কিন্তু একথা বোধ হয় তিনি জানেন না, আমরাও ভেবে দেখিনি—এই কঠোর দণ্ডটা ভোগ করে কে? লোকটা জেলে গেল ঠিকই। এই জেলে যাওয়ার মধ্যে যে দুঃখ আছে, লজ্জা আছে, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি আছে এবং তার চেয়েও বেশি আছে অসম্মান ও অপযশ, তাকে আমি ছোট করে দেখছিনে। স্বাধীনতা-হীনতা এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদের যে বেদনা সদ্য-কারাগতের দৈনন্দিন জীবন ভারাতুর করে তোলে, তার সম্বন্ধেও আমি সচেতন। কিন্তু শুধু এই কারণে যতখানি আহা-উহু আমরা বন্দীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করে থাকি, ঠিক ততখানি বোধ হয় তার প্রাপ্য নয়। নিজের চোখেই দেখেছি, যত দিন যায়, মহাকালের হস্তস্পর্শে মিলিয়ে আসে তার মনের ক্ষত, জুড়িয়ে আসে লজ্জা

আর অপমানের গ্লানি, স্তিমিত হয়ে আসে প্রিয়-বিচ্ছেদের তীব্রতা। দুঃসহ দিন সহনীয় হয়ে আসে। অনভ্যস্ত জীবনের অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের তীক্ষ্ণ-ধারগুলো আর খচখচ করে বেঁধে না। ধীরে ধীরে এই বন্দী-জীবনের সংগবহুল নতুন পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ। স্বধর্মী, সহকর্মী, সহযাত্রীদের জড়িয়ে ধরে নব-ঘনিষ্ঠতার অলক্ষ্য আকর্ষ। দেখা দেয় নবরূপী বন্ধুত্ব।

আরো দিন যায়। ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে গৃহের স্মৃতি, শিথিল হয়ে আসে বহির্জগতের আকর্ষণ। তারপর একদিন আসে, যখন জেলের এই কঠোর রূপটা তার চোখে বদলে যায়। এই সংকীর্ণ জগতের শৃঙ্খলাবন্ধ জীবনধারার মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। কদাচিৎ মনে পড়ে, এ তার গৃহ নয়, কারাবাস।

কিন্তু তাই বলে বিচারালয় থেকে যে দণ্ড সে বহন করে এনেছিল, সেটা কি নিষ্ফল হবে? না। শুধু তার লক্ষ্যস্থল বদলে যায়। সে দণ্ড ভোগ করে কতগুলো নারী ও শিশু, দণ্ডিত আসামীর উপর একদিন যারা ছিল একান্ত-নির্ভর এবং যাদের পথের প্রান্তে বসিয়ে রেখে, সে এই জেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সে-দরজা পার হতে না হতেই নিজের জন্যে পেল সে অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা, পেল নতুন সমাজ, নতুন বন্ধন, আর তার কারাদণ্ডের সমস্ত কঠোরতা রয়ে গেল তার পরিত্যক্ত প্রিয়জনের জন্যে। জেলে যে আসে, সে তার শেষ সম্বল নিঃশেষ করেই আসে।

জানি, এর ব্যতিক্রম আছে। সুযোগ ও সুবিধা বুঝে মাঝে মাঝে কারাবরণের ব্যবসা করেন যাঁরা, তাঁরা আলাদা জীব। তাঁদের কথা আমি তুলছি না। তাদের কথাও বলছি না, যারা আমার আপনার এবং অন্য দশ-জন রাম-শ্যাম-যদুর বহু-দুঃখার্জিত সঞ্চয়টুকু বন্ধুবেশে আহরণ করে, ব্যাঙ্ক কিংবা লিমিটেড কোম্পানির নামে সাততলা এমারত গড়ে লালদীঘির কোণে; তারপর হঠাৎ একদিন সেই ভবনশীর্ষে একটি লালবাতি জ্বালিয়ে রেখে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, কখনো কখনো বা ছিটকে এসে পড়ে আমার এই অতিথিশালায়। স্ত্রীর বেনামীতে রেখে আসে লেক অঞ্চলে বিশাল প্রাসাদ, সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের পাশ-বই, আর নিজের জন্যে সংগ্রহ করে আনে একখানা উচ্চশ্রেণীর প্রবেশপত্র। সেই সব ভাগ্যবান্ 'ডিভিশন বাবু' আমার লক্ষ্য নয়। জেলের অরণ্যে তারা মুষ্টিমেয় অতিবিরল বকুল কিংবা কৃষ্ণচূড়া।

আমি বলছিলাম, সেই সব শ্যাওড়া, কচু, ঘেঁটু আর বনতুলসীর কথা, সংখ্যায় যারা শতকরা আটানব্বই। প্রতিদিন দলে দলে এসে তারা ভিড় করছে আমার এই তৃতীয় ডিভিশনের লঙ্গরখানায়। এখানে আসবার আগে থানা থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা লড়েছে কোমর বেঁধে, উকিলের ঘরে পাঠিয়েছে বাক্স-প্যাঁটরা, ঘটি-বাটি আর স্ত্রীর হাতের শেষ অলঙ্কার, মহাজনের গদিতে তুলে দিয়েছে ক্ষুধার্ত পরিবারের একমাত্র সম্বল—দু-চার বিঘা ধানের জমি, জমিদারের কবলে নিক্ষেপ করেছে বাপ-পিতামহের ভিটামাটি, আর বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী এবং শিশু-সন্তানের হাতে দিয়ে এসেছে দারিদ্র্য, অনশন আর লাঞ্ছনা।

কোর্ট যে শাস্তি দেন, আইনের ভাষায় তার নাম rigorous imprisonment. তার imprisonment অংশটাই শুধু পড়ে আমার কয়েদীর ভাগে, আর rigour বহন করবার জন্যে রইল তার বর্জিত আশ্রিত দল।

প্রতি রবিবার ভোর না হতেই সেই সব পিছনে-ফেলে-আসা নারী ও শিশুর ভিড় জমে ওঠে আমার এই জেল-গেটের সামনেকার মাঠে। আমি আমার দোতলার বারান্দায় বসে তাদের দেখতে পাই। অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি; মুখে নেই গৃহস্থের শ্যামল শ্রী। একদল ছন্নছাড়া যাযাবর। বিকেল চারটা বাজতেই শুরু হয় মোলাকাত। ছিন্নবসনা স্ত্রী এসে দাঁড়ায় ইন্টারভিউ জানালার লোহার গরাদে-দেওয়া বেষ্টনীর বাইরে। তাকে ঘিরে দাঁড়ায় একদল ছোট ছোট উলঙ্গ কঙ্কাল। কোটরাগত চোখের জলে অনশন-ক্ষীণ কণ্ঠ মিলিয়ে কয়েদী-স্বামীর কাছে বলে যায় তার একটানা দুর্দশার কাহিনী। ছোট ছেলেটা গেল একদিনের জ্বরে। পেল না ওষুধ, না জুটল পথ্য। সেয়ানা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে আজগর মুন্সীর ভাইপো। বড়-ছেলেটা মাসখানেক হল উধাও। বাকীগুলো অপোগণ্ড। বুড়ী এখনো মরেনি। জমিদারের পাইক দুবেলা শাসিয়ে যাচ্ছে মাস গেলেই ভিটে ছেড়ে দিতে হবে।

আমি আর কি করবো?—জানালার এ-ধার থেকে উদাস কণ্ঠে জবাব দেয় স্বামী। দেহে তার পরিচ্ছন্ন জেলের পোশাক। সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য, মুখে দার্শনিক গাম্ভীর্য।

এমনি করে বছর কেটে যায়। মাঝে মাঝে এসে ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ একই কাহিনী শুনিয়ে যায় স্ত্রী। তারপর আর আসে না তার হাড়সর্বস্ব ছেলের

পাল নিয়ে। কে জানে, তার কি হল? বেঁচে আছে কিনা, সে খবর দিয়েই বা কার কি প্রয়োজন?

দণ্ডদাতা দণ্ড দিয়েই খালাস। তার কি এসে যায় কোথায় গিয়ে পড়ল তার উদ্যত মুষল, নির্মূল হয়ে গেল কোন্ সাজানো সংসার, নিস্তব্ধ হয়ে গেল কার কোলাহলমুখর গৃহ-প্রাঙ্গণ?

দিন যায়। দীর্ঘ দণ্ডকাল শেষ হয়। যে লৌহতোরণের প্রসারিত বাহু দণ্ডিত বন্দীকে নিঃশব্দে গ্রহণ করেছিল, সেই তাকে স-শব্দে বর্জন করে। গেটের বাইরে পা দিয়ে মুক্ত পৃথিবীর অজস্র আলোর দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। পা-দুটো আড়ষ্ট হয়ে যায়। কোথায় এলাম? এ কোন্ দেশ? ঐ যে অবিশ্রান্ত জলস্রোতের মত বয়ে চলেছে জন-প্রবাহ, কোনোদিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর নেই, কিসের টানে, কোথায় চলেছে তারা? এক পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে থাকে ঐ মোহাবিষ্ট জনতার দিকে। দশ বার পনের বছর এ বস্তু সে দেখেনি। সে ভুলে গেছে জীবন-যুদ্ধের তাড়না। ভুলে গেছে, এই যে অগণিত মানুষ উদয়াস্ত কাজ করে যাচ্ছে, এদের চোখের সামনে রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, সমৃদ্ধি, সম্মান আর স্বাচ্ছন্দ্য চাই; শুধু নিজের জন্যে নয়, প্রিয়জনের জন্যে। সেই আশার মোহ তাদের অন্ধবেগে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিদিন নতুন করে করে জুগিয়ে যাচ্ছে কর্মপ্রেরণা। অক্ষুণ্ণ রেখেছে সতত-ক্ষীয়মাণ প্রাণ-শক্তি। এই মোহাবেশের উন্মাদনা সে পায়নি তার দশ বছরের বন্দীজীবনে; অনুভব করেনি আত্মজনের জন্যে আত্ম-পীড়নের আনন্দ। অন্নবস্ত্র-আশ্রয়ের ভাবনা তাকে ভাবতে হয়নি। সে-সব দিয়েছেন সদাশয় সরকার, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন প্রিয়জনের দায় এবং দুশ্চিন্তা থেকে পূর্ণমুক্তি। তাকে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু কাজ করে খেতে হয়নি। সে কাজ তো কাজ নয়, শুধু হস্ত-পদ-সঞ্চালন। তার মধ্যে না ছিল প্রাণ, না ছিল প্রেরণা। জেলের কারখানায় সে ছিল একটা সজীব যন্ত্র—যে যন্ত্র সে চালাত, তারই একটা বৃহৎ অংশ।

এই চলমান জনস্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে দশ বছরের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সে দৃষ্টি পাঠাল পেছনের দিকে একদা যেখানে ছিল তার গৃহ। প্রাণপূর্ণ স্নেহনীড়। মনে পড়ল সব; মনে পড়ল সবাইকে। কিন্তু বুকের ভিতরটা

টনটন করে উঠল না। মনুষ্যত্ববোধ চলে গেছে, অসাড় হয়ে গেছে দায়িত্বের অনুভূতি। বুকে হাত দিয়ে দেখল। হাতে ঠেকল একটা শুষ্ক নিরেট মরুভূমি। শ্রদ্ধা, প্রীতি ভালবাসার কোনো ক্ষীণ ফল্গুধারাও বইছে না তার অন্তস্থলে।

পাশে এসে দাঁড়াল এক সদ্য আহরিত কারাবন্ধু। তিন মাস জেল খেটে আজ খালাস পেয়েছে একই সঙ্গে। বলল, এখানে দাঁড়িয়ে যে? বাড়ি যাবে না?

বাড়ি! শ্লেষবিকৃত কণ্ঠে বেরিয়ে এল উত্তর। ঠোঁটের উপর ফুটে উঠল এক অদ্ভুত ব্যঙ্গ হাসির কুঞ্চন-রেখা।

—নাও, বিড়ি খাও, এগিয়ে এসে হাত বাড়াল নতুন বন্ধু।

সেদিকে না তাকিয়েই বিড়িটা সে হাত পেতে নিল, ধরাল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ঔদাস্যভরে ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার, তারপর পা চালিয়ে দিল যে-দিকে দুচোখ যায়, মিশে গেল জনারণ্যের অন্তরালে।

ফাইলের পরেই কেস টেবল (case table), সেন্ট্রাল টাওয়ারের নীচে খোলা প্রাঙ্গণে আমার বৈকালিক আফিসের এক টুকরো। এই টেবিলে বসেই প্রতি সন্ধ্যায় আমি কেস লিখি কয়েদির টিকিটে। হরেক রকমের কেস। কারো কম্বলের ভাঁজে পাওয়া গেছে দুখানা তামাকপাতা আর এক ডিবা চুন; কারো "খাটনি" অর্থাৎ দৈনিক task পুরো হয়নি,—এক মণ ছোলা ভেঙে ডাল করবার কথা, ভেঙেছে ছত্রিশ সের বার ছটাক; কেউ "চৌকা" থেকে লুকিয়ে এনেছে দুটো পেঁয়াজ আর তিনটা লঙ্কা; কিংবা গামছার বিনিময়ে হাসপাতালের মেট-সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে আধসের দুধ আর এক ছটাক চিনি।

এইসব এবং এর চেয়েও গুরুতর কত কেসের তদন্ত করি, রিপোর্ট লিখি টিকেটের পাতায়, এবং পরদিন সকালবেলা আলামত-সহ অপরাধীদের হাজির করে দিই সুপারের দরবারে। আর একদফা শুনানির পর তিনি বিচার শেষ করেন। কাউকে দেন ডাণ্ডাবেড়ি, কাউকে হাতকড়া, কাউকে বা পরতে হয় চটের কাপড় কিংবা সেলে বসে খেতে হয়, চালের গুঁড়োর মণ্ড, আইনের ভাষায় যার নাম penal diet.

"ফেকু গোয়ালা"—দরাজ-গলায় হাঁক দিল বড় জমাদার। একটা লোকের হাত ধরে নিয়ে এল "আমদানীর" মেট। আমার টেবিলের সামনে দাঁড় করাতেই গর্জে উঠল জমাদারের দ্বিতীয় হুকুম—সেলাম করো।

দেখলাম; চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল, ফুলেও উঠেছে অনেকখানি, আর জল ঝরছে অবিরাম।

—ও কি! চোখে কি হল?

—চুন লাগায়া আউর কেয়া?—জবাব দিল জমাদার।

—কিরে, চুন লাগিয়েছিস চোখে?

—নেহি, হুজুর।

—চোখ লাল হল কি করে?

—বেমার হুয়া—বলে মুচকে হাসল।

দুজন সহকর্মী সাক্ষী বলে গেল, দেয়াল থেকে চুনবালি নিয়ে ও ঘষে দিয়েছে চোখের মধ্যে, নিজের চোখে দেখেছে তারা। বলছে হাসপাতাল যাবো।

টিকেট উলটে দেখলাম, কয়েকমাস আগে খানিকটা সাবান না সাজিমাটি খেয়ে, আমাশা বাধিয়ে আর একবার পনের দিন পড়েছিল হাসপাতালে। ধমক দিয়ে বললাম, চোখে চুন দিয়েছিস কেন?

—বারো সের গহুঁ পিষণে নেহি সক্তা।

—নেহি সক্তা! আব্দার পেয়েছ?

টিকেটের প্রথম পাতা খুলে দেখলাম ডাক্তারের নোট রয়েছে—হেল্থ—গুড, লেবার হার্ড। জেলকোডের বিধানে এ হেন ব্যক্তির গম-পেষণের দৈনিক বরাদ্দ বারো সের। অতএব রিপোর্ট করতে হল। কিন্তু চোখে চুন দেওয়া তার একেবারে ব্যর্থ হল না। আপাতত কিছুদিন হাসপাতালে আশ্রয় মিলবে। ফিরে এসে হাজির হবে বড় সাহেবের কাছে।

সকলের শেষে যাকে আনা হল, একটি সতের-আঠার বছরের ছেলে। মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতে সময় লাগে। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ আর অনিন্দ্য মুখশ্রী বলে নয়, সে মুখের প্রতি রেখায়, কপালে, ওষ্ঠে, চিবুকের বন্ধনীতে একটা সুস্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ, জেলখানায় যেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এ কোত্থেকে এল? ঝগড়া-ঝাঁটি করে, কিংবা খুন-জখম করেও কখনো কখনো এসে থাকে দু-চারটি বড়

ঘরের ছেলে। কিন্তু এর অপরাধ দেখছি চুরি। ৩৭৯ ধারায় ছ মাস জেল।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙল জমাদারের গর্জনে—এক নম্বর হারামী, হুজুর। ফাইল পর কভি নেই আয়গা।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ফাইলে আসনি কেন?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্যর।

কথাটা বিশ্বাস হল না। মনে হল, আসল কারণ ঘুম নয়। বোধ হয় সবার সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হয়ে দাঁড়াবার লজ্জাটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

—তোমার নাম কি?

—পরিমল ঘোষ।

—বাবার নাম?

—ঐ টিকিটেই লেখা আছে, স্যর।

রুক্ষ স্বরে বললাম, জানি। তবু তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই।

ছেলেটা এক মিনিট কি ভাবল, তারপর বলল, বিজয়গোপাল ঘোষ।

এ কোন্ বিজয়গোপাল? এক নামের কত লোকই তো দেখা যায়। কিংবা একি আমাদের সেই বিজয়ের ছেলে? জমাদারকে বললাম, উস্‌কো অফিসমে লে যানা।

অফিসে এসে সহকর্মীদের কাছ থেকে যে সব তথ্য পেলাম, আমার সন্দেহ সমর্থিত হল। বিজয় আমার বন্ধু এবং সহপাঠী। এম. এ. আর ল পাশ করে প্রথমটা যেমনি হয়, আলিপুর কোর্টে হাঁটাহাঁটি। তারপর হঠাৎ সরকারী চাকরি নিয়ে চলে গেল মফঃস্বলে। সেই থেকেই ছাড়াছাড়ি। কার মুখে যেন শুনেছিলাম, কোন্ এক বিশাল বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করবার পর সে নাকি হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তার আত্মীয়-বন্ধু-মহলের সংস্রব থেকে। সত্যি মিথ্যা জানি না। আমিও কোনোদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার চেষ্টা করিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। কে জানত এতকাল পরে এভাবে তাকে স্মরণ করতে হবে?

আমার কলেজের একটা গ্রুপ ফটো বাসা থেকে আনিয়ে পরিমলের হাতে দিয়ে বললাম, দ্যাখ তো কাউকে চেন কি না? সে চমকে উঠল, একি! এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন? এর মধ্যে যে আমার বাবা আছেন। বললাম, তোমার বাবার ঠিক পাশের লোকটিকে চিনতে পারছ?

—না তো।

—ভালো করে দ্যাখ।

বুদ্ধিমান ছেলে। আর একবার দেখে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল, আপনি?

বললাম, এখানে যেমন দেখছ, ঠিক এমনি একই সঙ্গে পাশাপাশি আমরা কাটিয়েছি আমাদের কলেজ হস্টেলের ছটা বছর। বিজয় আর আমি বন্ধু এবং সহপাঠী। বাইরের সম্পর্ক এইটুকু। কিন্তু যে সম্পর্ক চোখে দেখা যায় না, সেটা শুধু আমরাই জানতাম। সেই বিজয়ের ছেলে তুমি! আজ এইখানে—

ওর দিকে নজর পড়তেই কথাটা আর শেষ করা হল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু একটিবার মাত্র আমার চোখের দিকে চেয়ে সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। দু চোখের কোল ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলধারা।

আত্মীয়স্বজন যদি কেউ জেলে এসে পড়ে, সংশ্লিষ্ট জেলকর্মীকে সেটা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে—এটা জেল-কোডের বিধান। আত্মীয়টিকে তখন অন্যত্র চালান দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। পরিমল আমার আত্মীয় নয়, স্বজন বলতে যা বোঝায়, তাও নয়। তবু অনেক ভেবে ঐ আইনের আশ্রয় নিলাম। যাবার সময় সে বলল, এ ভালোই হল। আমিও ভাবছিলাম বলবো, আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেলাম। সেও আমাকে ছেড়ে যাবার জন্য ব্যস্ত! বললাম, কেন? তুমি যেতে চাইছিলে কেন?

পরিমল উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করলাম না। শুধু বললাম, যেখানেই থাক, একটা কথা আমার মনে রেখো। জেলের আইন-কানুনগুলো মেনে চলবার চেষ্টা কোরো। অনেক অনর্থক অসুবিধার হাত এড়াতে পারবে।

মাস চার-পাঁচ কেটে গেল। তারপর একদিন সকালের ডাকে একটা মোটা খামের চিঠি পেলাম। অচেনা হাতের লেখা। শেষ পাতায় সকলের শেষে নাম রয়েছে—হতভাগ্য পরিমল। সে যে আমাকে চিঠি লিখবে, ভাবতে পারিনি। আমাকে এড়িয়ে চলতেই সে চেয়েছিল, আর সেটাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারের কটা ঘটনাই বা স্বভাবের নিয়মে ঘটে?

চিঠিখানা আজ আমার হাতে নেই। সমস্ত যত্ন অগ্রাহ্য করে কোনো একটা বদলির হিড়িকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। চিঠি নেই। তার প্রতি ছত্রের প্রতিটি কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। কিন্তু তাকে বাইরে এনে রূপ দিতে পারি, এমন দিব্য শক্তি বিধাতা আমাকে দেননি। ফটোগ্রাফ যেমন চিত্র নয়, যে চিঠিটা এখানে তুলে দিলাম, সেটাও তেমনি পরিমলের চিঠি নয়। তার অবয়বটা হয়তো রইল, রইল না তার প্রাণস্পন্দন। কতদিন হয়ে গেল। তবু সেই হারিয়ে যাওয়া-চিঠির অবলুপ্ত অক্ষরের বুকের ভিতর থেকে আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—

কাকাবাবু,

আপনার শেষ উপদেশ আমি এতদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু আর পারলাম না। এই জেলে আসবার পর এই চিঠিই আমার আইন-ভঙ্গের প্রথম অপরাধ। সে অপরাধ কেন করেছি, কেন প্রকাশ্য রাস্তায় না গিয়ে এই গোপন পথের আশ্রয় নিলাম, এ চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবেন।

আমার এই চিঠি পেয়ে আপনি বিরক্ত হবেন কি না জানি না, বিস্মিত হবেন নিশ্চয়ই। যার চোখের সামনে থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে একদিন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, আজ তাকেই আবার এ দীর্ঘ কাহিনী শোনাতে যাবো, একথা কি আমিও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? কিন্তু কি করবো? যাকে ভালবাসি তাকে আঘাত দেওয়াই বোধ হয় আমার কপালের লিখন। তাই পালিয়ে এসেও থাকতে পারলুম না। আমার হাত থেকে এখনো যে আপনার অনেক দুঃখ পাওনা আছে। এখনো যে আমার বলা হয়নি, কি করে, কোন্ ঘোর দুর্যোগের দিনে এই নরকের পথে প্রথম পা বাড়িয়েছিলাম, এতবড় সর্বনাশ কেমন করে হল, অতবড় বাপের কঠিন আদর্শ কেন আমাকে রক্ষা করতে পারেনি।

একথা জানি, সে কাহিনী যে শুনবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আমি ক্রিমিনাল। সংসারে আমার জন্যে দয়া নেই, ক্ষমা নেই, নেই কারো মনে এতটুকু সংবেদন। কিন্তু আপনাকে তো অন্য সবার সঙ্গে এক করে দেখতে পারি না। এখানে বসেই আমি যে আপনার বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। যে জিনিস ওখানে সঞ্চিত হয়ে আছে, এ হতভাগার জন্যে, একমাত্র বাবা ছাড়া আর কারো কাছেই তা পাইনি। তাই তো লিখতে বসে আজ আপনা হতেই

ও মুখ থেকে বেরিয়ে এল—কাকাবাবু। আপনাকে কাকাবাবু বলে ডাকবার মত স্পর্ধা আমার হবে, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি।

আমার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে আমার বাবার কথা। আপনাকে সেদিন বলতে গিয়েও বলতে পারিনি। বাবা নেই। প্রায় আট মাস হল, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর এই অকালমৃত্যু যত বড়ই মর্মান্তিক হোক, একদিন হয়তো সইতে পারবো। কিন্তু যেভাবে, যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তিনি তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এতবড় পাষণ্ড হয়েও এক নিমেষের তরে ভুলতে পারছি না। সে-কথা আমার কারো কাছেই বলবার উপায় নেই। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার মায়ের কথা—এমন কথা, যা উচ্চারণ করাও সন্তানের পক্ষে অপরাধ। সে শুধু রইল আমার বুকের মধ্যে। যতদিন বাঁচবো, সে বোঝা আমাকে একাই বয়ে বেড়াতে হবে।

সেই ভয়ঙ্কর দিনটা আজও চোখের উপর ভাসছে। বাবা হাওড়ায় বদলি হয়ে এসেছেন। শিবপুরে একটা বাড়িতে আমরা থাকি। কিছুদিন আগে থেকেই তিনি 'ব্লাড প্রেসার'-এ ভুগছিলেন। দারুণ সাংসারিক অশান্তি তার উপর বিষের মত কাজ করছিল। মাঝে মাঝে এত বাড়াবাড়ি হত যে, একনাগাড়ে পাঁচ-সাত দিন মাথা তুলতে পারতেন না। ছুটি নিলে সংসার চলে না। এই অবস্থাতেই তাঁকে কাজ করতে হত। সেদিনও কোর্টে বেরোবার আয়োজন করছিলেন। মা এসে বললেন, টাকার কদ্দূর হল? মাঝে আর তিনটি দিন বাকী। জিনিসটা দেখেশুনে কিনতে হবে তো।

বাবা জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, অতো টাকা তো জোগাড় করতে পারছিনে। ধারও মিলছে না কোনোখানে।

মা অবাক হয়ে বললেন, অতো টাকা মানে? অন্তত শ পাঁচেক টাকা না হলে একটা চলনসই জড়োয়া নেকলেস হয় কি?

একটু থেমে বললেন, পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ একটা মায়ের পেটের বোন। তার প্রথম মেয়ের বিয়ে। না গিয়ে এড়ানো যাবে না। তা তোমার হাতে যখন পড়েছি, বল তো খালি হাতেই যাবো।

বাবা টুপিটা তুলে নিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, আর তো কোনো উপায় দেখছিনে। আপাতত সংসার খরচের টাকা থেকে শ খানেক দিয়ে যাহোক একটা—

"শ খানেক!" মা একেবারে রুখে উঠলেন, "বলতে একটু বাধলো

না? তোমার না হয় মান-ইজ্জতের বালাই নেই, কিন্তু একশ টাকার একটা জিনিস হাতে করে গেলে আমার বাবার মুখখানা কোথায় থাকে ভেবে দেখেছ?"

আমি পাশের ঘরে ইস্কুলে যাবার আগে বই গোছাচ্ছিলাম। বাবার হঠাৎ নজর পড়তেই গম্ভীর গলায় বললেন, খোকা তুমি নিচে যাও। আমি তাঁর চোখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে বাবার? বুঝলাম এই মুহূর্তে তাঁর শুয়ে পড়া দরকার।* কিন্তু তাঁর কথার অবাধ্য কোনোদিন হইনি। তাই কোনো কথা না বলে বই-খাতা নিয়ে নিচে নেমে গেলাম। আমার পেছনে বাবাও নামতে লাগলেন। মার গলা শোনা গেল, টাকার ব্যবস্থা না করেই চলে যাচ্ছ যে?

বাবা নিম্নস্বরে কি একটা বললেন। মার উত্তেজিত উত্তর নিচে থেকেই শুনতে পেলাম। রেগে গেলে মার জ্ঞান থাকত না, কি বলছেন আর কাকে বলছেন। যা বললেন, তার সবটা আমার কানে গেল না, যেটুকু গেল তাও বলবার মত নয়। সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে একটা শব্দ শুনে ছুটে এলাম। দেখলাম, বাবা পড়ে আছেন। কপালের একটা ধার কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। জ্ঞান নেই। চাপরাশী আর ঠাকুর-চাকরে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে কোনো রকমে উপরে নিয়ে গেল। আমি ছুটলাম ডাক্তার ডাকতে। ঘণ্টা দুই চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু সমস্ত বাঁ অঙ্গটা অচল। তখনো বুঝিনি, মুহূর্তমধ্যে কত বড় সর্বনাশ আমাদের ঘটে গেল। বাবা চিরদিনের তরে শয্যায় আশ্রয় নিলেন।

মাসের প্রথম তারিখে সমস্ত মাইনেটা বাবা মার হাতে ধরে দিতেন। কিন্তু সেটা ছিল আমাদের চোদ্দ পনের দিনের খরচ। বাকি মাসটা যেভাবে চলত, আপনি অনুমান করুন। সামান্য পুঁজি যা ছিল, আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই সম্ভব হল না। বাবা প্রথমে কিছুদিন ছুটি পেলেন। তারপর নামমাত্র পেনশন দিয়ে সরকার তাঁকে একেবারেই ছুটি দিয়ে দিলেন। পেটের দায়ে তাঁকে তখন কত কি করতে হত। কখনো খবরের কাগজে প্রবন্ধ, কখনো আইনের বই-এর নোট লেখা। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারতেন না। ডিকটেট করতেন, আমি ইস্কুলের ছুটির পর দু ঘণ্টা করে রোজ লিখে দিতাম। তারপর যেতে হত প্রেসে। যা আসত, অতি সামান্যই।

সে কী জীবন! গল্প শুনেছি, শিব বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।

দেবাদিদেবকে চোখে দেখা যায় না। আমি দেখেছি আমার বাবাকে। শিবের চেয়েও শান্ত; সর্বংসহা বসুমতীর চেয়েও সহিষ্ণু। এত বিষ, এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অপমান! উত্তরে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে কোনোদিন বার হতে শুনিনি। আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। বাবা আমার মন বুঝতে পারতেন। কাছে ডেকে গায় হাত বুলিয়ে বলতেন, খোকা, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শেখা হল, সইতে শেখা। একথা কোনোদিন ভুলো না।

এই নিরবচ্ছিন্ন রোগশয্যায় আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র সঙ্গী। মাঝে মাঝে দু-একজন পুরানো সহকর্মী দেখা করতে আসতেন। মামুলি সান্ত্বনা দিয়ে চলে যেতেন। তার কোনোটাই বাবাকে স্পর্শ করত না। দূর ছাত্র-জীবনের একটিমাত্র বন্ধু তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে ছিলেন। কতদিন কত-ভাবে তিনি তাঁর কথা আমায় শুনিয়েছেন। তখন কি জানি, একদিন এমনি-ভাবে আমি তাঁর দেখা পাবো? সেই দেখা পেলাম, কিন্তু সময়ে পেলাম না কেন? যদি পেতাম, বাবাকে বোধ হয় এমন করে হারাতে হত না; আর আমিও আজ এই পাঁকের মধ্যে পড়ে ছটফট করতাম না।

এই সময়ে আমাদের সংসারে একটি নতুন মানুষের আবির্ভাব হল। মার কোন্ দূর সম্পর্কের দাদা। আমাদের মণীশ মামা। শুনেছি মার যখন বিয়ে হয়নি, দাদামশাই তাঁর এই আত্মীয়টিকে একদিন তাঁর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এতকাল পরে এই নিখুঁত সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাঁর একটা নতুন কেনা টু-সীটার অস্টিন চড়ে যখন তখন আমাদের বাড়ি চড়াও করে অতিশয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তারপর একদিন এঁকে উপলক্ষ করেই দেখা দিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সেই কথা বলেই এ চিঠি শেষ করবো।

সেবার আমি ম্যাট্রিক দেবো। ইস্কুলে ভালো ছেলে ছিলাম। বাবার একান্ত ইচ্ছা প্রথম দশজনের মধ্যে যেন দাঁড়াতে পারি। পাছে তাঁকে দুঃখ দিতে হয়, তাই পড়াশুনোয় কোনোদিন অবহেলা করিনি। সেদিনও নিজের ঘরে বসে জিওমেট্রি মুখস্থ করছিলাম। রাত প্রায় এগারটা। পাশের ঘরে বাবা। শরীরটা আবার কদিন থেকে বড্ড খারাপ যাচ্ছে। গোবিন্দ তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। অনেক দিনের পুরানো এই চাকরটি তখনো আমাদের ছেড়ে যায়নি। রান্নাবান্না থেকে বাবার দেখাশোনা সবই ওর হাতে। বাড়ির সামনে মোটর থামবার পরিচিত শব্দ শোনা গেল। গোবিন্দ।

উঠে গেল দরজা খুলতে। তারপরেই দেখলাম মণীশ মামা উপরে উঠছেন। বারান্দা পেরিয়ে সোজা বাবার ঘরে ঢুকলেন এবং সাবধানে একটা চেয়ারে বসে বললেন. বিজয়বাবু, ঘুমুলেন নাকি? বাবার বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। একটু চমকে উঠে বললেন, কে?

—আমি মণীশ।

—ও, কি বলুন।

মামা একটু কেশে নিয়ে বললেন, বলছিলাম, সুরমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। একটা কোথাও চেঞ্জে-টেঞ্জে যাওয়া দরকার।

বাবা শান্তভাবেই বললেন, কোনো অসুখ করেছে কি?

—না, অসুখ তেমন কিছু নয়। এই বাড়ির আবহাওয়াটা ওর তেমন সহ্য হচ্ছে না।

—কিন্তু চেঞ্জে পাঠাবার মত টাকা তো আমার নেই।

—টাকার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমিই ম্যানেজ করবো। সুরমার ইচ্ছা পরিমলও সঙ্গে যায়। ওর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়তে চাই। একটা বাড়ি-টাড়ি তাহলে এখন থেকেই দেখতে হয়।

বাবা একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। পরিমলের যাওয়া হবে না।

—কেন হবে না, জানতে পারি কি?—এ প্রশ্ন করলেন মা। কখন এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, দেখতে পাইনি। বাবাও বোধ হয় টের পাননি। সেদিকে একবার তাকিয়ে বাবা বললেন, সে আলোচনা করে লাভ নেই। ওকে আমি যেতে দিতে পারি না।

মা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চব্বিশ ঘণ্টা রুগী ঘেঁটে ঘেঁটে ওর অবস্থাটা কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আমার চোখের সামনে আমার ছেলেটাকে তুমি মেরে ফেলতে চাও?

বাবা আস্তে আস্তে বললেন, মণীশবাবু আমাকে মাপ করবেন, রাত বোধ হয় অনেক হল। এবার একটু ঘুমোতে চাই।

মণীশ মামা কিছু বলবার আগেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ও সব ভড়ং রেখে দাও। আমার ছেলে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাবো। দেখি, তুমি কেমন করে বাধা দাও।

মণীশবাবু বললেন, আমার মনে হয়, আপনি অন্যায় জিদ করছেন,

বিজয়বাবু। ছেলেটা কদিন একটু ঘুরে আসবে, এতে আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে?

বাবা মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে বললেন, আমার স্ত্রী-পুত্রকে চেঞ্জে পাঠাবার মত সংগতি যদি থাকত, অবশ্যই পাঠাতাম। তা যখন নেই, অন্যের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে চাই না। কিন্তু যেখানে আমার জোর খাটবে না, সেখানে বাধা দিতে গেলে লাঞ্ছনা ভোগই সার হবে। তাই আপত্তিটা শুধু পরিমলের বেলাতেই জানিয়ে রাখছি।

মামা সিগারেট ধরালেন। মার তিক্ত স্বর শুনতে পেলাম, অন্যের অনুগ্রহ! বলতে একটু চক্ষুলজ্জাও হল না তোমার? এই অনুগ্রহ না পেলে কোথায় থাকত তোমার স্ত্রী-পুত্র, আর কোথায় থাকতে তুমি নিজে? তোমার বুঝি ধারণা, তোমার ঐ গোটাকয়েক পেনশনের টাকা আর ঐ নোট-ফোট লিখে যা ভিক্ষে জোটে, তাই দিয়েই এই সংসারটা চলছে? এ অনুগ্রহ যে করতে চাইছে, সে আজ নতুন করছে না, অনেকদিন আগে থেকেই করে আসছে। তা না হলে আজ সবাইকেই পথে দাঁড়াতে হত।

মণীশ মামা বললেন, আহা! এসব তুমি কি বলছ, সুরমা? অনুগ্রহ আবার কোথায় দেখলে? এ তো আমার কর্তব্য। একেবারে ছেলেমানুষ! রেগে গেলে আর—

বাবার গম্ভীর কণ্ঠে ডুবে গেল তাঁর নাকী সুর—কই, এসব কথা তো আমার জানা ছিল না। জানি, আমি আজ নিতান্ত দুঃস্থ এবং অক্ষম। কিন্তু অন্যের দয়ায় বেঁচে আছি, আমার একমাত্র সন্তান হাত পেতে পরের অন্ন গ্রহণ করছে, একথা তো আমি ভাবতেই পারি না।

শেষের দিকে তাঁর সুরটা এমন করুণ শোনাল যে, আমার চোখে জল এসে পড়ল। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে বলি, না বাবা, আমরা এখনো পরের কাছে হাত পাতিনি। ও সব মিথ্যা কথা। কিন্তু যাওয়া হল না। জানতাম বাবা রাগ করবেন। একটুখানি থেমে উনি তেমনি ধীরে ধীরে বললেন, যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না। তবে, এ অন্যায়ের এইখানেই শেষ। কাল ভোর থেকে সব ব্যবস্থাই বদলে যাবে।

বাঁ হাত অচল। শুধু ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বাবা বললেন, মণীশবাবু আমার এবং আমার পরিবারের জন্যে আপনি যা করেছেন, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়। আপনার অনুগ্রহের দান থেকে আমাদের মুক্তি দিন।

বাবাকে ভালো করেই চিনি। কাল থেকে যে ব্যবস্থা তিনি করতে চাইছেন, সেটা যত কঠোরই হোক, তবু যে তার নড়চড় হবে না, সেটাও আমার জানা ছিল। এমনিতেই তাঁর খাবার বরাদ্দ এত সাধারণ যে, তার নীচে আর এক ধাপ নামতে গেলে, সেটা হবে অনাহার। অথচ সেই রাস্তাই যে তিনি ধরবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে তো আত্মহত্যার সামিল। সেই ভীষণ পরিণাম থেকে তাঁকে বাঁচাবার কি কোন পথ নেই? আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, একমাত্র বংশধর। যতই ছোট হই, অক্ষম হই, আমি কি শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকবো? পীড়িত, অভাবগ্রস্ত পিতার মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতাও আমার নেই? এই তো, আমার বয়সী কত ছেলে পথে ঘাটে কতরকম কাজ করে খাচ্ছে। আমি ভদ্র ঘরে জন্মেছি বলেই তা পারবো না?

গভীর রাত পর্যন্ত নানা রকমের উদ্ভট কল্পনা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে। খাতা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলাম, বাবা. ভেবে দেখলাম সংসারের আয় বাড়াবার জন্যে আমারও কিছু রোজগার করা দরকার। সেই চেষ্টাতেই চললাম। আমার জন্যে ভেবো না। আশীর্বাদ করো যেন সফল হয়ে ফিরে আসতে পারি।

বাবার ঘরে যেতে সাহস হল না। পাছে তিনি জেগে ওঠেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে চোখ পড়লে আমার সকল সংকল্প ভেঙে যায়, তাই পড়ার টেবিলে চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

এর পরে যে জীবন শুরু হল, তার বর্ণনা দিতে গেলে এ চিঠি আর শেষ হবে না। সে চেষ্টা করবো না। ঘরের বাইরে এসে পৃথিবীকে দেখলাম এক নতুন রূপে। দেখলাম, নরক বলে কোনো আলাদা দেশ নেই। এই সংসারটাই একটা প্রকাণ্ড নরক। দেখলাম, মানুষ কত নীচ, কত কঠোর, কত নির্মম! দয়া নেই, প্রীতি নেই, একবিন্দু সহানুভূতি নেই। আছে শুধু সন্দেহ, পীড়ন আর বঞ্চনা। ভিক্ষা চাইলে হয়তো সহজেই পেতাম। কিন্তু যার কাছেই বলেছি, আমাকে একটা কাজ দাও, আমি খেটে খেতে চাই, সবারই চোখে দেখেছি অবিশ্বাস, শুনেছি কারো নীরব কারো বা সরব মন্তব্য—কোনো মতলব আছে ছোকরার।

দুদিন পেটে পড়ল শুধু কলের জল। অনেক ঘুরে অনেকের দুয়ারে ঢুঁ মেরে এক দোকানে জুটল খাতা লেখার কাজ। খোরাক আর পনের টাকা।

হাতে স্বর্গ পেলাম। মাস গেলেই প্রথম মাইনের টাকাটা মনি অর্ডার করে পাঠালাম বাবার কাছে। লিখলাম, এই টাকাটা দিয়ে ফল আনিয়ে নিও। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। আমি ভাল আছি। সুবিধা হলেই গিয়ে তোমাকে দেখে আসবো।

কিছুদিন পরে মালিকের বাক্স থেকে পঞ্চাশ টাকা চুরি গেল। সন্দেহ পড়ল আমার উপর। বিশ্বাস যখন গেল তারপরে আর সেখানে থাকা চলে না। বেরিয়ে পড়লাম। এবার জুটল এক চায়ের দোকানে বয়-এর কাজ। টেবিলে টেবিলে খাবার যোগানো। কাটল কিছুদিন। একদিন একখানা প্লেট ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। কদর্য ভাষায় বাপ তুলে দিল গালাগালি। আবার পথ। সেখান থেকে মোটরের কারখানা। সে চাকরি টিঁকল না। মাতাল মিস্ত্রিটার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হত। তার কুৎসিত ঘনিষ্ঠতা সহ্য হল না। এর পরে জুটলাম গিয়ে এক দেশী মদের দোকানে। কাজ, মদ বিক্রি। মাইনে তিরিশ টাকা। বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিলাম।

কতবার কতভাবে পাঁকের স্পর্শে এসেছি। কিন্তু পাঁক গায় লাগতে দিইনি। কিছু টাকা হাতে করতে পেলেই বাবার কাছে ফিরে যাবো, এই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কারো পরামর্শ, কারো কোনো প্রলোভন সে লক্ষ্য থেকে আমাকে নড়াতে পারেনি। এতদিন পরে এই মদের দোকানের বারান্দায় এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেলাম একদিন, যার কাছে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলুম না। জানি না, কি জাদু ছিল তার চোখে, তার কথায়, তার হাতের স্পর্শে। স্রোতের মুখে তৃণের মত আমি তার ইচ্ছার তোড়ে ভেসে চলে গেলাম।

দোকান বন্ধ হবার পর বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে ছিলাম। সে এসে বসল পাশটিতে। যেন কতদিনের বন্ধু, এমনিভাবে হাত ধরে বলল, তোমায় তো এখানে মানাচ্ছে না, ভাই। তুমি এ রাস্তায় কেমন করে এলে?

অনেকদিন পরে মানুষের কণ্ঠে যেন একটু দরদের আভাস পেলাম। সে আমার চেয়ে বোধ হয় বছর চার পাঁচের বড় হবে। কিন্তু তার পাশে নিজেকে মনে হল শিশু। একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গিয়ে সে প্রচুর খাওয়ালে। তারপর ট্যাকসি করে নিয়ে গেল বেড়াতে। একদিন, দুদিন, তিন দিন। তারপর এক নিভৃত সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে বসে তাকে খুলে বললাম আমার

জীবনের বৈচিত্র কাহিনী। সে নিঃশব্দে শুনল সব কথা। তারপর সস্নেহ কণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক করেছ, ভাই। এ ছাড়া আর পথ ছিল না। কিন্তু এই মাতালের দোকানে মদ বেচে তো বাবার দুঃখ ঘোচাতে পারবে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার পথ বাতলে দেবো।

তার সঙ্গ নিলাম।

সে রাতটা আমার চোখের উপর ভাসছে। অত্যন্ত সরু গলি। অন্ধকার পথ, দুপাশে নোংরা জঞ্জাল। টর্চের আলোয় কোনো রকমে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা পোড়ো মতন বাড়ি। সেটা ছাড়িয়ে ভেতরের দিকে আর একটা প্রকাণ্ড জীর্ণ কোঠা। সামনের দিকটা ভেঙে পড়েছে। ভাঙা স্তূপের পাশ দিয়ে এক ফালি পথ। অতি কষ্টে পার হয়ে ডানদিকে পেলাম একটা সিঁড়ি। যেমন স্যাঁতসেতে, তেমনি অন্ধকার। উঠছি তো উঠছিই। তার যেন আর শেষ নেই। সে আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক হোঁচট খেয়ে, অনেক মোড় ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম একটা হল-মতন ঘরে। একঘর লোক। বিশ্রী ভাষায় আলাপ করছে, আর মাঝে মাঝে হাসছে বিকট কদর্য হাসি। এ কোথায় নিয়ে এলে ? ভয়ে ভয়ে বললাম তাকে। সে উত্তর দিল না। হাত ধরে নিয়ে গেল পাশের একটা ঘরে। মোমবাতির আলোয় দেখলাম, একটা লোক খাটিয়ায় শুয়ে বিড়ি টানছে। বয়েস হয়েছে; কিন্তু দেখতে গুণ্ডার মত।

আমার বন্ধু বলল, এনেছি, ওস্তাদ।

—এনেছ ? বেশ, এদিকে নিয়ে এসো।

তেমনি হাত ধরেই সে আমাকে আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা উঠে এসে আমার মুখের কাছে মুখ এনে খানিকক্ষণ কি দেখল। তার-পর বলল, বাঃ খাসা মাল এনেছিস রে। ঠিক আছে। ও পারবে।

ধেনো মদের উগ্র গন্ধে গা পাক দিয়ে উঠল। পিছন ফিরে বন্ধুকে আর দেখতে পেলাম না। আর কোনোদিন দেখতে পাইনি।

পরদিন সকালেই বুঝলাম, কোথায় এসেছি। পকেটমারদের প্রধান ট্রেনিং সেন্টার। বন্ধুটি একজন পাকা আড়কাঠি। আমি নতুন রংরুট। আমাকে নজরবন্দী করে রাখা হল। কিছুক্ষণ পরেই ওস্তাদ ডেকে পাঠালেন। কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, ভয় কিসের ? তোমার মত কত ছেলে আছে আমাদের দলে। সকলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। খাও-দাও ফুর্তি করো। আর মন দিয়ে কাজ শেখো। ভাল করে শিখতে পারলে এরকম লাইন

আর নেই। রাতারাতি বড়লোক। আচ্ছা সব চাইতে কাকে বেশী ভালবাস বল তো?

বললাম, বাবাকে।

—বেশ। বল দিকিনি, 'বাবার' নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, দল ছেড়ে কোনো দিন যাবো না; দলের কোনো কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না।' বল—।

প্রতিজ্ঞা করলাম। এমনি করে আমার দীক্ষা হ'ল।

মাসখানেক ট্রেনিং দিয়েই ওরা আমাকে রাস্তায় পাঠাতে শুরু করল। পালানোর উপায় নেই, পেছনে ভিড়ের মধ্যে ওদের গার্ড। বেগতিক দেখলে ছোরা চালাতে দ্বিধা করবে না। হাতেখড়ি শুরু হল। সারাদিনে কিছু কেস দিতেই হবে। তা না হলে নানারকম নির্যাতন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেটা আমাকে বেশী সইতে হয়নি। দক্ষ এবং বিশ্বস্ত কর্মী বলে অল্প দিনেই আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যা পেতাম, সব জমা দিতে হত সর্দারের কাছে। আমার প্রাপ্য ছিল খোরাক পোশাক আর সামান্য কিছু হাতখরচ।

গহর বলে একটা লোক ছিল আমাদের দলে। আমাকে সত্যিই ভালবাসত। একদিন আড়ালে নিয়ে বলল, তুমি কি বোকা! যা পাও সবই দিয়ে দিচ্ছ! কিছু কিছু সরাতে হয়। তা নৈলে তোমার রইল কি? 'আমরা সবাই কি করছি দেখতে পাও না?

সেকথা আমি জানতাম। তার বিপদটাও কম ছিল না। একদিন একটা ঝুঁকি নিলাম। এক ভাটিয়া ভদ্রলোক বাসে উঠতে যাবে। ভীষণ ভিড়। মনিব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে আমিও সরে পড়লাম। নিরাপদ জায়গায় এসে ব্যাগ খুলে দেখলাম, দুখানা হাজার টাকার নোট। ব্যস্। আর নয়। এবার ফিরতে হবে।

কতকাল পরে বাড়ি ফিরছি। রাত প্রায় দশটা। কড়া নাড়তে গিয়ে বুক কাঁপছে। মনে হল অনেক দূরে চলে গেছি, অনেক নীচে নেমে গেছি। এ বাড়ি আমার নয়। মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকবার অধিকার আমার চলে গেছে। তারপর ঢুকে কি দেখবো কে জানে? এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল। সামনেই গোবিন্দ। আমাকে দেখেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল—অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে দাদাবাবু? এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? তার মুখ ধরে বললাম, চুপ চুপ। বাবা কেমন আছেন?

গোবিন্দ চোখ মুছতে মুছতে বলল, আর কেমন! তুমি যাবার পর থেকেই একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আর মাথা তুলতে পারেন না। বুকের অবস্থাও খুব খারাপ। কোন্‌দিন প্রাণটা বেরিয়ে যায়।

—মা কোথায়?

গোবিন্দ সেকথার জবাব দিল না। বাইরে যেতে যেতে বলল, তুমি ওপরে যাও। আমি চট করে একটা সোডা নিয়ে আসছি।

"বাবার ঘরে ঢুকে শিউরে উঠলাম। চোখ বুজে পড়ে আছেন—বাবা নন, বাবার কঙ্কাল। পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন, কে!

—আমি, বাবা।

—খোকা? অ্যাদ্দিনে এলি? বড্ড ভুল করেছিলি বাবা। আয়, কাছে আয়।

কাছে যেতেই ডান হাতটা কোনো রকমে তুলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর বুকের উপর মাথা রেখে চোখের জল আর রাখতে পারলুম না। অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়ে রইলাম। চোখের জলের ভিতর দিয়ে আমার মনের সব তাপ সব পাপ যেন গলে বেরিয়ে গেল। হালকা হয়ে গেল বুকটা। তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুই বড় হবি, মানুষ হবি, এই তো আমার একমাত্র সাধ। কিন্তু এ তুই কি করলি, খোকা? দশ-বিশ টাকায় আমাদের কি উপকার হবে বল? আর তার জন্যে তুই এমন করে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিস্‌? তোর সবগুলো মনি অর্ডার আমি তুলে রেখে দিয়েছি। কচি ছেলের এত কষ্টের রোজগার আমি পেটের দায়ে খরচ করবো!

আমি উঠে বসে বললাম, এবার অনেক টাকা এনেছি, বাবা। সকাল হলেই সবচেয়ে বড় ডাক্তার ডেকে আনবো। তোমাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠতে হবে। তারপর, চল, আমরা একটা চেঞ্জে গিয়ে থাকি।

মনিব্যাগটা খুলে নোট দুখানা বের করলাম।

সেদিকে একবার তাকিয়েই বাবার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। রুক্ষ স্বরে বললেন, একি! এত টাকা তুই কোথায় পেলি? আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—কে দিয়েছে, বল? আমার কাছে লুকোসনে। বল, কে দিয়েছে?

অতখানি বিচলিত হতে বাবাকে কখনো দেখিনি। ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ দেয়নি; আমি পেয়েছি।

—কি করে, কোত্থেকে পেয়েছিস?

আমি নিরুত্তর।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, চুরি করেছিস?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার মুখে এল না।

বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন।—চোর! আমার ছেলে চোর! হা ভগবান, এও আমাকে দেখতে হল!......

দুর্বল দেহ থরথর করে কাঁপছে। চোখ দুটো মনে হল যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। অদম্য উত্তেজনায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে চান। কী সর্বনাশ! আমি তাড়াতাড়ি ধরে শুইয়ে দিয়ে শীর্ণ মুখখানা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম, বাবা, তুমি চুপ কর, ঠান্ডা হও। এ টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো, ফেলে দেবো। তোমায় ছুঁয়ে বলছি, একাজ আর করবো না। তুমি স্থির হও......

আর বলতে হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেলেন। চিরদিনের মত স্থির। আমি কি ছাই তখনো বুঝতে পেরেছি? যখন বুঝলাম, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। সেই নিস্পন্দ দেহের উপর লুটিয়ে পড়লাম।

শেষকৃত্য যখন শেষ হল, তখনো সূর্যোদয় হয়নি। সকলের অলক্ষ্যে শ্মশান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সেই মনি-ব্যাগটা পকেটেই ছিল। সোজা থানায় গিয়ে সেটা জমা দিয়ে বললাম, আশা করি, মালিককে দেখলে চিনতে পারবো।

ভাটিয়া ভদ্রলোক থানায় ডায়রি করিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠান হল। চিনলাম। তিনিও তাঁর ব্যাগ এবং নোট সনাক্ত করলেন।

আমার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস দায়ের হল। কোমরে দড়ি এবং হাতে হাত-কড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে গেল।

হাকিমের বোধ হয় দয়া হয়েছিল আমাকে দেখে। প্রথম অপরাধ বলে একটা বন্ড নিয়ে ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবো আমি? কার জন্যেই বা যাবো? বললাম, এটা আমার প্রথম অপরাধ নয়। এ অপরাধ অনেকবার করেছি; ধরা পড়িনি। পুলিশ আমাকে সমর্থন করল। তাদের খাতায় আমার নাম ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট যেন বাধ্য হয়েই ছ মাসের জেল দিয়ে দিলেন।

ছ.মাস শেষ হয়ে এসেছে। খালাসের আর তিন দিন বাকি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম, তা পেলাম কই? কোথায় আমার শাস্তি? কোথায় আমার প্রায়শ্চিত্ত? আমি তো শুধু চোর নই, আমি পিতৃহন্তা। সে মহাপাপের দণ্ডভোগ তো আমার শেষ হয়নি। কোনো দিন হবে কিনা, তাও জানি না। যদি হয়, সেই দিন আপনার কাছে ফিরে যাবো।

—হতভাগ্য পরিমল।

সে আর ফিরে আসেনি।

দায়রা-বিচারে কাশিম ফকিরের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

সুযোগ্য জজসাহেব বয়সে নবীন নন কিন্তু জজিয়তির আসনে নবারূঢ়। পেছনে রয়েছে মুন্সেফ আর সবজজগিরির সুদীর্ঘ সোপান। ছিলেন ডিক্রি-ডিসামসের মালিক। জীবন কাটিয়েছেন পাট্টা কবুলিয়ত আর জীর্ণ ধুলো ঘেঁটে। মানুষ যা-কিছু ঘেঁটেছেন, সব ঐ দলিলের মত ঘুণে-ধরা,—জাল, জোচ্চুরি, ঘুষ আর মিথ্যা সাক্ষ্যের গোপন বিষে ন্যুব্জ-দেহ। সেই সব মানুষ দেখেছেন জজসাহেব। দেখেননি তাজা মানুষ, উচ্ছল প্রাণরসে ভরা মেঠো গেঁয়ো আর বুনো মানুষ, জীবন-মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

খুনীর সঙ্গে জজসাহেবের এই প্রথম পরিচয়, মৃত্যুদণ্ডে এই প্রথম হাতেখড়ি।

সে দণ্ডকে রূপ দিতে গিয়ে শুভ্রকেশ বিচারকের সুদৃঢ় লেখনী হয়তো একবার কেঁপে উঠেছিল। সে কম্পন অনুরণিত হল তাঁর আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে, বিচারমঞ্চের উচ্চাসন থেকে যখন তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর ন্যায়-নিবন্ধ কঠোর আদেশঃ—

....the said Kasim Fakir be hanged by the neck till he be dead....

দণ্ডদাতা বিচলিত হলেন, গ্রহীতা রইল নির্বিকার। পরম ঔদাসীন্যে গ্রহণ করল চরম আদেশ। রায় যখন শেষ হল, কাঠগড়ার উপর দাঁড়িয়ে একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল। মনে হল কাকে যেন খুঁজছে তার ব্যাকুল দৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল রেলিং-ঘেরা কাঠের মঞ্চ থেকে। পুলিশের লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। চোখেই পড়ল না। ফিরেও দেখল না অপেক্ষামান স্তব্ধ জনতার বিস্মিত দৃষ্টি। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আদালতের বাইরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে কালো ঘেরাটোপ ঘেরা কয়েদীর গাড়ি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন উকিলবাবু। মক্কেলের প্রাণরক্ষার জন্যে প্রাণপণ করেও ফল পাননি। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, গোটাকয়েক দার্শনিক সান্ত্বনা দিয়ে পূরিয়ে দেবেন সেই ব্যর্থতার শূন্য স্থান। কিন্তু মক্কেলের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখেও আর কথা জোগাল না। কোনোরকমে ব্যক্ত করলেন নেহাত যেটুকু কাজের কথা—এখানে একটা সই কর তো ফকির। সাত-দিনের মধ্যেই হাইকোর্টে আপীল দায়ের করতে হবে।

একটু থেমে অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, দেখা যাক আর একবার চেষ্টা করে।

ফকির দাঁড়াল। মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত বিকৃত হাসির কুঞ্চন। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কী লাভ বাবু? এখানেও তো চেষ্টা কম করেননি।

ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা আসাম সীমান্তের কোনো ডিস্ট্রিক্ট জেলে। দেশ ছিল তার ময়মনসিংহ, ইংরেজ-শাসিত বাংলার সবচেয়ে বড় জিলা। বিশাল ভূখণ্ড। শুধু আয়তনে নয়, তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে। দক্ষিণ আর পূর্বদিক জুড়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—ব্রহ্মপুত্র যমুনার অকৃপণ করুণায় শস্যসম্ভারে ঐশ্বর্যময়। রুদ্র বৈশাখের খরতাপে তার মাঠে মাঠে ফাটল ধরে। আষাঢ়ের শেষে সেখানেই নেমে আসে বর্ষার প্লাবন। ফেঁপে ফুলে কূল ছাপিয়ে ছুটে আসে দুর্বার-যৌবনা নদী। শ্রাবণে সেই মাঠের বুকে দশ হাত গভীর জলের উপর দিয়ে পাল তুলে যায় সওদাগরী পানসি, ভেসে বেড়ায় অসংখ্য জেলেডিঙি। জল শুধু জল। কিন্তু দেখে দেখে চিত্ত বিকল হয় না। তার রূপে নেই বন্ধ্যার রুক্ষতা। তার উপর বিছানো থাকে সুপুষ্ট শ্যামল আমন ধানের আস্তরণ। বন্যার সঙ্গে তাদের রেষারেষি। জল যদি বাড়ে চার আঙুল, ধানের গাছ উঠবে আধ হাত। রুদ্রা প্রকৃতির সঙ্গে করুণা-ময়ী প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। জয়পরাজয় নির্ভর করে মানুষের ভাগ্যের উপর।

কার্তিকের শেষে এই বিপুল জলরাশি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় ভোজ-বাজির মত। দীর্ঘ ধানগাছ লুটিয়ে পড়ে। মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সোনার শিষ। তার নিচে যে কোমল মাটি, তার মধ্যেও স্বর্ণ-রেণু, কৃষকের ভাষায় যার নাম পলি। তারই স্পর্শে মেতে ওঠে রবিশস্যের খন্দ, লকলক করে মটরের ডগা, হলুদের নেশা লাগে সর্ষে ক্ষেতে, গুঁজি তিলের অতসীফুল মনে ধরিয়ে দেয় বৈরাগ্যের ছাপ।

আল বাঁধা নেই, জলসেচ নেই, কাদাঘাঁটা নেই, একটি একটি করে ক্ষীণপ্রাণ

খানের চারা পুঁতে রুগ্ন শিশুকে তিল তিল করে মানুষ করবার দুরূহ সাধনা নেই, জল জল করে চাতকচক্ষে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার বিড়ম্বনা নেই। মাটিতে কয়েকটা আঁচড় কেটে যেমন-তেমন করে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গান গেয়ে মাছ ধরে আর দাঙ্গা করে দিন কাটায় ময়মনসিংহের চাষী। বাকি যা কিছু, সব দেয় নদী, দেয় ব্রহ্মপুত্র আর তার কল্যাণী কন্যা যমুনা। তাই এদেশের নাম নদী-মাতৃক দেশ।

এরা যে পাট জন্মায় তার খ্যাতি আছে ডান্ডী আর নিউইয়র্কের বাজারে। এদের বিরুই চালের মিষ্টি স্বাদ আজও লেগে আছে আমাদের মত বিদেশী অন্নভোজীর রসনায়। জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাকৃতিক ঔদার্য এদের দেহে দিয়েছে স্বাস্থ্যের দৃঢ়তা, মনে এনেছে নির্ভীক সারল্য। প্রাণ দেওয়া-নেওয়া এদের বিলাস। ধন এবং নারী-লুন্ঠন এদের ব্যসন। এদের পরিভাষায় 'abduction' কথাটার প্রতিশব্দ "বউটানা", অর্থাৎ পরের বৌকে প্রকাশ্য বাহু-বলে টেনে এনে বশ করার নাম নারীহরণ, গোপনে চুরি করে অরক্ষিতা কুমারী কিংবা বিধবার উপর বলপ্রয়োগ নয়। প্রথমটায় আছে হিংস্র পৌরুষ, দ্বিতীয়-টায় কামুকের ইতর কাপুরুষতা।

ময়মনসিংহ গীতিকবিতার দেশ। তারও মূলে আছে প্রকৃতির অজস্র বদান্যতা। বাংলার রত্নভান্ডারে বিক্রমপুর দিয়েছে মনীষা, বরিশাল দিয়েছে স্বদেশপ্রেম, আর ময়মনসিংহ দিয়েছে পল্লীকাব্য। এর পথে ঘাটে, নদীর চরে, আমের বনে, নিরক্ষর কৃষকের গোবর-নিকানো আঙিনায় এখনো ভেসে বেড়ায় নদের ঠাকুর আর মহুয়া বেদেনীর বিরহ-মিলন, লীলাকঙ্কের প্রেমগুঞ্জন, কবি চন্দ্রাবতীর মৌন আত্মত্যাগ।

এই গেল দক্ষিণের রূপ। উত্তরের চেহারা একদম আলাদা। সেখানে নেই দক্ষিণের এই প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য। রুক্ষ বন্ধুর বনভূমি, মাঝে মাঝে অনুচ্চ পাহাড়-শ্রেণী। কৃপণা বসুমতী প্রসন্ন সহাস মুখে বরদান করেন না। বহু খোঁড়াখুঁড়ি করে তবে শস্যকণার সাক্ষাৎ মেলে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের একটা অংশ জুড়ে রয়েছে মধুপুরের গড়। এককালে ছিল ভবানী পাঠকের কর্মক্ষেত্র, আজ পুলিশ-ভীত দস্যু-তস্কর এবং ফেরারী আসামীর লীলাভূমি। এরই কোনোখানে জনহীন জঙ্গলে-ঘেরা এক টিলার ধারে ছিল কাশিম ফকিরের আখড়া। পাশাপাশি দুখানা খড়ের চালা, একটি ভাঙ্গা দরগা, তার চারদিকে ঘিরে ভাঙ্ আর ধুতুরার বন। সম্পত্তির মধ্যে

ছিল নাতনীর বয়সী একটি রূপেসী স্ত্রী, গোটাকয়েক গোরু-ছাগল, একপাল মুরগী আর একটি ময়না।

ফকির পঞ্চাশোর্ধ্ব। তার উপর তার যৌবনের ইতিহাস চিহ্নিত আছে পুলিশের খাতায়। তার এই বনংব্রজেৎ অর্থহীন নয়। কিন্তু একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা চঞ্চলা নারী কোন্ দুঃখে কিংবা কিসের আকর্ষণে সংসারের যা-কিছু সব ত্যাগ করে বরণ করেছিল এই নির্জন বনবাস, বেছে নিয়েছিল এক অনাসক্ত বৃদ্ধের নিরানন্দ সঙ্গ, সে-রহস্য জানেন শুধু তার সৃষ্টিকর্তা।

বৃদ্ধ ফকির দরগার পাশে বসে মালা জপ করে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকে, কুটী, ও-ও কুটী। কুটীবিবি তখন বন্য হরিণীর মত চঞ্চল চরণে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, উদ্‌গত-শৃঙ্গ, সতেজ ছাগশিশুর সঙ্গে "পৈট্" খেলে—তার মাথা ধরে ঠেলে, ক্ষেপিয়ে দেয় আর সে যখন সামনের পা দুটো তুলে শিঙ উঁচিয়ে লাফিয়ে আসে, হাততালি দেয় আর খিলখিল করে হাসে। কখনো মুরগীর পেছনে তাড়া করে বেড়ায়, সুর নকল করে ঝগড়া বাধায় কোকিলের সঙ্গে, কিংবা পোষা ময়নার গলা ধরে ভাব জমায়।

মাঝে মাঝে ফকির সফরে বেরোয়। আলখাল্লা পরে ঝুলি কাঁধে ফেলে একমুখ দাড়ি আর একমাথা পাকা চুল নিয়ে আঁকাবাঁকা লাঠিটা হাতে করে যখন বনপথে অদৃশ্য হয়ে যায়, কুটী সেদিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। কি ভাবে, কে জানে? ফকিরের ফিরতে মাস কেটে যায়। হাটে হাটে কেরামতি দেখিয়ে বেড়ায়, তাবিজ কবচ দেয়, জলপড়া খাওয়ায়, ঝাড়ফুঁক করে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনো একটা আড়াল জায়গা বেছে নিয়ে নোট ডবলের খেলা দেখায়। দুটাকা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চার টাকা করে দেয়, পাঁচ টাকাকেও দশ টাকা করে। তার বেশী যদি কেউ দেয়, ফিরিয়ে দিয়ে বলে, আখড়ায় যেও। দরগার সিন্নি লাগবে এক টাকা সোওয়া পাঁচ আনা। একা যেও; লোকজন থাকলে হবে না।

তারপর একদিন ফকির ফিরে আসে। ঝোলাভর্তি টাকা সিকি আর বৌ-এর জন্যে টুকিটুকি। কুটীর খুশি আর ধরে না।

দু-চার দিন পরেই আসতে শুরু করে নোট-ডবলের মক্কেলের দল। ছোট-খাট পার্টিকে আমল দেয় না ফকির। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দেয়। তিন, চার, পাঁচ শ নিয়ে যারা আসে তাদের বলে, বসো। রাত এক পহরের পর সিন্নি হবে।

প্রহর কেটে যায়। মক্কেলের ডাক পড়ে দরগার পাশে। ফকির

সমাধিস্থ। ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরছে তার হাতের তসবী। রাত বাড়তে থাকে। টিলার পেছনে প্রহর জানায় শেয়ালের পাল। নিস্তব্ধ বনালয়ে মাঝে মাঝে শোনা যায় বন্য জন্তুর ডাক। হঠাৎ এক সময়ে কাশিম চোখ মেলে চায়। তসবী কপালে ঠেকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বলে, খোদা মেহেরবান্। দাও, টাকা দাও।

ভক্ত নোটের তাড়া তুলে দেয় ফকিরের হাতে। রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করে, কখন সে তাড়া ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

—এই নাও সিন্নি।

ভক্ত হাত বাড়িয়ে নেয় দুখানা বাতাসা, একটু ফল আর এক গেলাস সুস্বাদু শরবত। সমস্ত দিনের ক্লান্তির ও দীর্ঘ অনশনের পর ভারী ভাল লাগে। কিন্তু এ কি! সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ছে কেন? চোখ যে আর খুলে রাখা যায় না। ঘুম আসছে। অপার, অনন্ত ঘুম। সে-ঘুম যেন আর ভাঙবে না।

সে ঘুম সত্যিই আর ভাঙে না। ঘণ্টাখানেক পরে মাথার দিকটায় স্বামী আর পায়ের দিকটায় স্ত্রী, ভক্তকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় টিলার পেছনে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে কাটা আছে সুন্দর কবর। অজ্ঞান ভক্তকে তারই মধ্যে ফেলে দিয়ে ফকির কপালের ঘাম মোছে। কুটী হেসে ওঠে কলকণ্ঠে। বনপ্রান্তে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। তারপর নিপুণভাবে মাটিচাপা দিয়ে, ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যায়। এবং পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ে। সকালে উঠে নোটগুলো হাঁড়ি-বন্ধ করে পুঁতে রাখে মাটির তলায়। তারপর বেশ করে জল দেয় ভাঙ্ আর ধুতরা গাছের জঙ্গলে।

এমনি করে বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে মহাসুখে ছিল ফকির-দম্পতি। মাঝে মাঝে হতভাগ্য মক্কেলের কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি আসত তার খোঁজে, ফকির একেবারে আকাশ থেকে পড়ত। সে যে সেইদিনই ডবল নোট ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল। কি বল, বিবিজান, তাই না? বিবিজান ঘর ঝাঁট দেওয়ার ফাঁকে কিংবা রান্না করতে করতে মুখ টিপে হাসে। বলে, সে তো সেই ক—বে চলে গেছে। ফকির ব্যস্ত হয়ে পড়ে, খোঁজ খোঁজ ভালো করে খোঁজ। বড্ড ডাকাতের উৎপাত এ দিকটায়। অতগুলো টাকা নিয়ে ইস্......

তারপর একদিন এল এক নতুন মক্কেল। বাইশ-তেইশ বছরের জোয়ান ছোকরা। দেহ তো নয়, যেন নিপুণ ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের মূর্তি। মাথায় ঢেউ-খেলানো বাবরি চুল। সরু কোমরে আঁট করে বাঁধা লাল চারখানার গামছা। হাতে তেলে পাকানো বাঁশের লাঠি। চঞ্চল চোখ দুটো দিয়ে উপচে পড়ছে স্বাস্থ্য আর খুশির ঝলক। এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আসছিল ফকিরের আস্তানা। আঙিনার পাশে প্রথমেই চোখাচোখি হয়ে গেল কুটীর সঙ্গে। থমকে দাঁড়াল ছেলেটি। মুখে ফুটে উঠল স-কৌতূহল বিস্ময়ের চিহ্ন। তারপর সেটা মিলিয়ে গেল কৌতুক হাসির কুণ্ডনে। সে হাসির নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি জেগে উঠল কুটী-বিবির অনিন্দ্য ঠোঁট দুখানির কোণে। সে শুধু পলকের তরে। তারপর তার সদা-চঞ্চল চাহনির উপর নেমে এল কালো একজোড়া আঁখি-পল্লব। আনত দীপ্ত মুখের উপর দেখা দিল আরক্তিম ছায়া। কিসের ছায়া কে জানে?

ফকির দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল, মক্কেল এগিয়ে গিয়ে একটা নোটের বান্ডিল তার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, পাঁচশ টাকা আছে। গুনে নাও। আর এই নাও তোমার সিন্নির খরচা, এক টাকা সোওয়া পাঁচ আনা, বলে ট্যাঁক থেকে খুচরো পয়সাগুলো ছুঁড়ে দিল মেঝের উপর। ফকির কথা বলল না। ইঙ্গিতে বসতে বলে হুঁকোটা তুলে দিল শাঁসালো মক্কেলের হাতে। তারপর সিন্নির পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, নোট রেখে দাও। ও-সব কি দিনের বেলায় হয়? জিরোও, তামাক খাও। সিন্নি হবে সেই রাত এক পহর বাদে।

বহুকাল পর সেদিন চিরুনি পড়ল কুটীবিবির মাথায়। জটপাকানো অবাধ্য চুলের বোঝা কোনোরকমে বশে এনে খোঁপায় পরল একটি নাম-না-জানা বনফুল। তারপর বেশ করে গা ধুয়ে এল আধ মাইল দূর এক ঝরনা থেকে। বাড়ি এসে পরল একখানা আসমানী রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি। গত বছর ঈদের সময় ফকির এনে দিয়েছিল কোন্ হাট থেকে। দুবার মাত্র পরেছে কাপড়খানা। ফকির বলেছে, চমৎকার মানায় তাকে।

কই, কোথায় গেলে? মিঞাসাব্‌কে কিছু খেতে টেতে দাও। কদ্দুর থেকে আসছে বেচারা। বেলা কি আর আছে?

—এখানে পাঠিয়ে দাও। খাবার দিয়েছি, রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল কুটী।

অতিথি এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের সামনে। কুটী বেরিয়ে এল। হাতে

একবাটি দুধ আর একসাজি মুড়ি। একবার চেয়ে দেখল তার অতিথির মুগ্ধ দৃষ্টির পানে। একখানা মাদুর বিছিয়ে দিল দাওয়ার উপর। সযত্নে আঁচল দিয়ে মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসো না?

হোসেনের যেন জ্ঞান ফিরে এল এতক্ষণে। বলল, তুমিও থাক নাকি এই জঙ্গলে?

কুটী অবাক—বাঃ কোথায় থাকবো তবে?

—কি করে এলে এখানে?

কুটী কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলল, আহা! জানেন না যেন? আমি তো ফকির সাহেবের বিবি।

ঐ ফকিরের বিবি তুমি!—বলে হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেল ছোকরা।

বিবি বিরক্ত হল, হাসছ যে?

—না না, ও কিছু না। এই টাকাটা তুলে রাখো। আমি ফাঁকা থেকে ঘুরে আসি একটু। উঃ, কী জঙ্গল। দম আটকে আসছে,—বলে দুধটা এক চুমুকে শেষ করে আর মুড়ির সাজিটা কোঁচড়ে ঢেলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেল।

কুটী নিজ হাতে জবাই করল তাদের সবচেয়ে যেটা সেরা মুরগী। যত্ন করে রাঁধল তার "ছালুন", আর চমৎকার লাল বিরুই চালের ভাত। ঘন করে জ্বাল দিল নিজের হাতে দোওয়া কালো গোরুর দুধ। সামনে বসে খাওয়াল অতিথিকে। খানিকটা দুধ রেখে উঠে যাচ্ছিল হোসেন। কুটী অনুনয় করে বলল, আমার মাথার দিব্যি, ওটুকুন খেয়ে ফেল।

তারপর একটু মুখ টিপে হেসে তরল কণ্ঠে বলল, একে তো জঙ্গলে এসে মিঞাসাহেবের মনটা পালাই পালাই করছে। তারপর দুটো পেট ভরে খেতে না পেলে বাড়ি গিয়ে এক ঝুড়ি নিন্দে হবে তো আমার?

হোসেন সে প্রশ্নের জবাব দিল না। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, খু—ব খেলাম। এত যত্ন করে সামনে বসে আমাকে কেউ কোনোদিন খাওয়ায়নি।

কেরোসিনের ঢিবরির মৃদু আলোকে কুটীবিবির মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যে নিশ্বাস, তাও সে চেপে গেল।

খাবার পর হোসেন মিঞা বারান্দায় বসে গল্প করছিল ফকিরের সঙ্গে।

পাশের চালাটায় নিজে হাতে পরিপাটি করে বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে দিয়ে কুটী এসে বলল, এবার কিন্তু শুয়ে পড়তে হবে। সেই কোন্ দেশ থেকে কত মেহনত করে আসা। এখন কি গল্প করবার সময়?

হোসেন চলে গেলে ফকিরের পাশে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবল কুটীবিবি। তারপর দৃঢ় চাপা গলায় বলল, এর বেলা ও-সব চলবে না, বলে দিলাম। ফকির লক্ষ্য করছিল সবই। অন্ধকারে চোখ দুটো তার হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। ব্যগ্র করে বলল, বড্ড দরদ দেখছি। এরই মধ্যে মজে গেলি?

মজেছি, বেশ করেছি—রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল কুটী, কিন্তু এর যদি কিছু করতে যাস, তোরই একদিন কি আমারি একদিন। মনে থাকে যেন।

ফকির নিজেকে সামলে নিল। আঁচল ধরে টেনে বসাল বৌকে। কণ্ঠে আদর ঢেলে বলল, তোর কথা আমি কোনোদিন ঠেলেছি, না ঠেলতে পারি কুটী? তোকে ক্ষেপাচ্ছিলাম একটু।

বৌএর সুন্দর মুখখানা তুলে ধরে বলল, বাঃ, আজকে তোকে যা দেখাচ্ছে কুটী!

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে কুটী উঠে চলে গেল। যতদূর দেখা যায়, পেছন থেকে এক জোড়া হিংস্র জ্বলন্ত চোখ তার চলন্ত দেহের উপর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

গভীর নিষুতি রাত। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ এইমাত্র হেলে পড়েছে দূরে, বনের আড়ালে। জীব-জগৎ নিষুপ্ত। জেগে আছে শুধু গহন বন। তার অদ্ভুত রহস্যময় ভাষা শোনা যায় নিস্তব্ধ রাত্রির কানে কানে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কাশিম ফকির। আলগোছে বাঁশের ঝাঁপ খুলে নিঃশব্দে তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বিছানার এক প্রান্তে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে তার রূপসী স্ত্রী। গাছের আড়াল থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার সুপ্ত সুন্দর মুখের উপর। সে মুখে যেন ফুটে উঠেছে কোন্ সদ্যলব্ধ পরম তৃপ্তির আভাস। স্বল্পাবৃত উন্নত বুকখানা উঠছে, নামছে নিশ্বাসের তালে তালে। নিঃশব্দে চেয়ে রইল ফকির। তাব কুৎসিত শীর্ণ মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁতে উঠল ঘর্ষণের শব্দ। কোটরগত চোখ থেকে ঠিকরে পড়ল জ্বালা। শিরাবহুল হাতের শক্ত কাঠির মত আঙুলগুলো দংশনোদ্যত বৃশ্চিকের মত এগিয়ে গেল নিদ্রিতার গলার কাছে। একটিবার

টিপে ধরলেই শেষ হয়ে যাবে ঐ বুকভরা নিশ্বাসের ভাণ্ডার। তাই যাক্
—অস্ফুট গর্জন শোনা গেল ফকিরের ভাঙা গলায়, তাই যাক। দুনিয়া থেকে
সরে যাক শয়তানী।......

নিজের স্বর শুনে চমকে উঠল ফকির। হাত গুটিয়ে পা টিপে টিপে
নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

পাশের ঘরে নতুন বিছানার আর নতুন অনুভূতির উত্তেজনায় হোসেনের
ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল বারে বারে। ফকিরের হাত তার গায়ে ঠেকতেই ধড়মড়
করে উঠে বসল।

—কে ?

আমি, ফিসফিস করে উত্তর এল। সময় হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে
বেরিয়ে এস।

দরজার পাশে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তার কাছে নিয়ে মক্কেলকে
বসিয়ে দিলে মাদুরের উপর। গায়ে মাথায় খানিকটা মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে
দিয়ে বলল, নোট দাও।

—নোট তো বিবির কাছে।

বিবির কাছে! সেখানে কি করে গেল ?

—আমি রাখতে দিয়েছি।

আরেকবার জ্বলে উঠল ফকিরের হিংস্র চোখ দুটো।

—বেশ, এই নাও সিন্নি। খোদার নাম নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেল।—
ভক্তের হাতে তুলে দিল শরবতের গেলাস।

একরাশ কড়া ভাঙ্ আর তার সঙ্গে মেশানো ধুতরার বিষ। অত বড়
বলিষ্ঠ ছোকরা আধ ঘণ্টার মধ্যে অসাড় হয়ে গেল। ফকিরের জীর্ণ দেহে
কোথা থেকে এল অসুরের শক্তি। আলখেল্লা খুলে ফেলে দিয়ে দোহাই আল্লা
বলে পা ধরে টেনে নিয়ে চলল হোসেনের নিশ্চল দেহ। বারে বারে বসে
দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে কোনোরকমে পৌঁছল গিয়ে টিলার পেছনে। কবর
খোঁড়াই ছিল। ঠেলে ফেলতেই গলা থেকে বেরোল অস্ফুট গোঙানির শব্দ।
পাগলের মত কোদাল চালাল ফকির। কবর ভরে গেল। গোঙানির আওয়াজ
স্তব্ধ হল চিরদিনের তরে। কাশিমের কাজ যখন শেষ হল রাত্রির শেষ প্রহর
তখন বিদায়োন্মুখ।

কুটীর ঘুম ভাঙল ভোরবেলা কি এক দুঃস্বপ্ন দেখে। তাড়াতাড়ি চোখ
রগড়ে বাইরে এসে প্রথমেই ছুটে গেল পাশের ঘরে। এ কি! ঘর যে খালি!

ফকির পড়ে ছিল বারান্দায়, ঘুমিয়ে কিংবা ঘুমের ভান করে। ডাকতেই খেঁকিয়ে উঠল, ডাকাডাকি করছিস কেন ভোরবেলা

—ওকে তো দেখছি না, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল কুটী।

—চলে গেছে হয়তো।

ফকির আর জবাব দিল না। কুটী উদ্‌ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল শরবতের শূন্য গেলাস। একবার নাকের কাছে ধরতেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। এ গন্ধ তো তার অচেনা নয়। ছুটে গেল টিলার ধারে। যেটুকু সন্দেহ তখনো লেগে ছিল মনের কোণে নিঃশেষে উড়ে গেল।

উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে ফকিরের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল কুটীবিবি। পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে এল কান্না। সে কান্নার যেন আর শেষ নেই। ফকির তাকিয়ে রইল সর্প-চক্ষু মেলে, যেমন করে তাকিয়ে থাকে ব্যাধ, তারই হাতে শর-বিদ্ধ যন্ত্রণা-বিহ্বল হরিণীর দিকে।

হঠাৎ কি মনে করে উঠে বসল কুটী। আয়ত চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাতলা ঠোঁট দুটির উপর ফুটে উঠল ক্রূর হাসির বাঁকা রেখা। ঢলঢলে মুখখানা যেন এক নিমেষে কঠিন পাথর হয়ে গেল। চঞ্চলা হরিণী মরে গেল। তার থেকে জন্ম নিল এক ক্রুদ্ধা সর্পিনী।

কাশিম বিস্ময়-ভীত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল এ রূপান্তর। কিন্তু কণ্ঠ তার নির্বাক। কুটীবিবি সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোমরের চারদিকে শক্ত করে জড়িয়ে নিল লুটিয়ে-পড়া আঁচল। তারপর স্বামীর মুখের উপর তর্জনী তুলে রুদ্ধশ্বাসে বলল, শোধ নেবো, এর শোধ নেবো আমি।

কাশিমের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই সে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফকির ছুটল,—কোথায় যাস কুটী? ফের্, শোন্?

কেউ সাড়া দিল না। মুহূর্তের বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তড়িৎ-গতি তনুদেহ।

বন ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠের শেষে আবার বন। গ্রীষ্মের চষা ক্ষেত। মাটি তো নয়, যেন পাথর। কোমল পা দুখানা রক্তে ভরে উঠল। ফিরেও দেখল না কুটী। ভ্রূক্ষেপ করল না বিস্মিত পথিকের হতবাক কৌতূহল। মাঝে

মাঝে শুধু শোনা গেল ক্লান্ত কণ্ঠের ব্যাকুল প্রশ্ন,—কোনো পথচারীকে চমকে দিয়ে—বলতে পার, থানা আর কদ্দুর ?

চৈত্রের আকাশ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। সুগোর মুখখানায় ফেটে পড়ছে রক্তের আভা। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গের বসন। কুটীর দাঁড়াবার অবসর নেই। চলছে তো চলছেই।

বাইশ মাইল পথ পার হয়ে থানার মাঠে এসে যখন পেঁছিল, মনে হল, তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বারান্দায় উঠতে পারল না। অস্ফুট কণ্ঠে একবার শুধু বলল, পানি। বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ডাক্তারের সাহায্যে জ্ঞান যখন ফিরে এল, চোখ মেলেই চেঁচিয়ে উঠল কুটী—খুন, খুন হয়েছে রাউজানের জঙ্গলে। শীগগির চল তোমরা।

চলবার শক্তি ছিল না। সেই রাত্রেই ডুলি চড়ে পুলিশের সঙ্গে ফিরে এল আখড়ায়। কবর খুঁড়ে বের করা হল হোসেনের মৃতদেহ। মনে হল যেন জোয়ান ছেলেটা এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একবার ডাকলেই উঠে পড়বে। কুটী চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। পরম স্নেহে আঁচল দিয়ে মুখের উপর থেকে মুছে নিল মাটির দাগ। ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, ওগো, একজন ডাক্তার ডাক, তোমরা। ও মরেনি। একটু ওষুধ দিলেই বেঁচে উঠবে।

পাশের কবরগুলোও খোঁড়া হল। পাওয়া গেল একটা গলিত শব আর দশটা কঙ্কাল।

কথা হচ্ছিল কাশিম ফকিরের উকিল সুজিৎ রায়ের বৈঠকখানায়। ভদ্রলোকের বৃত্তি ওকালতি কিন্তু প্রকৃতি সাহিত্যিক। প্রথমটা তার উপজীবিকা, দ্বিতীয়টা উপসর্গ। মফঃস্বল শহরে মাঝে মাঝে কোনো সাহিত্যিক-যশঃপ্রার্থী স্থানীয় লেখকের ক্লান্তিকর প্রবন্ধ কিংবা নিদ্রাকর্ষক কবিতা পাঠ উপলক্ষ করে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বৈঠকখানায় যে-সব চা-জলযোগের বৈঠক বসে, এই উকিলবাবুটি তারই একজন অকৃত্রিম সভ্য। ওরই একটা কি অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে-পরিচয় ক্রমশ গাঢ়তর হয়ে বন্ধুত্বের কোঠায় প্রমোশন লাভ করবার আয়োজন করছে, সেই সময়ের কথা। মক্কেলের জন্যে মৃত্যুদণ্ড আর নিজের জন্যে পরাজয় পকেটস্থ করে বাড়ি ফিরেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম, উকিল হলেও ঘটনাটা

তাঁর বুদ্ধির কোঠা পার হয়ে অন্তরের দরজায় করাঘাত করে ফেলেছে। কোনোরকম ভূমিকা না করেই তিনি কাশিম ফকিরের দীর্ঘ কাহিনী একটানা শুনিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, আমি উপলক্ষ মাত্র, কথাগুলো শোনালেন তিনি নিজেকেই।

আমি জেলের লোক। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস আমার মনের পাতায় দাগ কাটে না। আমি দেখলাম ওর গদ্যময়-বাস্তব দিকটা। বললাম, ফকির সাহেবের কল্যাণে আপনার খাটুনি যেটা হয়েছে, সেটা না হয় ছেড়ে দিলাম; খরচ-পত্তর বাবদ উকিলবাবুর পকেটের উপরেও তো চাপ কম পড়েনি। উনি বললেন, ঠিক উল্টো। বরং পারিশ্রমিক বলে পকেটে যেটা এসেছে, তার পরিমাণ, উকিলবাবু সচরাচর যা পেয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশী বই কম নয়।

বিস্মিত হলাম, বলেন কি? কোন্ সূত্রে এল? ফকিরের এতবড় বান্ধবটি কে?

—কেন, ওর বৌ কুটীবিবি?

আমি এমন চোখে তাকিয়ে রইলাম, সাধুভাষায় যাকে বলে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচন।

সুজিৎবাবু আরো পরিষ্কার করে বললেন, খরচ-পত্তর তো দিয়েছেই, পাঁচবার দেখা করেছে আমার সঙ্গে।

কৌতূহল দমন করা গেল না। প্রশ্ন করলাম, স্বামী পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে চায়নি?

—না। একদিন আমি তুলেছিলাম সে কথা। মুখ বেঁকিয়ে বলল, ও মুখপোড়াকে দেখে আমার কি হবে? কিন্তু একথা সে অনেকবার বলেছে আমাকে, টাকা যা লাগে দেবো, উকিলবাবু। তুমি খালি দেখো, গলাটা যেন ওর বেঁচে যায়।

কিন্তু গলা বাঁচাতে পারলুম না, নিঃশ্বাস ফেলে বললেন সুজিৎবাবু।

উকিলবাবু যখন ছেড়ে দিলেন, তখন রাত এগারটা। সমস্ত রাস্তাটা ফকির-দম্পতির কীর্তি-কাহিনীই মন আচ্ছন্ন করে রইল। একবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছা হল লোকটাকে। বাড়ি না ফিরে সোজা জেলের মধ্যে গিয়ে হাজির হলাম।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নির্জন কক্ষ—জেলের ভাষায় যাকে বলে ফাঁসি ডিগ্রি বা কন্ডেম্‌ড সেল। লোহার গরাদে দেওয়া রুদ্ধ দরজা।

তার ঠিক সামনেই জ্বলছে একটা তীব্র লণ্ঠনের আলো। তারই পাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক প্রহরী। এই একটি মাত্র কয়েদির জন্যেই সে বিশেষভাবে নিয়োজিত। তার শ্যেনচক্ষুর প্রখর অবরোধ থেকে একটি সেকেন্ডের তরেও মুক্তি নেই হতভাগ্য বন্দীর। ডিউটি-অন্তে ও যখন চলে যাবে, ওর জায়গায় আসবে আর একজন। সে গেলে আর একজন। যতদিন না একেবারে মুক্তি হয় ঐ বন্দীর—এই প্রহরী-পরিক্রমার বিরাম নেই। এইটাই আইনের বিধান। জানি না, এ বিধান কার রচনা। যারই হোক, ঐ একচক্ষু প্রহরীর মত তিনিও বোধ হয় দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র রাষ্ট্রশাসনের বেদির উপর। ঐ সিপাহীর মত তাঁরও হাতে ছিল সমাজ-স্বার্থের লণ্ঠন। যার জন্যে তাঁর বিধান রচিত হল, সেই মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে, তার দিকে চেয়ে তিনি তাঁর আইনের একটি ধারাও যোজনা করেননি। একথা তাঁর মনে হয়নি মৃত্যুদণ্ড যত বড়ই নিষ্ঠুর হোক, এই হুঁশিয়ারির দণ্ড তার চেয়েও নির্মম। ফাঁসি-মঞ্চের যে অদৃশ্য ছায়া ঐ লোকটাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করছে, দিনরাত্রির কোনো না কোনো ক্ষণে তাকে হয়তো ও ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারে না এই সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টির অনুসরণ। সে-যে অষ্টপ্রহর নজরবন্দী, তার আহার নিদ্রা শয়ন উপবেশন, তার কর্মলেশহীন দিনরাত্রির ক্লান্তি ও বিশ্রাম, সবারই উপর চেপে রয়েছে এই যে নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার নিশ্ছিদ্র আবরণ, সে কি প্রতি নিমিষেই তার কণ্ঠরোধ করছে না? যে-দুটি দৈনন্দিন জৈব ক্রিয়া দেহী মাত্রেরই অবশ্য করণীয় অথচ মানুষ-মাত্রেরই গোপনীয়, তার জন্যেও কি এতটুকু অন্তরালের প্রয়োজন হয়নি ফাঁসির আসামীর?

শুনেছি, সম্ভাব্য আত্মহত্যার দুর্গতি থেকে রক্ষা করবার জন্যেই মৃত্যু-দণ্ডিতের উপর এই সতর্কতার অভিযান। কিন্তু তার দৈহিক হত্যাটাই বড় হল? আর, এই যে পলে পলে তিলে তিলে আত্মহত্যা করছে তার আত্মা, শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে তার লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব, সে কথাটা কি ভেবে দেখেছিলেন আইন-স্রষ্টা বিজ্ঞের দল।

আর একটু এগিয়ে সেলের ঠিক সামনেটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বালিশশূন্য কম্বলশয্যার উপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে আমার বন্দী, Condemned Prisoner কাশিম আলি ফকির। ঘুমুচ্ছে, না জেগে আছে, কে জানে? সে যে আছে, এইটুকুই আমার প্রয়োজন। এইটুকু দেখে এবং আমার বিশ্বস্ত

কর্মীর মুখে শুনেই আমি নিশ্চিন্ত। তার মনের খবর আমি রাখি না। রাখবার কথাও নয়। তবু, কেন জানি না, কেমন আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে রইলাম ঐ সাড়ে চার ফুট লম্বা শীর্ণকায় লোকটার দিকে। ওর একমাথা চুল, একমুখ দাড়ি, মুদ্রিত চোখের কোণে গভীর বলি-রেখা, শীর্ণ দেহের উপর ঢোলা পোশাক এবং বিশেষ করে ওর ঐ পড়ে থাকবার নিশ্চিন্ত ভঙ্গী—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন মনে হল হাস্যকর—ইংরাজিতে যাকে বলে funny, এই লোকটা খুন করেছিল? একটা নয় দুটো নয় বারোটা খুন!

ফকির আপীল করেনি। তবু আইনের বিধানে মৃত্যুদণ্ডে মহামান্য হাইকোর্টের সম্মতি প্রয়োজন। কদিনের মধ্যেই সে সম্মতি এসে গেল—Death sentence confirmed. এর পর রইল প্রাণ-ভিক্ষার পালা। প্রথমে ছোটলাট; সেখানে ব্যর্থ হলে বড়লাট; তিনিও যদি বিরূপ হন, মহামহিম ভারত-সম্রাট। Mercy petition-এর খসড়াও তৈরি হল—বহু যত্নে রচিত, বহু হৃদয়দ্রাবী বিশেষণের একত্র সমাবেশ। কিন্তু ফকির সে আবেদনে টিপ সই দিতে রাজী হল না। প্রাণভিক্ষা চায় না সে। অতএব অনাবশ্যক বিলম্ব না করে ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গেল। আসামীর কাছে সেটা প্রকাশ করবার নিয়ম নেই।

কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে?—সরকারীভাবে প্রশ্ন করা হল ফকিরকে।

একমুহূর্ত কি ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল—না।

দিন তিনেক পরে বিকাল-বেলা সেলব্লকের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছি। ফকির বসেছিল তার 'ডিগ্রির' দরজার ঠিক পেছনে। মুখ দেখে মনে হল কি যেন বলতে চায়। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে?

ফকির একটু ইতস্তত করে বলল, এখানে মেয়েমানুষ আসতে পারে, বাবু?

—কেন পারবে না? কাউকে দেখতে চাও?

—আমার বিবিকে একবার দেখতে চাই। নাম কুটীবিবি; মধুপুর থানায় রাউজান গ্রামে বাড়ি।

সরকারী চিঠি গেল কুটীবিবির নামে। তার নকল পাঠানো হল থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে। বেসরকারী খবর পাঠালাম সুজিৎবাবুর বৈঠকখানায়। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং দিন সাতেক খোঁজাখুঁজি করে শুষ্ক মুখে এসে বললেন, পাওয়া গেল না মলয়বাবু। রায়ের

দিনও কোর্টে এসেছিল। কিন্তু হাকিম উঠে যাবার পর বাইরে এসে আর দেখতে পাইনি।

থানা থেকেও খবর এল, উক্ত ঠিকানায় কুটীবিবি নামক কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল না।

নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। রাত চারটা বাজতেই আসামীকে ডেকে তোলা হল। বড় জমাদার তার সেলের সামনে গিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, বেরিয়ে এসো, ফকির। গোসল সেরে নিয়ে আল্লার নাম কর।

কাশিম ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। সেলের দরজা খোলা হল। ফকির জমাদারের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে হবে?

এর উত্তরটা বোধ হয় আটকে গেল তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ কর্মচারী বহুদর্শী চীফ্ হেডওয়ার্ডার গজানন্দ সিংহের মুখে। গোসল বা আল্লার নাম করতে ফকির কোনো উৎসাহ দেখাল না। সেলব্লকের মেট এবং পাহারাওয়ালা এগিয়ে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এল। মাথায় কয়েক মগ জল ঢেলে পরিয়ে দিল এক সুট নতুন তৈরি জাঙ্গিয়া কুর্তা। মেট মুসলমান। ফকিরকে পাশে নিয়ে সেই নমাজ পড়ল। ফকির অনুসরণ করল যন্ত্রচালিতের মত।

শেষ ব্যবস্থা তদারক করবার জন্যে সেল-ইয়ার্ডে যখন হাজির হলাম, ঠিক তখনই ফকিরের নমাজ শেষ হয়েছে। এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, সে এল না বাবু?

একমুহূর্ত ভেবে নিলাম। তারপর বললাম, এসেছিল ফকির। কিন্তু তোমার খবর শুনে কেঁদে কেঁদে অফিসের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, এ অবস্থায় ওকে দেখা করতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওষুধ-পত্তর দিয়ে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। ফকির সর্বাঙ্গ দিয়ে শুনে গেল আমার কথার প্রতিটি অক্ষর। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে অস্ফুটকণ্ঠে নিশ্বাস ফেলে বলল, আল্লাহ্। মনে হল, এই নিশ্বাসের সঙ্গেই যেন বেরিয়ে গেল তার নিভৃত অন্তরের কোন্ বহুদিন-রুদ্ধ বেদনার বোঝা। রাত্রি শেষের ক্ষীণালোকেও স্পষ্ট দেখলাম, মলিন মুখখানা তার এক নিমিষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শীর্ণ কোটরাগত চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েকফোঁটা নীরব অশ্রু।

অন্তর্যামী জানেন, ফকিরকে যা বলেছিলাম, তার সমস্তটাই আমার রচনা।

কিন্তু ঐটুকু মিথ্যার মূল্যে যে-পরম বস্তু সেদিন পেলাম, তার সঙ্গে বিনিময় করতে পারি সমস্ত জীবনব্যাপী সত্য-ভাষণের বিপুলের গৌরব। শুধু কি পেলাম ? যে অমৃত তুলে দিলাম এই মৃত্যুপথযাত্রীর হৃদয়পাত্রে, তার মরণজয়ী মাধুর্য আমার জীবনেও অক্ষয় হয়ে রইল।

ফাঁসি-যন্ত্রের চারদিকে কর্মব্যস্ততা চঞ্চল হয়ে উঠল। সুপার-সাহেব এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী ইউনিফর্মে সজ্জিত জেলর এবং তার সহকারীর দল সার বেঁধে এসে দাঁড়ালেন একদিকে। আর একদিকে দাঁড়াল সশস্ত্র রিজার্ভ ফোর্স। চারদিকে নিস্তব্ধ। অতবড় জেলের তেরশ চৌদ্দশ লোক যেন রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে প্রত্যাসন্ন কোন্ মহাসংঘটনের প্রতীক্ষায়! অতগুলো ব্যারাক, যেন প্রেতপুরী। কোথাও নেই একবিন্দু প্রাণ-চিহ্ন।

সুপারের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আসামীকে নিয়ে আসা হল। মাথায় চোখ-ঢাকা টুপি। হাতদুটো পেছন দিকে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। দুদিক থেকে দুজন সিপাই আস্তে আস্তে তাকে ধরে তুলল ফাঁসি-মঞ্চের উপর। মাথার ঠিক ওপরটাতে একটা লোহার আড়ের সঙ্গে ঝুলছে মোটা ম্যানিলা দড়ির তৈরি ফাঁস। পায়ের নীচে লোহার তক্তা। তার তলায় নাতি-গভীর গর্ত। জল্লাদ তৈরি হয়ে আছে। হুকুমের অপেক্ষায়।

সুপারের হাতে ওয়ারেন্ট। গম্ভীরকণ্ঠে পড়ে গেলেন জজের আদেশ। তার বাংলা তরজমা করে শোনালেন রিলিজ দপ্তরের ডেপুটি জেলর। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রিজার্ভ চীফ্ হেডওয়ার্ডারের অনুচ্চ গম্ভীর কমান্ড—Present Arms; নিখুঁত নৈপুণ্যে উদ্যত হল রাইফেলযুক্ত বেয়নেট। চিরবিদায়োন্মুখ বন্দীর উদ্দেশে বন্দীশালার সশস্ত্রবাহিনী জানাল তাদের শেষ সামরিক সম্মান।

রাইফেলের বাঁটের উপর তাদের হাতের শব্দ তখনো মিলিয়ে যায়নি। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে স্তব্ধ জেলপ্রাঙ্গণের বুক চিরে ফেটে পড়ল এক তীক্ষ্ণ আর্তস্বর—'ছেড়ে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও—।' ফাঁসি-মঞ্চের উপর থেকে ছুটে পালাতে চাইল ফাঁসির আসামী। দুজন জোয়ান সিপাহি তাকে ধরে রাখতে পারে না! জল্লাদ থমকে দাঁড়াল। সুপারের কপালে দেখা দিল কুঞ্চনরেখা। তার ইঙ্গিতে আরও দুজন সিপাই ছুটে গিয়ে জোর করে তুলে ধরল আসামীর ভেঙে-পড়া কম্পিত দেহ। ক্ষিপ্রহস্তে হ্যাঙ্গম্যান গলায় পরিয়ে দিল ফাঁস এবং মুহূর্তমধ্যে

টেনে দিল লোহার হাতল। পায়ের তলা থেকে লোহার পাতখানা নিচে পড়ে গেল। তারি সঙ্গে চোখের নিমিষে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল কাশিম ফকিরের শীর্ণ দেহ। একটা শক্ত মোটা দড়ি শুধু ঝুলে রইল আমাদের চোখের সামনে। একটুখানি কেঁপে উঠল একবার কি দুবার। তারপর সব স্থির।

সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এ কী করে বসল লোকটা ? গোড়াতে না করল আপীল, না পাঠাল একটা mercy petition, ভেঙে পড়ল শেষকালে একেবারে ফাঁসিকাঠের উপর ! ড্রামাটিক কাণ্ড বটে !

ঐ ফাঁসি নিয়েই সেদিন জমে উঠল গল্পের আসর। সিনিয়র অফিসারেরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন। বীরেনবাবু বললেন, ফাঁসি তো কতই দেখলাম। টেররিস্টদের কথা বলছিনে। তাদের ব্যাপারই আলাদা। তাছাড়া যাদের দেখেছি, সবাইকেই প্রায় ধরে আনতে হয়েছে সেল থেকে gallows অবধি। একটা মুসলমান ছোকরা কিন্তু ভারী বাহাদুরি দেখিয়েছিল সেবার আলীপুর জেলে। আলি মহম্মদ না কি ছিল তার নাম; ঠিক মনে নেই। বড়লোকের ছেলে। বিয়েও করেছিল বনেদী ঘরে। বৌ নাকি ছিল পরমাসুন্দরী। এক মাস না যেতেই দিল একদিন তাকে খতম করে।

—খতম করে! কেন ?

—কেন আবার ? চরিত্রে সন্দেহ। কাঁচা বয়সে যা হয়ে থাকে। যেমন উন্মত্ত প্রেম, তেমনি পলক না ফেলতেই সন্দেহ। অবশ্য, ভুল বুঝতেও তার দেরি হয়নি। তখন ছোরা হাতে একেবারে থানায় গিয়ে হাজির। নিজে সে মামলা লড়তে চায়নি। কিন্তু বাড়ির লোক শুনবে কেন ? চেষ্টার ত্রুটি হল না। বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার, তদ্বির, সুপারিশ, ধরপাকড়, কান্নাকাটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গলা বাঁচল না।

তার ফাঁসির দিনটা বেশ মনে আছে। সেল থেকে বেরিয়ে এল গটগট করে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল gallows-এর ওপর। বড় সাহেব ওয়ারেন্ট পড়ছিলেন। মাঝখানেই বলে উঠল, ওসব রাখো সাহেব। ওয়ারেন্ট তো আগেই শুনেছি। তোমার হ্যাংম্যানকে ডাক, ফাঁসটা লাগিয়ে দিক। I am ready.

...তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে আপন মনে বলে গেল—এই দুনিয়াতেই কসুর করেছিলাম; এই দুনিয়া থেকেই তার সাজা নিয়ে যাচ্ছি। আমার কোনো আপসোস নেই। আজ ময় বহুৎ খুশ হ্যায়, বহুৎ খুশ হ্যায়।

রাধিকাবাবু প্রবীণ লোক। জুনিয়র বাবুরা চেপে ধরল, আপনি দু-চারটা বলুন দাদা। আপনার নিশ্চয়ই অনেক ফাঁসি দেখা আছে।

তিনি বললেন, অনেক না হলেও তা দেখেছি বৈকি দু-চারটে। তবে মনে করে রাখবার মত তাজ্জব কিছু ঘটতে দেখিনি। সবগুলোই মামুলি ব্যাপার। সেল থেকে ধরে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া। একটা case শুধু পেয়েছিলাম, ওরই মধ্যে একটু বিশেষ ধরনের। লোকটার নামও মনে আছে। নিতাই ভটচাজ্। ভয়ংকর মামলাবাজ। পরের পেছনে কাঠি দেওয়াই ছিল তার কাজ। সারাজীবন কত লোকের সর্বনাশ করে শেষটায় নিজেই পড়ে গেল এক মারাত্মক খুনী মামলায়। জমির দখল নিয়ে হাঙ্গামা। ওপক্ষে জোড়া খুন। লাশ গুম হয়ে গেল, কিন্তু তার রক্তমাখা কাপড় আর কি সব পাওয়া গেল ভটচাজের ঘরে। দায়রা জজ ছিল এক সাহেব। ফাঁসির order দিয়ে বসল। আপীল লিখেছিল ও নিজেই। অনেক পাকা ব্যারিস্টারের কলম থেকে ওরকম draft বেরোবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কাজ হল না। লোয়ার কোর্টের রায়ই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত। গোটা আষ্টেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌটা প্রায়ই দেখা করতে আসত। অবস্থা এককালে বেশ স্বচ্ছল ছিল। মরবার আগে তাদের সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়ে গেল।

এই লোকটা কিন্তু বরাবর বলে এসেছে, সে এ মামলার কিছু জানে না, একেবারে নির্দোষ, শত্রুপক্ষের লোকেরা আক্রোশবশত ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সত্যি মিথ্যা জানি না। এরকম তো সবাই বলে থাকে। কিন্তু ফাঁসিকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তেও যখন ঐ একই কথা সে বলে গেল, সবটাই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার মত জোর পেলাম না।......

রাধিকাবাবু চুপ করলেন। সেই শেষ দৃশ্যটা বোধ হয় তার চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। একটুখানি থেমে আবার শুরু করলেন—আসামী gallows-এর ওপর দাঁড়িয়ে। ওয়ারেন্ট পড়া শেষ হয়েছে। হ্যাংম্যানটাও রেডি। সাহেবের ইঙ্গিতের শুধু অপেক্ষা। সবাই আমরা ঐদিকেই তাকিয়ে আছি। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। হঠাৎ চমকে উঠলাম নিতাই-এর গলা শুনে। স্পষ্ট জোরালো গলা, না আছে একটু কাঁপুনি, না আছে জড়তা—তোমরা

শোনো, বিশ্বাস করো, খুন আমি করিনি। খুন করছ তোমরা। 'একটা নিতান্ত নিরপরাধ লোককে জোর করে ঝুলিয়ে দিচ্ছ ফাঁসিকাঠে।......

এইটুকু বলেই তার সুর হঠাৎ কেমন নরম হয়ে গেল। যেন প্রার্থনা করছে, এমনিভাবে আস্তে আস্তে বলল, অন্যায় করে, অবিচার করে যারা আমায় বাঁচতে দিলে না, কেড়ে নিল আমার অসহায় স্ত্রী-পুত্রের মুখের অন্ন, হে ভগবান! তুমি তাদের বিচার করো।

মজলিসটা বসেছিল ডেপুটিবাবুদের অফিসে। কোণের দিকে নিঃশব্দে বসেছিলেন আমাদের তরুণ সহকর্মী সিতাংশু। ভদ্রলোক একটু ভাবগম্ভীর। সকলের মধ্যে থেকেও কেমন স্বতন্ত্র। সেজন্যে পরিচিত মহলে তার নিন্দা প্রশংসা দুটোরই কিঞ্চিৎ আতিশয্য ছিল। আজকের ভোরের অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমাদের গল্পের আসরে তিনি উপস্থিত থেকেও যোগ দেননি। হঠাৎ কি মনে হল। ও'র দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি বুঝি কোনো ফাঁসি দেখেননি, সিতাংশুবাবু?

উনি একটু চমকে উঠলেন; বোধ হয় বাধা পেলেন কোনো নিজস্ব চিন্তা-সূত্রে। তারপর আবেগের সঙ্গে বিনীত কণ্ঠে বললেন, দেখেছি, স্যার, একটিমাত্র ফাঁসি দেখেছি। কিন্তু সে ফাঁসি নয়, শহীদ বেদীমূলে দেশপ্রাণ ভক্তের জীবন-বলি। এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করে তাঁর আত্মার অসম্মান করতে চাই না।

সিতাংশুর এই ভাবাবেগ আমি উপলব্ধি করছি। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, তাদের জয়গানেও আমি কারো চেয়ে পশ্চাৎপদ নই। সিতাংশুর মত তাদের দু-একজনকে দেখবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। দেখেছি, মহৎ উদ্দেশ্যে যে মৃত্যুবরণ, তার মধ্যে এক প্রচণ্ড মোহ আছে। সে মোহ যখন মনকে আচ্ছন্ন করে, মৃত্যুর বিভীষিকা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মরণের রূপ তখন ভয়ঙ্কর নয়; মরণ সেখানে শ্যাম-সমান। ফাঁসি-মঞ্চের ঐ লোহার পাতখানার উপর দাঁড়িয়েও তাই তাদের চোখে ভেসে ওঠে গভীর আত্মতৃপ্তি, কণ্ঠে জেগে ওঠে সতেজ গর্ববোধ। তারা জানে, তাদের জন্যে সঞ্চিত রইল দেশমাতৃকার অজস্র আশীর্বাদ আর দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ভাণ্ডার তাদের পূর্ণ। তাই উন্নত শিরে, সস্মিত মুখে তারা স্বচ্ছন্দে চলে যায়, কণ্ঠে পরে ম্যানিলা রজ্জুর বরমাল্য। এ তো মৃত্যু নয়, এ আত্মদান, মহত্তর জীবনের মধ্যে পুনরাবির্ভাব। এ মৃত্যু শুধু তার দেশের গৌবব নয়, তার নিজের কাছেও এক মহামূল্য অন্তিম সম্পদ্।

কিন্তু সে সম্পদের একটি কণাও যারা পেল না, মৃত্যু যাদের দিয়ে গেল শুধু ক্ষতি, মরণপথে একমাত্র পাথেয় যাদের লজ্জা, গ্লানি আর অভিশাপ, আইনের কাছে, সমাজের কাছে, স্বজন বান্ধব সকলের কাছে যারা কুড়িয়ে গেল খালি নিন্দার পসরা, সেই সব নিঃসম্বল সংসার-পরিত্যক্ত হতভাগ্য নরহন্তার দল মৃত্যুকে গ্রহণ করবে কিসের জোরে? কী অবলম্বন করে তারা পা বাড়াবে মরণ-সাগরের সীমাহীন অন্ধকারে? তাই মৃত্যু শুধু একটিমাত্র রূপে দেখা দেয় তাদের চোখে, সে রূপ বিভীষিকার রূপ। সে রূপ দেখে ফাঁসি-যন্ত্রের উপর কেউ আর্তনাদ করে, কেউ দাঁড়িয়ে থাকে বজ্রাহত মৃতদেহের মত, কেউ ভেঙে দুমড়ে আছড়ে পড়ে, কেউবা অর্থহীন প্রলাপের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় গ্রাসোদ্যত মরণের করাল ছায়া।

মৃত্যু-ছায়া যে কি বস্তু, সে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আজ তোমার ফাঁসি—এই সরল ছোট্ট একটিমাত্র বাক্য কেমন করে একটা দমকায় সুস্থ মানুষের মুখের উপর থেকে সমস্ত রক্ত মুহূর্তে শুষে নেয়, সে বীভৎস দৃশ্যও আমার চোখে পড়েছে। মৃত্যু যে আসন্ন, এ কথা তো তার অজ্ঞাত ছিল না। এই দিনটির জন্যেই সে তৈরি হয়েছে বহুদিন ধরে। তবু আসন্ন আর আগতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। নিশ্চিত হলেও মরণ এতদিন ছিল তার মনশ্চক্ষে। আজ সে সশরীরে উপস্থিত। আজ রুদ্রের আবির্ভাব। তারই নিশ্বাসে একটা জ্যান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে যায়। রক্তমাংসের গড়া জীবন্ত ধড়ের উপর দেখা দেয় চর্মাবৃত কঙ্কালের মুখ। এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? সিতাংশুর জুটেছিল, কিন্তু সে দেখল না।

সিতাংশুর সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। পুণ্যাত্মা শহীদদের জন্যে রইল আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু এই পাপাত্মা খুনীদের জন্যে রইল কি? কিছু না। সেখানে আমি রিক্তহস্ত। আমার কাছে, সংসারের মানুষের কাছে কোনো দাবি তাদের নেই। তবু, কখনো ক্বচিৎ কোনো সঙ্গহীন নিরালা সন্ধ্যায়, মন যখন গুটিয়ে আসে একান্ত আপনার মধ্যে, চোখ বুজলে আমি সেই মরণাহত, রক্তলেশহীন, ভীতি-পাণ্ডুর শীর্ণ মুখগুলো দেখতে পাই। ভয় নয়, ঘৃণা নয়, কী এক অব্যক্ত মমতায় সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে।

॥ সমাপ্ত ॥